কিশোর সমগ্র

কিশোর সমগ্র

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মহামান্য ছোটদা রোহিতকে

মজার গল্প
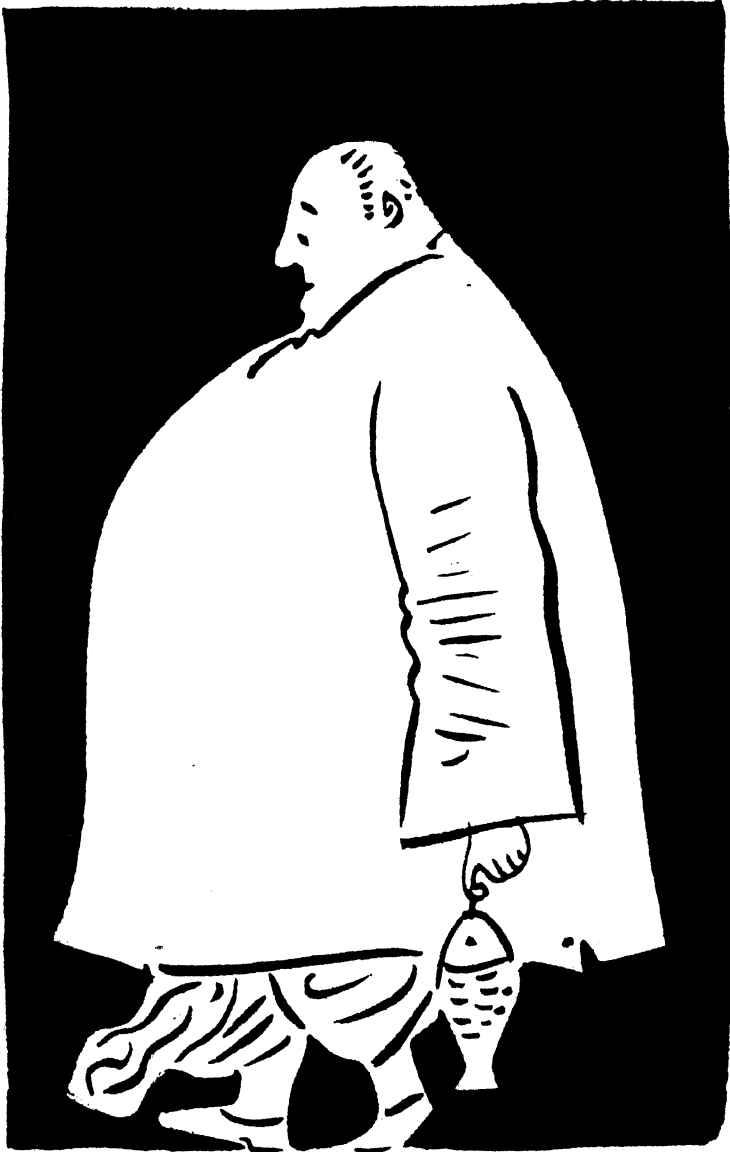
গদু চক্কোত্তি ও আমরা

ছোটদের জন্য প্রথম যা লিখি তা হল একটি বাঘ শিকারের গল্প। কিন্তু এবার যে গল্পটা শোনাতে যাচ্ছি তাতে বাঘও নেই, শিকারও নেই। এটা হল খাওয়া-দাওয়ার কাহিনি।

যাকে নিয়ে আমার এই গল্প ফাঁদতে বসেছি তার নাম গদু চক্কোত্তি। গদু চক্কোত্তি দি গ্রেটও বলতে পার। কিন্তু তার কথা বলার আগে আমাদের কথা একটু বলে নেওয়া দরকার।

তোমাদের মধ্যে যারা 'সেনাপতি নিরুদ্দেশ' আগেই পড়ে ফেলেছ তারা জেনে গেছ আমার আর আমার মাসতুতো ভাই বিনুর ছেলেবেলাটা কেটেছে পূর্ববাঙলায় মানে এখনকার বাঙলাদেশে। তারা আরও জেনেছ আমরা থাকতাম দিদিমার কাছে—মামাবাড়িতে। মামাদের গ্রামটার নামও ছিল ভারি সুন্দর—সোনারঙ।

'সেনাপতি নিরুদ্দেশ'-এর সেই মজাদার ঘটনাগুলো যখন ঘটেছিল তখন বিনু আর আমি একেবারে ছেলেমানুষ। দিদিমার দাপটে আমাদের টুঁ শব্দটি করবার উপায় ছিল না। কিন্তু একটু বড়ো হবার পর দিদিমার ভাষায় আমরা নাকি একেকটি বিচ্ছু হয়ে উঠেছিলাম! তোমাদের কাছে লুকবো না, দুষ্টুমি-টুষ্টুমি একটু-আধটু যে আমরা করতাম না তা নয়। এই ধর লুকিয়ে চুরিয়ে কারো বাগানের ফল চুরি করা, চার মাইল দূরে ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে নৌকোর বাইচ লাগানো, মহকুমা শহরে গিয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলা, হেরে গেলে খেলার পর মারামারি—এ সব লেগেই ছিল। আমাদের নামে রোজ দিদিমার কাছে গণ্ডা গণ্ডা নালিশ আসত। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেত বুড়ির।

দিদিমা ছিল দারুণ ডাকসাইটে মহিলা। সবসময় আমাদের চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করত। যাতে দুষ্টুমি করতে না পারি সেজন্য মাথা খাটিয়ে নানারকম ফন্দি বার করত। আর অগুনতি ফন্দির একটা ছিল এইরকম।

আমার মামাবাড়িতে একটা টিনের ছোট্ট দোতলা বাড়ি ছিল দিদিমা করত কি, রাত্তিরে বিনুর আর আমার খাওয়া হয়ে গেলে সেই দোতলার একটা ঘরে দু'জনকে পুরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিত। পরের দিন সকালে রোদ ওঠার পর তালা খুললে তবে আমরা বেরুতে পারতাম। আসল কথা, রাত্তিরে বেরিয়ে আমরা যাতে দুষ্টুমি করতে না পারি সেইজন্যই বুড়ি আমাদের ওভাবে আটকে রাখত।

দোতলার সেই ঘরটায় সব কিছুই ছিল। বিছানা, হেরিকেন, টর্চ, জলের কলসী, এমনকি ছোটোখাটো একটা বাথরুম পর্যন্ত। যাতে রাত্তিরে ঘর থেকে বেরুতে না হয় দিদিমা তাই এতসব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কিন্তু দিদিমা যদি ডালে ডালে যায়, আমরা যেতাম পাতায় পাতায়, হাজার হোক আমরা তারই নাতি তো! বুড়ির সঙ্গে আমাদের দারুণ একটা বুদ্ধির খেলা চলছিল। বুদ্ধির খেলা না বলে বুদ্ধির লড়াই বলাই ভালো।

দিদিমা তো আমাদের দু'জনকে দোতলায় পুরে দিত। আর আমরা কী করতাম বল দেখি? তোমাদের চোখমুখের চেহারা দেখে টের পাচ্ছি ধরতে পারছ না। আচ্ছা বলেই দিই। বিনু আর আমি প্রচুর মাথা খাটিয়ে একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে জানালার কাঠ কেটে দুটো শিক আলগা করে ফেলেছিলাম। জানলার ধার ঘেঁসেই ছিল নারকেল গাছ।

বুড়ি যখন বাইরে থেকে তালা লাগাত আমরা তখন জানালার শিক খুলে বেরিয়ে পড়তাম। শিকদুটো জায়গামতো আবার বসিয়ে নারকেল গাছ বেয়ে একেবারে নীচে।

'সেনাপতি নিরুদ্দেশ' পড়েই তোমরা জেনে গেছ পূর্ব বাঙলা জলের দেশ। যেদিকেই তাকাবে শুধু খাল বিল আর নদী। চারদিকে শুধু জল আর জল। এই জলের দেশে নৌকো ছাড়া একটা পা-ও চলা যায় না।

আমরা করতাম কি, গাছ থেকে নেমে একদৌড়ে বাড়ির পেছনদিকে সরুমতো একটা খালের পাড়ে চলে যেতাম। সেখানে সবসময় আমাদের একটা ছোট্ট নৌকো বাঁধা থাকত।

সেই নৌকোটায় উঠে বিনু আর আমি যেতাম গোঁসাইদের বাড়ি, সেখান থেকে মল্লিকদের বাড়ি। তারপর যেতাম মুসলমান পাড়ার কাজিদের বাড়িতে, মীরেদের বাড়ীতে। মীর বাড়ির রাশেদ আর তার খুড়তুতো ভাই লিটন আমার ক্লাসে পড়ত। গোঁসাই-বাড়ির সুখেন আর জিতেন দুই ভাইও ছিল আমাদের ক্লাসফ্রেন্ড। মল্লিকবাড়ির গণেশ আর কাজিবাড়ির ডাকু পড়ত আমার এক ক্লাস নীচে—বিনুর সঙ্গে।

রাত্রিবেলা বেরিয়ে আমরা কিন্তু ওদের কারো বাড়িতেই ঢুকতাম না। বাড়ির কাছাকাছি নৌকো থামিয়ে মুখে আঙুল পুরে জোরে সিটি দিতাম। এই সিটিটা হল ইশারা।

আমাদের ইশারা পেলেই বন্ধুরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসত। তারপর সবাই মিলে নৌকো বেয়ে সোজা ধলেশ্বরী নদীতে।

ধলেশ্বরীর ধারে ধারে ছিল বড়ো বড়ো সব গঞ্জ আর হাট। সে সব জায়গায় প্রায় রোজ রাত্তিরেই যাত্রার আসর বসত। ঢাকা শহর থেকে, বরিশাল থেকে, ফরিদপুর থেকে নামকরা সব যাত্রার দল ওই সব গঞ্জে আর হাটে পালা গাইতে আসত। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'রামের বনবাস', 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'দুঃশাসনের রক্তপান'--এইসব ছিল পালার নাম।

সারারাত যাত্রা শুনে ভোর হবার আগেই কিন্তু নৌকোয় পাল তুলে আমরা ফিরে আসতাম। তারপর নারকেল গাছ বেয়ে ওপরে উঠে জানালার শিক সরিয়ে আবার দোতলার সেই ঘরে ঢুকে পড়তাম। সকালে দরজার তালা খুলে দিদিমা দেখত তার দুই নাতি গলা জড়াজড়ি করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

বুড়ির চোখে ধুলো ছিটিয়ে বিনু আর আমি বেশ মজাসেই ছিলাম। কিন্তু সব ব্যাপারটা গোলমাল করে দিল রাশেদ। একদিন স্কুল ছুটির পর সে আমাদের নিয়ে গেল ফুটবল খেলার মাঠে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে ফুটবল খেলার মাঠটা ছিল মামাদের দীঘির পাড়ে; ওখানেই 'সেনাপতি নিরুদ্দেশে'র নগেন পাকড়াশী বাঘ মারার জন্য তার সেনাবাহিনীকে প্যারেড করাত।

খেলার মাঠে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে, আমাদের এখানে নিয়ে এলি কেন?'

রাশেদ বলল, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

রোগা টিঙটিঙে চেহারা ছিল রাশেদের, কাঠির মতো হাত-পা। সরু লম্বা গলার ওপর পেল্লায় একখানা মাথা; মাথার ওপর শজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া চুল। রাশেদের এই মাথাটার ভেতর সবসময় নানারকম দুষ্টুমির চাষ চলন্ত। আসলে দিনরাত নানা ব্যাপারে চিন্তাভাবনা আর গবেষণা করত সে।

রাশেদের প্ল্যান মানে দারুণ একখানা মজার ব্যাপার। আমি ওর গায়ের কাছ ঘেঁসে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী প্ল্যান রে?'

গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে রাশেদ বলল, 'আজ রাত্তিরে আমরা ধলেশ্বরীতে ইলিশ মাছ ধরতে যাব। তোরা যে যার ঘরে সন্ধের পর থেকে রেডি হয়ে থাকবি।' বলতে ভুলে গেছি বিনু আর আমিই শুধু না, রাশেদ-সুখেন-জিতেনরাও রাত্তিরে সিটি বাজিয়ে আমাদের ডেকে নিয়ে যেত। মোট কথা যে আগে বাড়ির লোকের চোখে ধুলো ছিটিয়ে বেরুতে পারত সে-ই অন্যদের ডেকে নিত।

ইলিশ ধরার কথায় আমরা লাফিয়ে উঠলাম। এতদিন আমরা যাত্রা শুনেছি, নৌকো বাইচ লাগিয়েছি, ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে মারামারি করেছি, কিন্তু রাত্তিরে ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে কখনও ইলিশ মাছ ধরিনি। মাছ ধরার নামে আমাদের বুকের ভেতরটা যেন ঢেউয়ের মতো নাচতে লাগল। বললাম, 'দারুণ প্ল্যান বার করেছিস রাশেদ। তোর মাথাটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা দরকার।'

আমরা লাফালাফি করলে কি হবে, সুখেনের ভাই জিতেন কিন্তু অত সহজে নাচল না। খুব বিজ্ঞ বিজ্ঞ চেহারা তার; সবসময় ভাবখানা আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের মতো। কোন কিছু খুঁটিয়ে খুটিয়ে না জেনে সে তার মতামত দিত না। জিতেন বলল, 'মাছ তো ধরবি, জাল পাবি কোথায়?'

রাশেদ বলল, 'তার ব্যবস্থা আমি করেছি।'

'কী ব্যবস্থা শুনি?'

'গিরিগঞ্জের জেলেদের দুটো জাল হাত সাফাই করে এনেছি।'

আমাদের সোনারঙ গ্রাম থেকে দু-মাইল দূরে একটা জেলেপাড়া ছিল। জায়গাটার নাম গিরিগঞ্জ। গিরিগঞ্জের জেলেরা দিনের বেলা খোলা মাঠে ডজন ডজন ইলিশ-ধরার জাল শুকোতে দিত। তারপর সন্ধ্যে হলেই ভাত-টাত খেয়ে সেই সব জাল গুছিয়ে নিয়ে ডিঙি নৌকোয় করে চলে যেত ধলেশ্বরীতে। গোটা রাত নদীতে মাছটাছ ধরে ভোরবেলায় ফিরে আসত।

জেলেরা যখন মাঠে জাল শুকোতে দিয়েছিল তখন কোন ফাঁকে দুটো জাল সরিয়ে এনেছে রাশেদ। ব্যাপারটা এত চুপি চুপি করেছে যে আমাদের পর্যন্ত আগে থেকে জানায়নি।

জিতেন মুখখানা আরো গম্ভীর করে বলল, 'কিন্তু ভাই আর ক'দিন পর অ্যানুয়াল পরীক্ষা। এখন মাছ ধরতে যাওয়া কি উচিত যদি ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটর হয়ে যায়।'

সেই সময়টা ছিল কার্তিক মাস। পুজোর ছুটির পর সবে স্কুল খুলেছে। জিতেন ঠিকই বলেছে, ক'দিনের মধ্যেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাদের সেই জলের দেশে পুজোর পরেই ঠাণ্ডা পড়ে যায়।

সুখেন বলল, 'কিচ্ছু হবে না।'

'হয়ে গেলে তখন? পরীক্ষা দিতে পারব না; একটা বছর পুরনো ক্লাসে পড়ে থাকতে হবে।'

জিতেন কথাটা ঠিক বললে কি হবে, বার বার বাগড়া দেওয়ায় কাজি বাড়ির ডাকু ক্ষেপে উঠল। বলল, 'বেশি গার্জেনগিরি ফলাস না তো। জ্বর হবে, হ্যান হবে ত্যান হবে। শুরু থেকেই কুডাক ডাকছে। ইচ্ছে হলে তুই যাবি, না হলে না যাবি। তবে একটা কথা জেনে রাখ, আমরা যাবই।'

মুখখানা হুতোম প্যাঁচার মতো গোমড়া করে বসে রইল জিতেন। তার ভাবটাব দেখে মনে হল, আমাদের সঙ্গে মাছ ধরার অভিযানে সে বেরুচ্ছে না।

জিতেনের কথা থাক। ধলেশ্বরীতে ইলিশ ধরার প্ল্যানটা আমরা ঠিক করে ফেললাম! আমাদের আর তর সইছিল না; পারলে তক্ষুনি আমরা ধলেশ্বরীতে বেরিয়ে পড়ি। যাই হোক, ঠিক হল রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আটটার সময় যে যার ঘরে বসে থাকব। রাশেদ এসে সিটি বাজালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে নিতে হবে একটা করে টর্চ আর কিছু খাবার। খাবার আর কি, আমাদের সেই জলের দেশের পাড়াগাঁয়ে তো কলকাতা শহরের মতো চপ-কাটলেট কেক-প্যাটিজ বা স্যান্ডউইচ পাওয়া যেত না। সেখানে খাবার বলতে মুড়ি- চিঁড়ে-খইয়ের মোয়া-নারকেলের নাড়ু— এইসব।

প্ল্যানটা পাকা হয়ে যাবার পর আমরা যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

সন্ধের পর থেকে সময় আর যেন কাটতে চায় না। একেকটা মিনিট যেন একেকটা বছরের মতো লম্বা মনে হতে লাগল।

পাড়াগাঁ, বিশেষ করে সে সময়কার পূর্ববাঙলার গ্রামগুলো এমনিতেই খুব নির্জন। বাড়িঘরও কম ছিল; যা ছিল তাও ছাড়াছাড়া। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি অনেক দূরে দূরে। সন্ধের পর এইসব গ্রাম একেবারে নিঝুম হয়ে যেত।

সেদিন সাতটার সময় দিদিমা আমাদের রাতের খাওয়া খাইয়ে দোতলার সেই ঘরটায় পুরে দিল। তার আগেই ভাঁড়ার ঘর থেকে মুড়ি, চিঁড়ে মোয়া আর অনেকগুলো নারকেল নাড়ু হাতিয়ে নিয়ে এসেছিল বিনু।

দোতলায় যে যার বিছানায় বসে আছি। দূরে একটা টেবিলে হেরিকেন জ্বলছে; তার পাশে ঢাব্বুস চেহারার একটা টেবিল ক্লক। টেবিল ঘড়িটা টিকটিক করে অনবরত টিকটিকির মতো শব্দ করে যাচ্ছে। আমাদের দুজনের চোখ ঘড়িটার গায়ে যেন আটকে আছে। ভাবছি কখন আটটা বাজবে, কখন আটটা বাজবে।

তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছ এটা কী হচ্ছে? একেবারে গোড়াতেই তোমাদের জানিয়েছিলাম এ গল্পটা হল খাওয়া-দাওয়ার গল্প। আর যাকে নিয়ে এ গল্প তার নাম গদু চক্কোত্তি দি গ্রেট। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা বলেছি তাতে গদু চক্কোত্তিও নেই, এমনকি খাওয়া-দাওয়ার গন্ধ পর্যন্ত নেই। তোমরা হয়তো ভাবতে পার, এক গল্প বলতে গিয়ে কায়দা করে তোমাদের আরেক গল্প শুনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু না, একটু ধৈর্য ধরে থাক,

খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারও আসবে, গদু চক্কোত্তির দেখাও পাওয়া যাবে। মাছধরার কাণ্ডটা না ঘটলে গদু চক্কোত্তির দেখা পাওয়া যাবে না। তাই এটুকু বলে নিতে হচ্ছে।

আচ্ছা, আবার আমরা মাছ ধরার কথায় ফিরে যাই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিনু আর আমি বসেই আছি, বসেই আছি। কাঁটায় কাঁটায় যখন আটটা বাজল ঠিক সেই সময়ে পেছনের খালের দিক থেকে সিটি বেজে উঠল। রাশেদ এসে গেছে।

আমরা তক্ষুনি দুটো টর্চ আর নাড়ু মুড়ির পুঁটলি নিয়ে জানালার শিক সরিয়ে নারকেল গাছের গা বেয়ে নীচে নেমে এলাম।

খালের ধারে এসে দেখি রাশেদ একটা নৌকা নিয়ে এসেছে। আর সেই নৌকোর মাঝখানে সুখেন ডাকু লিটন আর— আর কে বসে আছে বল দেখি? বলতে পারলে না তো। জিতেন বসে আছে। যতই বিজ্ঞের মতো গার্জেনি চালে কথা বলুক, এমন একটা দুর্দান্ত অভিযানে না বেরিয়ে সে পারে!

রাশেদ বলল, 'তোদের নৌকোটাও নিয়ে নে। দুটো জাল আছে। দুই নৌকোয় বসে যাওয়া যাবে।'

কিভাবে ধলেশ্বরীতে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরা হবে; ওখানে বসেই ঠিক করে ফেলা হল। রাশেদদের নৌকোয় থাকবে রাশেদ সুখেন আর জিতেন। আমাদের নৌকোয় থাকবে বিনু ডাকু লিটন আর আমি। পালা করে করে আমরা ইলশে জাল বাইব আর হালে বসে নৌকো চালাব।

সব ব্যবস্থা ঠিক করে নেবার পর দু'খানা নৌকো খালের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

খালটা খুব চওড়া নয়। দু'ধারে নানারকমের গাছ—যেমন হিজল, বউন্যা, মান্দার। আর আছে ঝোপঝাড়, ঘন বেতের লতা, তেলাকুচের ঝাড়। সব মিলিয়ে ঝুপসি বন।

পুজোর পর থেকেই পূর্ব বাংলায় কুয়াশা পড়তে শুরু করে। অল্প অল্প কুয়াশায় চারিদিকে ঝাপসা হয়ে আছে। মাথার ওপর ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। তবে কুয়াশার জন্য চাঁদের আলোটা খুব পরিষ্কার নয়, কেমন যেন ঘোলাটে।

দু পাশের ঝোপ আর গাছের মাথা থেকে রাত জাগা পাখিরা মাঝে মাঝে 'টুইচ' 'টুইচ' করে ডেকে উঠছিল। আর ডাকছিল ঝিঁঝিরা। এ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।

ঝিঁঝি আর পাখিদের ডাক শুনতে শুনতে একসময় আমরা ধলেশ্বরীতে চলে এলাম।

ধলেশ্বরী বিরাট নদী। আমরা যেখানে এসে পড়লাম সে জায়গাটা দু মাইলের মতো চওড়া।

আমরা আসবার আগেই জেলেরা এসে গেছে। যেদিকেই তাকাই ঝাপসা অন্ধকারে জোনাকির মতো হাজার হাজার আলো নদীর ওপর ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। ওগুলো জেলেনৌকোর আলো।

আমরা আমাদের নৌকোদুটো নিয়ে একেবারে নদীর মাঝমধ্যিখানে চলে এলাম। পুজোর কিছুদিন আগে থেকেই পূর্ব বাঙলার খাল বিল আর নদীর জল একেবারে স্থির হয়ে যায়। তাই ধলেশ্বরীতে ঢেউ নেই। তবে উত্তরদিক থেকে শীতের হাওয়া দিতে শুরু করেছিল; সেই হাওয়ায় নদীর জল অল্প অল্প কাঁপছে।

ছেলেবেলা থেকে ধলেশ্বরী আমাদের চেনা। তাই আমাদের একটুও ভয় করছিল না। তবে শীতের হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আমরা এর জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলাম। সবাই গায়ে একটা করে মোটা চাদর জড়িয়ে দিলাম।

যে জন্যে এত কাণ্ড করে ধলেশ্বরীতে অভিযান একসময় তাই শুরু করে দিলাম।

আগে আমরা কেউ ইলিশ ধরিনি, ইলিশমাছের জালও বাইনি। তবে কি করে ইলশেজাল বাইতে হয় সেটা দেখেছি।

পূর্ববাংলায় ইলশে জালগুলো হয় ছোটো ছোটো। জলের পনেরো কুড়ি ফুট নীচে সেগুলো নামিয়ে দিতে হয়। জালগুলোর মুখ হয় গোল গোল; সেখানে থাকে বাঁশের ফ্রেম। নৌকোয় বসে যে জাল ফেলে তার হাতে থাকে একটা লম্বা দড়ি। দড়িটা জালের মাঝখানে আটকানো থাকে। ইলিশ মাছের ঝাঁক ছুটতে ছুটতে জালের ভেতর ঢুকলেই সেই দড়িটায় ধাক্কা লাগে। যে জাল বায় সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেয়ে যায় ভেতরে মাছ এসেছে। তক্ষুনি সে দড়িটা ধরে দেয় টান; অমনি জালের মুখ আটকে যায়। আর ভেতরে মাছগুলো বন্দী হয়ে পড়ে। তারপর টেনে জালটা ওপরে তুলে নিলেই হল।

আমাদের আর রাশেদদের নৌকোদুটো পাশাপাশি রয়েছে। আমাদের নৌকোয় একদিকে হাল ধরে বসেছে ডাক, আরেকদিকে গলুইতে বসে জাল বাইছি আমি। নৌকোর মাঝখানে পাটাতনের ওপরে বসে আছে বিনু আর লিটন। রাশেদের নৌকোয় হাল ধরেছে সুখেন, জাল বাইছে রাশেদ। আর জিতেন মাঝখানে বসে আছে।

কুড়ি বাইশ ফুট জলের তলায় জালখানা নামিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি, যদিও আমি একেবারেই আনাড়ী, জীবনে আমার এই প্রথম ইলশেজাল বাওয়া তবু ইলিশমাছ জালে ঢুকলে দড়িতে ধাক্কা লাগবে তো। কিন্তু সেরকম কিছুই টের পাচ্ছি না।

একটু একটু করে রাত বেড়ে যাচ্ছিল। রাত যত বাড়ছে কুয়াশা তত ঘন হচ্ছে। মাথার উপর চাঁদটা এখনও আছে; আর চারদিকে ফুটে উঠেছে হাজার হাজার তারা! কালো কাপড়ের গায়ে অগুনতি চুমকি বসালে যেমন লাগে আকাশটাকে এখন সেইরকম দেখাচ্ছে।

চারদিকে জেলেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কেউ হয়ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছিল, 'কী রকম মাছ পড়ছে গগনভাই?'

গগন নামের লোকটা একইভাবে নদীর আরেক দিক থেকে চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছিল, 'কিচ্ছু না।'

'আজ আর মাছের আশা নেই।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

ওদের গলার স্বর খোলা নদীর ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

ও নৌকো থেকে রাশেদ আমাকে বলছিল, 'কি রে, কিছু বুঝতে পারছিস? জালে মাছ ঢুকছে?'

বললাম, 'উঁহু।'

'আমার জালেও কিচ্ছু পড়ছে না।'

'বাজে দিনে এসেছি। বাড়ি ফিরে যাবি নাকি?'

'ফিরবার জন্যে এসেছি? দেখা যাক না আর কিছুক্ষণ। অনেক সময় বেশি রাতে মাছ পাওয়া যায়।'

খানিকক্ষণ জাল বাওয়ার পর আমি জিরোতে গেলাম। বিনু জাল নামিয়ে এধারের গলুইতে বসল। হাল থেকে ডাকুও জিরোতে এল। সেখানে গিয়ে বসল লিটন। রাশেদরাও পালা করে করে জাল বাইছে, হাল ধরছে আর জিরিয়ে নিচ্ছে।

দেখতে দেখতে রাত ভোর হয়ে আসতে লাগল। অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব দিকটা ফর্সা হতে শুরু করল। একটু পরেই কুয়াশা কেটে রোদ উঠে যাবে।

এর মধ্যেই ঝাঁকেঝাঁকে শঙ্খচিল বেরিয়ে পড়েছে। নদীর ওপর তারা চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে আর ফাঁক পেলেই জলের ওপর ছোঁ মেরে ধারালো ঠোঁট দিয়ে ছোটো ছোটো দারকিনা মাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সারা রাত জাল বেয়ে আমরা একটা মাছও ধরতে পারিনি। রাশেদের অবস্থাও তাই। এমন কি পাকা জেলেরাও গোটা রাত জাল ফেলেও সুবিধে করতে পারেনি।

এদিকে রাত জেগে চোখ জ্বালা করছিল আমাদের; মাথা ঝিম-ঝিম করছিল। সারা রাত হিম লাগার জন্য গলা ভেঙে গিয়েছিল। কেউ আমরা ভালো করে কথা বলতে পারছিলাম না।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, বাড়ি ফিরতে তো হবে। সকাল হলেই দিদিমা দোতলার তালা খুলে আমাদের দেখতে না পেলে ভীষণ চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। আরো কী কী কাণ্ড যে বুড়ি করবে ভাবতে হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল।

বাড়ি ফেরার কথা বলতে যাব, হঠাৎ রাশেদদের নৌকো থেকে সুখেন দারুণ খুশির গলায় চিৎকার করে উঠল, 'মাছ পড়েছে মাছ পড়েছে—' হালের উল্টোদিকের গলুইতে বসে সে জাল বাইছিল।

সুখেনের কথা শেষ হতেই আমাদের নৌকো থেকে ডাকু চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার জালেও মাছ পড়েছে। অনেক মাছ—আমাদের নৌকোয় জাল বাইছে ডাক।

ডাকু আর সুখেনই না, নদীর চারদিক থেকে জেলেরাও চিংকার জুড়ে দিয়েছে, 'মাছ পড়ছে রে, মাছ—'

রাত্তিরে মাছ পাওয়া যায়নি কিন্তু ভোর থেকে যত লোক ধলেশ্বরীতে মাছ ধরতে এসেছিল তাদের সবার জালেই ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পড়তে লাগল। এখন জাল ফেললেই মাছ উঠছে।

মাছের নেশা ভীষণ নেশা। একবার বঁড়শি কি জালে মাছ পড়তে শুরু করলে আর কোনো কথা মনে থাকে না। আমাদেরও মনে থাকল না। রোদ ওঠার আগেই যে আমাদের সবার বাড়ি ফেরা দরকার, তালা খুলে আমাদের না দেখলে দিদিমা যে চেঁচিয়ে উঠেই ভিরমি খাবে, এ সব কথা তখন কে আর ভাবছে।

পালা করে আমরা জাল বাইতে লাগলাম। একবার ডাকু বাইছে, ডাকুকে সরিয়ে বিনু বাইছে, বিনুকে সরিয়ে আমি। রাশেদদের নৌকোতেও একই অবস্থা। একজন আরেক জনকে সরিয়ে মাছ ধরতে চাইছে।

নদী থেকে একটা জেলেডিঙিও চলে যায়নি। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ পড়ার ফলে তাদেরও নেশা ধরে গিয়েছিল।

মাছ ধরতে ধরতে কখন যে কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছিল, কখন বেলা বাড়তে শুরু করেছিল, আমাদের খেয়াল নেই। ইলিশমাছে আমাদের নৌকোর চারভাগের একভাগ বোঝাই হয়ে গেছে। আমাদের ইচ্ছে, পুরোপুরি বোঝাই করে তবে বাড়ি ফিরব।

যেভাবে মাছ পড়ছে তাতে নৌকোটা ভর্তি হয়েই যেত। কিন্তু হঠাৎ ওধারের একটা জেলেডিঙি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বাবুরা জাল তুলে পাড়ে চলে যাও। 'কাইতান' আসছে। কার্তিক মাসের ঝড়কে পূর্ব বাঙলায় বলে 'কাইতান'।

মাছ ধরতে ধরতে আমরা একবার আকাশের দিকে তাকালাম। ঝলমলে সোনালি রোদে চারদিক ভরে আছে। তবে এককোণে এক ফোঁটা কালির মতো একটুখানি মেঘ দেখা যাচ্ছে।

লোকটার কথা আমাদের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরিষ্কার খটখটে আকাশ, ঝকঝকে রোদ—এর মধ্যে কোত্থেকে ঝড় আসবে ভেবে পেলাম না। তা ছাড়া এত এত মাছ যখন পড়ছে তখন কে আর ফিরে যেতে চায় বল। আমরা কোনও দিকে না তাকিয়ে মাছ ধরে যেতে লাগলাম।

আধ ঘণ্টাও কাটল না। আচমকা আমাদের খেয়াল হল, আকাশের কোণে সেই ছোট্ট কালির ফুটকিটা আর অত ছোটো নেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে সেটা বড়ো হয়ে হয়ে কখন যে আকাশের অর্ধেক ছেয়ে ফেলেছে টের পাইনি। কুচকুচে কালো মেঘের নীচে সূর্যটা ঢাকা পড়ে গেছে। এখন আর রোদ নেই।

কিছুক্ষণ আগেও নদীটা ছিল খুব শান্ত। একখানা নীলচে আয়নার মতো চুপচাপ পড়েছিল। হঠাৎ সেখানে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে ঢেউগুলো আরও বড়ো হয়ে পাহাড়ের মতো ফুলে ফুলে আকাশের দিকে হাত বাড়াতে লাগল যেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, ধারেকাছে একটা জেলেনৌকোও নেই। আমাদের সাবধান করে দিয়েই তারা পাড়ের দিকে চলে গেছে। নদীর মাঝখানে রাশেদদের আর আমাদের এই দুটো নৌকোই শুধু রয়েছে।

পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট ঢেউগুলো আমাদের নৌকো দুটো নিয়ে যা খুশি তাই করে যাচ্ছিল। চোখের পলকে একবার আকাশের দিকে তুলে দিচ্ছিল, আবার তখুনি নামিয়ে নিয়ে আসছিল।

শুধু ঢেউ থাকলেও কথা ছিল; সেই সঙ্গে কোত্থেকে দারুণ স্রোতও শুরু হয়েছে। স্রোতের আর ঢেউ-এর টানে আমাদের নৌকো তীরের মতো কোনদিকে ছুটে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম না।

আমাদের নৌকোর হাল ধরে বসেছিলাম আমি। রাশেদদের নৌকোয় রাশেদ। আমি প্রাণপণে হালের বৈঠাটা ধরেছিলাম। কিন্তু স্রোতের আর ঢেউ-এর সঙ্গে কতক্ষণ আর লড়াই চালানো যায়।

তীরবেগে ছুটে যেতে যেতে একসময় রাশেদদের নৌকোটা আর দেখতে পেলাম না। ওরা কোন দিকে ভেসে গেছে কে জানে। এদিকে আমাদের নৌকোয় বিনুরা উপুড় হয়ে

শুয়ে পাটাতন আঁকড়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেছে! ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। আমিও যে ভয় পাইনি তা নয়। তবে সবাই মিলে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে তো কোনো লাভ নেই। তাতে আরও বিপদ! আমি দাঁতে দাঁত চেপে নদীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

কিন্তু কতক্ষণ আর। একসময় আমার হাতের বৈঠাটা স্রোতের তোড়ে পট করে ভেঙে গেল; দু সেকেন্ডের মধ্যে নৌকোটা বোঁ করে দু তিন পাক ঘুরেই একেবারে উলটে গেল। টের পেলাম একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আমাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের নৌকায় আর যারা ছিল, নদীর স্রোত তাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, জানি না। আশে পাশে তাদের দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দূরে উঁচু একটা ঢেউয়ের আড়াল থেকে বিনুর চিৎকার ভেসে এল, 'দাদা আমাকে বাঁচা—'

আমি প্রাণপণে সাঁতার কাটছিলাম। সেই জলের দেশে চার বছর বয়স হলে সবাই সাঁতার শেখে। না শিখে উপায় নেই যে।

বিনুর চিৎকার শুনে সেই বড়ো ঢেউটার দিকে এগুতে চেষ্টা করলাম কিন্তু অন্য দিক থেকে আরও বড়ো একটা ঢেউ আমাকে আরেক দিকে টেনে নিয়ে গেল।

এই স্রোত আর ঢেউয়ের সঙ্গে বেশিক্ষণ যুদ্ধ করতে পারলাম না। টের পাচ্ছি আমার নাকমুখ দিয়ে গল গল করে জল ঢুকছে; শরীরের শক্তি আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে; চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। একসময় আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। চারদিকে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

দুই

আমার যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি একটা টিনের চালের ঘরে শুয়ে আছি। কাছে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে। তার মানে এখন রাত। আমার মাথার কাছে চার-পাঁচজন লোক বসে আছে। চেহারা দেখে মুসলমান চাষী-টাষী বলে মনে হল।

ভালো করে চোখ মেলতেই তারা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তাদের মধ্যে বুড়োমতো চাষীটি—তার কাঁচাপাকা দাড়ি, পরনে সবজে লুঙ্গি—বলে উঠল, 'জ্ঞান ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে।' একটু থেমে আমাকে বলল, 'এখন কেমন লাগছে গো বাবু?'

'ভালো।' বলেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি এখন কোথায়?'

'চরবেহুলায়।'

চরবেহুলা ধলেশ্বরী নদীর মাঝখানে একটা চর।

চর কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো। তবু আরেক বার বলি। নদীর মাঝখানে পলিমাটি জমে জমে যে ডাঙা তৈরি হয় তাকে বলে চর। পূর্ব বাঙলার মেঘনা পদ্মা ধলেশ্বরী—এইসব নদীতে অগুনতি চর আছে। সে সব জায়গায় ঘর বাড়ি তৈরি করে মানুষেরা থাকে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি এখানে কী করে এলাম?'

বুড়ো চাষী বলল, 'তোমার শরীর এখন দুর্বল; কালকে শুনো।'

হঠাৎ বিনুদের কথা মনে পড়ে গেল। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি একলাই এখানে আছি নাকি? আমার সঙ্গে আরও ক'জন ছিল—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো চাষী বলল, 'হ্যাঁ, তিন জন। ওই যে—' ঘরের কোণের দিকে একটা বিছানা দেখিয়ে দিল সে।

একটু কাত হয়ে রেড়ির তেলের টিমটিমে আলোয় দেখলাম বিনু ডাকু আর গণেশ শুয়ে আছে। খুব সম্ভব ওদের জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

বুড়ো চাষী এবার গলা তুলে ডাকল, 'ফুলমন, ফুলমন—'

একটা টুকটুকে চেহারার মেয়ে বাইরে থেকে দৌড়ে ঘরের ভেতর এল।

বুড়ো বলল, 'বাবুটির জন্য এক বাটি গরম দুধ নিয়ে আয় তো মা—'

ফুলমন যেভাবে দৌড়ে এসেছিল সেইরকম দৌড়েই দুধ নিয়ে এল। এক চুমুকে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ঘুম ভাঙার পর দেখলাম বিনুদের জ্ঞান ফিরেছে। কাল রাত্তিরে যে মুসলমান চাষীদের দেখেছিলাম তাদের আজও দেখলাম।

আজ আমার শরীরটা অনেক ভালো লাগছে। আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসে বুড়ো চাষীকে ফের জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা এখানে কী করে এলাম?'

বুড়ো যা বলল তা এইরকম। কাল দুপুরবেলা এই চরের লোকেরা নাকি দেখতে পায় আমরা চারজন চরের নরম কাদায় আটকে পড়ে আছি। আসলে নৌকো উলটে যাবার পর স্রোতের টানে এখানে ভেসে এসেছিলাম। ভাগ্যিস ধলেশ্বরীর এই চরটা কাছাকাছি ছিল, নইলে কোথায় যে চলে যেতাম।

চরের লোকেরা প্রথমে ভেবেছিল আমরা মরেই গেছি। তখন তারা দৌড়ে গিয়ে বুড়ো চাষীকে খবর দেয়। বুড়ো এই চরবেহুলার মাতব্বর লোক; সবাই তাকে দারুণ খাতির করে। সে আমাদের নাকের কাছে হাত রেখে বুঝতে পেরেছিল আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ছে; আমরা মরে যাইনি।

আমরা প্রচুর জল খেয়েছিলাম। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বুড়ো আমাদের নাকমুখ দিয়ে প্রথমে জল বার করেছিল। তারপর সবাইকে তুলে এনে গায়ের কাদাটাদা ধুইয়ে জামাপ্যান্ট ছাড়িয়ে শুকনো লুঙ্গি পরিয়ে নিজের ঘরে এনে শুইয়ে দেয়। আমরা যে বেঁচে আছি তাতে বুড়ো চাষী আর এই চরের লোকেরা খুব খুশি।

কথা শেষ করে বুড়ো প্রশ্ন করল, 'এবার বল দিকি তোমরা জলে পড়লে কী করে? নৌকোডুবি হয়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। ঝড়ে নৌকো উলটে গিয়েছিল। আমরা স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিলাম।' লুকিয়ে ইলিশ মাছ ধরতে আসার কথাটা আর বললাম না।

জিভ দিয়ে চুক চুক করে একটা শব্দ করল বুড়ো।

আমি আবার বললাম, 'তোমরা না বাঁচালে আমরা মরেই যেতাম!'

'আমরা বাঁচাবার কে, সবই খোদাতাল্লার ইচ্ছা।'

হঠাৎ দিদিমার কথা মনে পড়ে গেল। পরশু রাত্তিরে ধলেশ্বরীতে এসেছিলাম। তারপর একটা গোটা দিন আর একটা গোটা রাত পার হয়ে গেছে। বুড়ী এতক্ষণে কেঁদেকেটে

হৈ-চৈ করে কী কাণ্ড যে বাধিয়ে তুলেছে ভাবতে সাহস হচ্ছিল না। বার কয়েক ঢোক গিলে বুড়ো চাষীকে বললাম, 'আমাদের বাড়িতে খুব ভাবছে।'

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, 'তা তো ভাববেই। তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

'সোনারঙে।'

'সোনারঙের কোন বাড়ি?'

'মজুমদারদের।'

'মজুমদারদের বাড়ি আমি চিনি। জোয়ান বয়সে কত বার গেছি। হেম মজুমদার তোমার কে হয়?'

'আমার দাদু।' যখনকার কথা বলছি তখন আমার দাদু বেঁচে নেই।

'তুমি হেম মজুমদারের নাতি!'

'আমার দাদুকে তুমি চিনতে!'

'চিনতাম না! সোনার মানুষ ছিল মজুমদার কর্তা। তোমার দাদুর জমিতে জোয়ান বয়সে আমি চাষের কাজ করেছি। তোমার তখন জন্মই হয়নি।'

চুপ করে রইলাম। তবে আশা হল, বুড়ো যখন দাদুকে চেনে তখন নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে।

বুড়ো আবার বলল, 'তুমি হেমকর্তার মেয়ের ঘরের নাতি, না ছেলের ঘরের?'

'মেয়ের ঘরের।'

'কোন মেয়ের?'

'মেজ মেয়ের।'

বুড়ো ভুরুর ওপর একটা হাত রেখে খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিল। তারপর বলল, 'যার নাম উমা তার ছেলে?'

বুড়ো দেখছি সবার খবর রাখে। বললাম, 'হ্যাঁ।

'বড়ো ভালো মেয়ে তোমার মা। আমরা যখন হেম কর্তার জমিতে কাজ করতে যেতাম তোমার মা আমাদের লুকিয়ে চিড়ের মোয়া, খইয়ের মোয়া, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু এনে খাওয়াত। তোমার মা এখন কোথায় আছে? সোনারঙেই?'

বললাম, না। কলকাতা—'

বুড়ো বলল, 'ও, তা হলে তুমি থাক মামাবাড়িতে।'

এতসব কথা আমার ভালো লাগছিল না। বাড়ি ফেরার জন্য মনে মনে খুব অস্থির হয়ে উঠছিলাম! এমনিতেই দেড় দিন বাড়ি নেই, তার ওপর আরও দেরি করে গেলে দিদিমা কী যে করবে, বাড়িতে প্রৌছুবার পর অভ্যর্থনাখানা কিরকম হবে, এইসব চিন্তায় আমার মাথা তখন ঘুরছিল। বললাম, আমাদের এক্ষুনি বাড়ি পৌঁছে দাও—'

বুড়ো বলল, 'দেব তো নিশ্চয়ই। তবে এখন না। এখনও তোমাদের শরীর সুস্থ হয়নি। জলে ডুবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এবেলাটা লক্ষ্মীছেলের মতো শুয়ে থাক। ওবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

বিকেলে একটা সুন্দর ছইওলা নৌকোয় করে আমাদের চারজনকে সোনারঙে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিল বুড়ো চাষী। নৌকো বেয়ে নিয়ে যাবে দু'জন টগবগে জোয়ান মাঝি।

বুড়ো চাষীর বাড়ি থেকে আমরা যখন নদীর ঘাটে নৌকোয় উঠবার জন্য বেরুব, চরের সব লোক— বউ-মেয়ে ছেলে-বুড়ো বাচ্চা-কাচ্চা—আমাদের বিদায় দেবার জন্য এসে জড়ো হয়েছে! তারা শোভাযাত্রা করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে এল। বুড়োও এসেছিল। আমরা নৌকোয় উঠলে সে একটা ধবধবে ফর্সা কাপড়ের পুঁটলি আমার হাতে দিয়ে বলল, যেতে যেতে এগুলো খেও।' পুঁটলিটার ভেতর রয়েছে মুড়ি, মোয়া, নারকেল নাড়ু, বড়ো বড়ো ফেনি বাতাসা আর কদমা।

একসময় নৌকো চলতে শুরু করল। একটু একটু করে আমরা দূরে সরে যেতে লাগলাম। চরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বুড়ো চাষী আর চরের লোকেরা হাত নাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে নদীর মাঝখানে চলে এলাম; এখান থেকে বুড়ো চাষীদের আর দেখা যাচ্ছে না।

কালকের সেই মেঘ আজ আর নেই। আকাশ ঝক ঝক করছে। নদী খুব শান্ত। চুপচাপ গা এলিয়ে সেটা যেন শুয়ে আছে।

উত্তরদিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছিল। মাঝিরা পাল খাটিয়ে দিল। নৌকোটা তীরের মতো জল কেটে কেটে ছুটতে লাগল।

নৌকোয় উঠে আমরা কেউ একটা কথাও বলিনি। যত বাড়ির দিকে এগুচ্ছি বুকের ভেতরটা ততই ঢিব ঢিব করছে। কার ভাগ্যে কী আছে, কে জানে।

তিন

বেশ রাত করেই বাড়ি পৌছুলাম। দিদিমা জেগেই ছিল। দিদিমা একাই না, সোনারঙের মল্লিক বাড়ির ফণি মল্লিক, গোঁসাই মাড়ির রাধেশ্যাম গোঁসাই, পাকড়াশী বাড়ির হেরম্ব পাকড়াশী এমনি অনেকে তাকে ঘিরে বসে আছে। দুধারে দুটো হেরিকেন জ্বলছে।

উঠোনের কাছে এসে আমি আর বিনু থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর এগুতে সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পারছি, আমাদের সম্বন্ধেই দিদিমাদের কথাবার্তা হচ্ছে। থেকে থেকে দিদিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল আর বলছিল, 'আসুক একবার তারা; হাড় একেবারে থেঁতো করে ফেলব।'

আমাদের দেখাদেখি সেই মাঝিদুটোও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা বলল, 'দাঁড়ালে কেন বাবুরা—চল।'

আমরা আর কি এগুই? সামনে পা না বাড়িয়ে সট করে দু'জনে মাঝি দুটোর পেছনে চলে গেলাম।

মাঝিরা অবাক হয়ে বলল, 'কী হল গো তোমাদের?'

চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বললাম, 'তোমরা আগে যাও—'

মাঝি দুটো কি বুঝল তারাই জানে। ওখানে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হেম কর্তার নাতিদের নিয়ে এসেছি।'

চমকে দিদিমারা এদিকে তাকাল। তারপর বুড়ি চিৎকার করে বলল, 'কোথায়, কোথায়?' বলেই একদৌড়ে উঠোন পেরিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। মাঝিদের পেছন

থেকে বিনুকে আর আমাকে টেনে বার করল প্রথমে, তারপর বুকের ভেতর পুরে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ওরে তোরা আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল—'

তখনই বুঝে ফেললাম, বুড়ি আমাদের আর মারবে না!

দিদিমা সমানে বলে যাচ্ছিল আর কাঁদছিল, ওরে দস্যিরা, ওরে ডাকাতেরা—তোদের মনে এই ছিল! তোরা আমার হাড় ভাজা ভাজা করে ফেললি রে—'

আমরা টুঁ শব্দটি করছিলাম না। বুড়ি মারবে না বুঝতে পারার পরও বুকের ঢিবঢিব কিন্তু কমছিল না।

দিদিমা আমাদের বারান্দায় বসিয়ে সেই মাঝিদের দিকে ফিরল। তারা আমাদের কোথায় পেয়েছে, কিভাবে এখানে নিয়ে এল—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। সব শুনে দু'জনকে আর সেই বুড়ো চাষীকে অনেক আশীর্বাদ করল। সে রাতে তাদের আর চরবেহুলায় ফিরতে দিল না। কাছে বসিয়ে আদর করে খাইয়ে দাইয়ে নিজের হাতে ধবধবে বিছানা পেতে শুতে দিল।

আমাদের একই সঙ্গে খাইয়ে দিয়েছিল বুড়ি। আগে আমরা টিনের দোতলায় শুতাম। খাওয়া-দাওয়ার পর দোতলার দিকে পা বাড়াতে যাব, দিদিমা গম্ভীরগলায় বলল, 'ওদিকে নয়, আজ থেকে তোমরা আমার কাছে শোবে।'

বিনু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে শোব কেন?'

ভুরু কুঁচকে দিদিমা বলল, 'তোমাদের শয়তানি আমি ধরে ফেলেছি। জানালার দুটো শিক আলগা করে আমার চোখে অনেক ধুলো দিয়েছ। আর না।'

এতদিন আমরা যাচ্ছিলাম, পাতায়, পাতায়, দিদিমা ডালে ডালে। বুঝতে পারলাম বুড়ি পাতা থেকে এক ধাক্কায় আমাদের ডালে নামিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে পাতায় চড়ে বসেছে। কী আর করা যাবে, এখন বুড়িরই দিন।

বুড়ি দারুণ হুঁশিয়ার। করলে কি, আমাদের তার ঘরে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে দরজায় তালা লাগাল। দরজার ভেতর দিকে তালা লাগাবার জন্য দুটো লোহার কড়া ছিল।

তালা তো লাগানো হল। তারপর বুড়ি কী করল বল দেখি? বলতে পারছ না তো! বেশ আমিই বলে দিচ্ছি। আমাদের মামাবাড়িতে রান্নাবান্না আর ঘরের কাজ করার জন্য একটা মাঝবয়সী বিধবা ছিল; তার নাম কালী। আমরা তাকে বলতাম কালীমাসী। কালীমাসি রাত্তিরে অন্য ঘরে থাকত। তাকে ডেকে দিদিমা জানলা দিয়ে চাবিটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'কাল সকালে দিবি।'

বুড়ির চালাকিটা বুঝে দেখ। দরজার ভেতর থেকে খিল কি ছিটকিনি লাগানো থাকলে পাছে আমরা খুলে বেরিয়ে যাই, তাই তালা লাগিয়েছিল। ঘরে চাবি থাকলে সেটা কোনোরকমে হাতিয়ে তালাটা খুলে ফেলাও যায়। সেইজন্য চাবিটা ঘরের বাইরে বের করে নিল। আর আমরা ভেতরে বন্দী হয়ে রইলাম।

দিদিমার এই ঘরটার মাঝমধ্যিখানে মস্ত তক্তাপোষে বিছানা পাতা রয়েছে। একধারে হেরিকেন জ্বলছিল।

আমরা তক্তাপোষের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরের চাবিটা কালীমাসির হাতে দিয়ে দিদিমা আমাদের কাছে চলে এল। বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, এবার শুয়ে পড়।'

এভাবে জেলখানার কয়েদীদের মতো বন্দী করে রাখার জন্য মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা ধলেশ্বরীতে গিয়ে যা কাণ্ড করে এসেছি তাতে দিদিমার মুখের ওপর টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না। মুখ বুজে দু'জনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দিদিমাও হেরিকেন নিভিয়ে আমাদের পাশে এসে শুল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর দিদিমা বলল, 'কিরে হাড় বজ্জাতেরা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

আমাদের ঘুম আসেনি। বললাম, 'না। কেন?'

'তোমাদের জন্য ভেবে ভেবে তিনটে দিন ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি। দু'জনে মিলে আমাকে মেরেই ফেলিছিস।' বলতে বলতে দিদিমা থামল। কিছুক্ষণ বাদে আবার বলল, 'তোদের নিয়ে আর পারি না। এমনিতেই বজ্জাতি করে করে আমার হাড় কালি করে দিয়েছিস। তার ওপর রাত্তিরে এ রকম করে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে বেঘোরে মরে পড়ে থাকবি, তখন ষোলকলা একেবারে পূর্ণ হয়। বল্ তখন তোদের মা-বাপদের কাছে কী করে মুখ দেখাব?'

এ গল্প যারা পড়ছ তাদের একটা কথা জানা দরকার। বিনুর আর আমার বাবা-মা'রা আমাদের ছোটো ভাইবোনদের নিয়ে কলকাতায় থাকত।

দিদিমার কথা শুনে আমরা চুপ করে থাকলাম। বুড়ি তো আর মিথ্যে কিছু বলছে না; তার কথার প্রত্যেকটা অক্ষর সত্যি।

দিদিমা আবার বলল, 'এ ভাবে আর চলতে পারে না। তোদের সম্বন্ধে একটা কথা ভাবছি।'

বিনু ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা গো দিদিমা?'

'সেটা এখন নয়, কাল বলব।'

পরের দিন সকালে চরবেহুলার সেই মাঝিদুটোকে চিড়ে-মুড়ি-দুধ ক্ষীর-কলা আর পাটালি গুড় খাইয়ে পুঁটলিতে করে অনেক খাবার দাবার বেঁধে দিল দিদিমা। এ ছাড়া দুজনকে পাঁচটা করে টাকাও দিল। আমাদের বাঁচিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বলে নতুন করে আরেকবার আশীর্বাদ করল।

মাঝিরা দিদিমাকে প্রণাম-ট্রনাম করে চলে গেল। এবার বুড়ি আমাদের সকালবেলার খাবার খেতে দিল।

আমরা খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ বোমা ফাটাবার মতো করে দিদিমা বলল, 'তোদের সম্বন্ধে যা ভেবেছি এবার বলি।'

ভয়ে ভয়ে তাকালাম। বুড়ির মাথায় কী মতলব ঘুরছে কে জানে।

বুড়ি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। চোখ কুঁচকে দু'জনের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাদের আর এখানে রাখব না।'

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'তা হলে আমরা কোথায় থাকব?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতায়!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ-কলকাতায়। যে যার বা-বাপের কাছে থাক গিয়ে। আমি আর কারো ঝক্কি

নিতে পারব না। তোমরা কোথায় কি করে বেড়াবে সেজন্য সবসময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকব, সেটি আমার দ্বারা আর হচ্ছে না। অনেক আক্কেল হয়ে গেছে। লোক খুঁজছি; পেলেই তার সঙ্গে তোমাদের কলকাতায় চালান করে দেব।'

শুনতে শুনতে আমাদের চোখ ফেটে জল এসে যাচ্ছিল। এই সোনারঙ গ্রাম, চারদিকে খাল বিল, ধলেশ্বরী নদী, মাথার ওপর মস্ত বড়ো আকাশ, ধানের খেত, পাটের খেত, কাজিবাড়ি গোঁসাইবাড়ির বন্ধুরা—এদের ছেড়ে কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করছিল না।

আমরা অনেক কান্নাকাটি করলাম। বললাম, 'জীবনে আর কখনও এরকম কাজ করব না।'

বুড়ি আমাদের কথা শুনলই না। গম্ভীর মুখ করে শুধু বলল, 'কলকাতায় তোমাদের যেতেই হবে।'

এরপর আমরা নাক মূললাম, কান মুললাম। তবু বুড়িকে টলানো গেল না। সে হিমালয়ের মতো অটল হয়ে রইল। আর সেই একই কথা বলতে লাগল, 'কলকাতায় তোমাদের যেতেই হবে।'

আমরা আর কী করতে পারি বল। মনের দুঃখে মুখ চুন করে রইলাম।

আমাদের কলকাতায় পাঠাবার জন্য দিদিমা একজন চড়নদার খুঁজছিল। যে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাকে চড়নদার বলে।

কিন্তু মনের মতো চড়নদার পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই দিদিমা আমাদের দুজনকে চোখে চোখে রাখছিল; এক মুহূর্তের জন্য বুড়ি চোখের আড়াল হতে দিত না। সে আমাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল। দিনের বেলাটা তবু উঠোন-টুঠোনে একটু বেরুতে পারতাম। কিন্তু সন্ধে হলেই দিদিমা আমাদের তার সেই ঘরখানায় পুরে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে চাবিটা কালীমাসির হাতে দিয়ে দিচ্ছিল।

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল। এগারো দিনের দিন ঠিক দুপুরবেলা, আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছি হঠাৎ হুইসিলের মতো সরু গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, 'এলাম গো সোনাকাকিমা—'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম— গদু চক্কোত্তি।

দিদিমাও আমাদের কাছাকাছি বসে রোদে গা সেঁকছিল। ঘরে বসে একগাল হেসে বলল, 'আরে গদু! আয় আয়। অনেকদিন পর এবার এলি।'

গদুর চেহারাখানা দেখার মতো। ঢ্যাঙা ডিগডিগে শরীর, গলাটা প্রায় দেড়ফুট লম্বা, তার ওপর হাঁড়ির মতো পেল্লায় একখানা মাথা। গোল গোল চোখ, মুখে খাপচা দাড়ি। বুকটা সরু, তার তলায় বিশ নম্বর কড়াইয়ের মতো পেট।

গদুর পরনে একটা ধুতি। ধুতিটা কোমরে নয়, বুকের ওপর বাঁধা রয়েছে। এই কাপড়টা ছাড়া আর কিছুই পরেনি। তবে ডান কাঁধে একটা ফতুয়া আর পাটকরা চাদর রয়েছে। বাঁ কাঁধে লাঠির ডগায় একটা পুঁটলি ঝুলছে। পুঁটলিটায় কী আছে আমরা জানি। একটা গামছা, একটা ধুতি আর বারো শিশি কবিরাজী হজমি গুলি। একগাদা হজমি গুলির শিশি কেন রয়েছে, তোমরা হয়তো ভাবতে পার। কিন্তু সেটা এখন বলছি না। একটু ধৈর্য ধর।

গদুর বয়সটা বলে দিই— এই পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের মতো হবে। আমার দিদিমাকে সে সোনাকাকিমা বলত।

দিদিমা ডাকতেই তার কাছে এসে কাঁধের পুঁটলি আর ফতুয়া চাদর নামিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল গদু।

দিদিমা বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলি?'

'ফরিদপুর জেলায় গিয়েছিলাম।'

'সেখানে কী?'

গদু একটু হাসল, উত্তর দিল না।

দিদিমা আবার বলল, 'ফরিদপুর গিয়েছিলি কেন?'

গদু ঘাড় নিচু করে যেন কত লজ্জা পেয়েছে এভাবে বলল, 'ওখাদে কিরকম খাইয়ে লোক আছে দেখতে গিয়েছিলাম। চ্যালেঞ্জও করলাম।'

খাইয়ে বলতে যারা প্রচুর খেতে পারে সেইরকম লোক। এ গল্প যারা পড়ছ তারা নিশ্চয় ভাবতে শুরু করেছ গদু চক্কোত্তি খাইয়ে লোকদের চ্যালেঞ্জ করতে গিয়েছিল কেন? তার উত্তরে বলছি, আরেকটু ধৈর্য ধরে থাক।

দিদিমা জিজ্ঞেস করল, 'তা কিরকম খাইয়ে লোক দেখলি?'

গদু মুখে কিছু বলল না। ঠোঁট উলটে দু'হাতের দুটো বুড়ো আঙুল নাচাল শুধু। তার মানে তেমন লোকের দেখা সে ফরিদপুরে গিয়ে পায়নি।'

দিদিমা এবার বলল, 'যাক গে, তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। ভগবানই তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

বুড়ি কী বলতে চায় ঠিক বুঝতে না পেরে গদু চক্কোত্তি একটু অবাকই হল যেন। বলল, 'কী ব্যাপার সোনাকাকিমা?'

ধলেশ্বরীতে গিয়ে বিনুর আর আমার মরতে মরতে বেঁচে যাবার ঘটনাটা জানিয়ে দিয়ে দিদিমা বলল, 'এই হনুমানদুটোকে কলকাতায় ওদের মা-বাপের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পারবি?'

গদু চক্কোত্তি বলল, 'কেন পারব না? রাহাখরচ (রাস্তার খরচ) দিলেই চলে যাব।'

দিদিমা বলল, 'রাহা খরচ দেব না তোকে কে বললে! না দিলে তুই যাবিই বা কেন?'

ঠিক হয়ে গেল পঞ্জিকায় একটা ভালো দিন দেখে দু-চারদিনের মধ্যেই গদু আমাদের কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। যে ক'দিন ভালো দিন পাওয়া না যাচ্ছে সে ক'টা দিন গদু আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

চার

গদু চক্কোত্তি লোকটা কে, কী করে বেড়ায়—এসব সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

লোকটার কোথায় কোন দেশে বাড়ি, আমিও ঠিক জানি না। তবে শুনেছি তার কেউ নেই। বাবা-মা-ভাই-বোন, কেউ না। গদু বিয়ে টিয়েও করেনি।

লোকটার একটা ডেসক্রিপসান তোমাদের আগেই দিয়েছি। কোমরের বদলে বুকের কাছে কাপড়ের গিঁট দিয়ে, এক কাঁধে ফতুয়া আর চাদর, আরেক কাঁধে লাঠির ডগায় একটা পুঁটলি ঝুলিয়ে এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে দিগ্বিজয় করে বেড়াত সে।

এই দিগ্বিজয়ের ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলা দরকার।

গদু চক্কোত্তি ছিল দুর্দান্ত খাইয়ে লোক। খাওয়া-দাওয়ার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না সে। চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে শুধু খাওয়ার কথাই চিন্তা করত। এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাওয়ার স্বপ্নই সে দেখত। খাওয়াই ছিল তার একমাত্র কাজ। লোকে কতরকম কাজ করে। কিন্তু খাওয়াটি ছাড়া আর কিছুই করত না গদু।

তোমরা হয়ত ভাবছ, যে কাজ করে না সে এত খাওয়া কোথায় পেত? তাহলে পূর্ব বাঙলা সম্বন্ধে তোমাদের আরও কিছু খবর দিতে হয়। আটাশ ঊনত্রিশ বছর আগে পূর্ব বাঙলায় ছিল অঢেল খাবার। খালে বিলে নদীতে প্রচুর মাছ, খেত ভর্তি ধান, ঘরে ঘরে দুধের স্রোত বয়ে যেত।

এত যখন খাবার-দাবার তখন গদুর আর চিন্তা কী। আর পূর্ব বাঙলায়—আমাদের সেই ঢাকা জেলায় গ্রাম তো আর একটা দুটো না—গণ্ডা গণ্ডা। এ গ্রামে নয় ও গ্রামে, এ বাড়িতে নয় ও বাড়িতে রোজই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার লেগেই থাকত। যেমন ধর অন্নপ্রশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ—এইসব আর কি।

নেমন্তন্ন না করলে তোমরা নিশ্চয়ই বিয়েবাড়ি কি অন্নপ্রাশনের বাড়ি যাও না। কিন্তু আমাদের সেই ঢাকা জেলায় গদু চক্কোত্তির নেমন্তন্নে দরকার হত না। সব বাড়ির দরজাই তার জন্য খোলা। সবাই তাকে চিনত।

কোন বাড়িতে বিয়েটিয়ে হলে গদু ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যেত। তার নাকটা ছিল দারুণ। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে হাওয়ায় ভোজের গন্ধ পেত সে।

ভোজের বাড়িতে গদু ঢুকলেই সবাই খুশি হয়ে উঠত। চারদিক থেকে লোকজন চেঁচামেচি জুড়ে দিত, 'গদু এসেছে, গদু এসেছে।' কিংবা 'চক্কোত্তি এসেছে, চক্কোত্তি এসেছে।' বাড়ির কর্তা দৌড়ে এসে বলত, 'এস হে গদু। তোমার কথাই আমরা ভাবছিলাম। তুমি না থাকলে কি ভোজবাড়ির মজা জমে, নাও একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে বসে পড়।'

গদু করত কি, হাত পা ধুয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে-টিরিয়ে ভোজের আসরে গিয়ে বসত। তার মধ্যে আরও অনেকে খেতে বসে গেছে।

বাড়ির কর্তা এবং অন্যরা বলত, 'চক্কোত্তি তোমার কেরামতি দেখতে চাই।'

কেরামতি বলতে প্রচুর খাওয়া। গদু বলত, 'একলা একলা কি কেরামতি দেখানো যায়। চ্যালেঞ্জ করার লোক না পাওয়া গেলে কি গা গরম হয়? আর গা গরম না হলে কি খাওয়া যায়? পাল্লা দেবার মতো এক আধ জন লোক দিন।'

যে গ্রামে ভোজবাড়ি সেখানকার সব চাইতে নামকরা খাইয়েকে তক্ষুনি ধরে এনে গদুর সামনে মুখোমুখি বসিয়ে দেওয়া হত।

গদুকে কে আর না চেনে; সেই খাইয়ে লোকটাও তাকে চিনত। সে হাতজোড় করে বলত, 'আমি কি আর কর্তাঠাকুরের সঙ্গে পারব? কার সঙ্গে কার পাল্লা!' গদুকে বেশির ভাগ লোকই বলত কর্তাঠাকুর।

রাজা-রাজড়ারা যেভাবে তাদের অনুগত প্রজাদের দিকে তাকায় তেমন করে লোকটাকে একবার দেখে নিয়ে গদু বলত, 'পারাপারির কথাই আসে না। একজন সামনে বসলে খাওয়ার ইচ্ছাটা হয় আর কি। তা ছাড়া খাওয়া একটা শিক্ষার ব্যাপার। আমার সামনে বসলে এই ব্যাপারটা শিখে নিতে পারবে। নাও শুরু করে দাও—'

অগত্যা কি আর করা, লোকটা পাতে হাত দিত। এদিকে বাড়ির লোকজন বিয়ে-টিয়ে ছেড়ে গদুর খাওয়া দেখতে চলে এসেছে। এমন কি যারা খেতে বসেছিল তারাও উঠে এসে গোল হয়ে গদুদের খাওয়া দেখত।

ততক্ষণে লুচি এসে গেছে। গদু তেত্রিশখানা লুচি হয়তো এক বেগুনভাজা দিয়েই খেয়ে ফেলল। সেই খাইয়ে লোকটাও তেত্রিশখানাই খেল বেগুনভাজা দিয়ে। তারপর এল ডাল। ডাল দিয়ে বেয়াল্লিশখানা লুচি খেল গদু। সেই লোকটাও তাই খেল। তবে তার চোখদুটো কেমন যেন ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে।

ডালের পর হয়তো এল আলুকপির তরকারি। দশটা লুচি খাবার পর উল্টোদিকের সেই লোকটা হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ত। হাতজোড় করে বলত, 'আর পারব না কর্তাঠাকুর।' বলেই কোনরকমে উঠে লোকের কাঁধে চড়ে বাড়ি চলে যেত।

লোকটা চলে যাবার পর গদু বলত, 'আর কেউ পাল্লা দেবার আছে?'

কে আর পাল্লা দেবে বল। আগের লোকটার দশা দেখেই সবার হয়ে গেছে।

কেউ যখন আর চ্যালেঞ্জ জানাতে আসত না তখন খুবই মনমরা হয়ে মিনিট দশেক বসে থাকত গদু চক্কোত্তি। তারপর হুস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলত, 'আজকালকার লোকজন আর খেতেই পারে না। এভাবে চললে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা দেশ থেকে উঠেই যাবে।'

শুধু ঢাকা জেলাতেই না, মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য পূর্ব বাঙলার অন্য সব জেলা— যেমন ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, কুমিল্লা—এসব জায়গাতেও দিগ্বিজয়ে বেরুত গদু চক্কেত্তি। কিছুদিন পর ফিরে এসে বলত, 'নাঃ, যাওয়াই সার। পাল্লা দেবার লোক কোথাও নেই।' কখনও কখনও বা বলত, 'শুনেছি আসামের চা-বাগানে কিছু খাইয়ে লোক আছে। একবার সেখানে যাব ভাবছি।'

মোট কথা, গোটা পূর্ব বাঙলা জুড়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল গদু চক্কোত্তি।

পাঁচ

এবার আমরা আবার আসল গল্প ফিরে যাই।

গদু চক্কোত্তি আসার তিন দিন পর পাঁজিতে একটা ভালো দিন পাওয়া গেল। ওই তারিখেই আমরা তার সঙ্গে কলকাতায় চলে যাব।

আমাদের বাড়ি থেকে নৌকোয় করে প্রথমে যাব তারপাশায়। সেখান থেকে স্টিমার ধরে গোয়ালন্দে। গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে করে কলকাতা।

আমাদের রওনা হবার কথা সকাল দশটায়। দশটার সময় নৌকোয় উঠলে সন্ধের আগে আগে তারপাশা পৌঁছুব।

সোনারঙ ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেজন্য বিনু আর আমার মন ভীষণ খারাপ। ভোর থেকেই রাশেদ, সুখেন, জিতেন, গণেশ, ডাকু আমাদের বাড়িতে এসে বসে আছে। ওরা আজ আর স্কুলে যায়নি। ওদের মন খুব খারাপ। নৌকোডুবির পর ওরাও আরেকটা চরে আটকে গিয়েছিল। সেখানকার লোকেরা ওদের সোনারঙে পৌঁছে দিয়েছে।

বেলা একটু বাড়ালে দিদিমা আমাদের চান করিয়ে খাইয়ে দিল। কিন্তু খেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। বুকের ভেতর কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠে আসছিল। খেতে খেতে শেষ বারের মতো বিনু আর আমি বললাম, 'দিদিমা আর কখনো দুষ্টুমি করব না। তুমি আমাদের কলকাতা পাঠিও না। এবার থেকে তুমি যা বলবে তাই করব।'

কিন্তু বুড়ির মুখ দিয়ে একবার যা বেরিয়েছে তার নড়নচড়ন হল না। গম্ভীর গম্ভীর গলায় শুধু বলল, যেতে তোমাদের হবেই। একটু থেমে আবার বলল, 'এখন যা বলছ, অনেক আগেই সেইমতো চলা উচিত ছিল। সুবুদ্ধি হতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

আমরা আর কী করব, যে কান্নাটা উঠে আসছিল সেটাকে ঠেলে ঠেলে নীচে নামিয়ে দিলাম।

গদু চক্কোত্তিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর জামা-প্যান্ট পরতে পরতে বেরুবার সময় হয়ে গেল। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় রওনা হলাম।

আমাদের বাড়ির পেছনদিকে সেই খালটায় মজিদ মাঝির ছইওলা নৌকো বাঁধা ছিল। মজিত আর তার খুড়তুতো ভাই আরশাদ আমাদের নিয়ে তারপাশায় যাবে।

বিনু আমি আর গদু চক্কোত্তি খালপাড়ে গিয়ে নৌকোয় উঠতেই মজিদেরা নৌকো ছেড়ে দিল। দিদিমা কালীমাসি আর বাড়ির অন্য লোকেরা আমাদের সঙ্গে এসেছিল। দিদিমা ভারী গলায় মাঝিদের বলল, 'মজিদ আরশাদ ভালোভাবে ওদের পৌঁছে দিবি।' বুড়ির চোখ এতক্ষণে জলে ভরে গেছে।

মাঝিরা বলল, 'আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মা।'

দিদিমা এবার বলল, 'দুর্গা দুর্গা—'

রাশেদরাও খালের ঘাটে এসেছিল। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা খালের পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। আমরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলাম। দেখাদেখি রাশেদরাও কাঁদছিল আর বলছিল, 'তোরা চলে যাচ্ছিস; আর তোদের সঙ্গে দেখা হবে না।'

কান্নায় গলা ভারী হয়ে বুজে আসছিল। আমরা বলছিলাম, 'রাশেদ ডাকু জিতেন সুখেন, তোরা আমাদের ভুলে যাস না। চিঠি লিখিস।'

'লিখব, নিশ্চয়ই লিখব। তোরাও আমাদের ভুলিস না।'

খালটা মাইল খানেক যাবার পর ছোটো নদী ইচ্ছামতীতে পড়েছে। ইচ্ছামতী ধরে আরো খানিকটা যাবার পর আমরা বড়ো নদীতে গিয়ে পড়ব। বড়ো নদী দিয়েই আমাদের তারপাশায় যেতে হবে।

খালটা যেখানে গিয়ে ইচ্ছামতীতে মিশেছে সুখেনরা নৌকোর সঙ্গে দৌড়ুতে দৌড়ুতে সেই পর্যন্ত চলে এল। আমাদের নৌকো নদীতে নেমে যাবার পর ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু একটু করে আমরা মাঝনদীর দিকে চলে যাচ্ছি আর রাশেদরা দূরে সরে যাচ্ছে।

যতক্ষণ ওদের দেখা গেল তাকিয়ে রইলাম। একসময় ছোটো হতে হতে রাশেদরা

অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা ছইয়ের ভেতরে চলে এলাম। সেখানে গদু চক্কোত্তি আগে থেকেই বসেছিল।

গদু বলল, কান্নাকাটি শেষ হল?

আমরা চুপ। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইলাম।

নৌকোয় ওঠার পর দু ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখন বারোটার মতো বাজে। সূর্যটা সোজা মাথার ওপর এসে উঠেছে।

নদীর চারধারে আরও অসংখ্য নৌকো সাদা সাদা পাল খাটিয়ে রাজহাঁসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর ছিল ঝাঁক ঝাঁক জেলেডিঙি। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা ধবধবে মেঘ জমাট বেঁধে আছে। উত্তর দিক থেকে জোর হাওয়া বইছিল।

হঠাৎ গদু চক্কোত্তি ডেকে উঠল, 'অ্যাই ছোকরারা—'

চমকে আমরা মুখ তুললাম। আর তক্ষুনি গদুর সঙ্গে আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল। একটু হেসে গদু জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম বোধ করছিস?'

গদু কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইলাম।

গদু বলল, 'আমরা ক'টার সময় ভাত খেয়েছি রে।'

বিনু আস্তে করে বলল, 'ন'টার সময়।'

গলাটাকে ছইয়ের বাইরে বার করে একবার সূর্যটা দেখে নিল গদু।

তারপর বলল, 'এখন বারোটা বেজেছে, কি বলিস?'

আমরা ঘাড় হেলিয়ে দিলাম। গদু বলল, 'তিন ঘণ্টা আগে খেয়েছি সব পেটের ভেতর ভস্ম হয়ে গেছে, তাই না রে?'

উত্তর দিলাম না।

গদু বলতে লাগল, তা ছাড়া নদীর খোলা হাওয়ায় কিঞ্চিৎ খিদের উদ্রেক হয়েছে। তোদের হয়নি?'

এই কিছুক্ষণ আগেই খেয়েছি। তা ছাড়া মামাবাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য মন খুব খারাপ হয়ে আছে। খিদেটিদে আমাদের কিছুই পাচ্ছে না। বললাম, 'না'।

গদু খুব খুশি হয়ে বলল, 'খুব ভালো কথা। ছেলেপুলেদের অত খাই খাই ভালো না। তা হলে আমিই একটু জলযোগ করে নিই।'

ও হো, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, রাস্তায় আমাদের খাবার জন্য দিদিমা তিন সের পাতলা ফুরফুরে চিড়ে, দু হাঁড়ি রসগোল্লা, তিনডজন অমৃতসাগর কলা, দু সের পাতক্ষীর আর সের দেড়েক গোল গোল মুছি গুড় দিয়েছিল। আর দিয়েছিল নারকেল নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, চিনিবাতাসা, কদমা ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব খাবারদাবার একটা বেতের ঝুড়িতে সাজানো ছিল!

চিড়ের পুঁটলি রসগোল্লার হাঁড়ি খুলে গদু চক্কোত্তি মাঝিদের বলল, 'তোরা খাবি নাকি রে?'

মাঝিরা যে যার বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিল। তবু এত খাবার-দাবার দেখে আর লোভ সামলাতে পারল না। তাদের চোখ চকচক করছিল, জিভে জল এসেছিল। তারা বলল, দিলে খাব না কেন কর্তাঠাকুর দিন না।'

গদু বলল, 'তোদের না দিলে রেহাই আছে। নজর দিয়েই আমার বারোটা বাজিয়ে ফেলবি।'

দু মুঠো করে চিড়ে, একটা করে কলা, দুটো করে রসগোল্লা, একটা করে নাড়ু আর খানিকটা করে পাটালি গুড় মাঝিদের দিয়ে নিজে খেতে শুরু করল গদু চক্কোত্তি।

নৌকো স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। গদুও একমুঠো একমুঠো করে চিড়ে মুখে ফেলছে, সেই সঙ্গে দুটো করে রসগোল্লা কিংবা আধ খানা কলা কিংবা এক খাবলা পাতক্ষীর নইলে খানিকটা মুছি গুড়।

অনেকক্ষণ খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ কি মনে পড়তে গদু নড়ে চড়ে বসল। ব্যস্তভাবে আমাদের বলল, 'না বাবু, তোদেরও কিছু খেতে হবে।'

বিনু আর আমি গলা মিলিয়ে বললাম, 'আমাদের খিদে পায় নি তো।'

'না পেলেও খেতে হবে। তোদের দিদিমা খাবার দিয়েছে। পরে বলে বেড়াবি আমি একাই খেয়েছি। সেটি হবে না নে খা—' বলেই একমুঠো করে চিড়ে, আঙুলের ডগায় এক চিমটি করে পাতক্ষীর, আধখানা করে কলা, একটু করে গুড়, একটা করে নাড়ু আমাদের দিল। তারপর আবার খাওয়া শুরু করল। খেতে খেতে আরামে তার চোখ বুজে আসতে লাগল।

ছোটো নদী থেকে নৌকো যখন বড়ো নদীতে এসে পড়ল তখন বিকেল। এর মধ্যে কলার কাঁদি, রসগোল্লার হাঁড়ি, চিড়ের পুঁটলি গুড়ের বাক্স—সব সাবাড়।

তোমরা এবার হিসেব করে দেখ, দুই মাঝিকে আর আমাদের কতটুকু করে রসগোল্লা কলা-টলা দিয়েছে গদু আর নিজে কতটা খেয়েছে।

ছয়

সন্ধের খানিকটা আগে আগে আমাদের নৌকো তারপাশার স্টিমারঘাটে পৌঁছে গেল। জেটিতে স্টিমার দাঁড়িয়েই ছিল।

আমরা নৌকো থেকে নেমে প্রথমে এলাম টিকিট ঘরে। সেখান থেকে গদু চক্কোত্তি কলকাতার টিকিট কেটে নিল। জেটি পেরিয়ে একটু পর স্টিমারে গিয়ে উঠলাম।

একটা কুলি আমাদের মালপত্তর বিছানা মাথায় করে নিয়ে এসেছিল। গদু চক্কোত্তি তাকে দিয়ে ডেকের একধারে বিছানা পাতিয়ে নিল; তারপর ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে বিদায় করল।

আজ রাত্তিরটা স্টিমারেই কাটাতে হবে। কাল সকালে আমরা গোয়ালন্দে পৌঁছুব।

স্টিমারটা ছাড়বে বেশ রাত করে। আমরা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় এসে বসলাম।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। চারিদিকে আগুনতি আলো জ্বলে উঠল। আলোয় আলোয় ঝলমলে তারপাশা স্টিমারঘাটটা ভারি সুন্দর দেখাতে লাগল।

এদিকে আরও অনেক প্যাসেঞ্জার উঠে আমাদের চারপাশে বিছানা পেতে নিয়েছে। এবারও গোয়ালন্দে যাবে। এদের মধ্যে দু-একজন বেশ আলাপী। গায়ে পড়েই তারা আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইল। আমরা কোথায় থাকি, গ্রামে নাম কী, কোথায় যাচ্ছি, বাবা কী করে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞেস করল।

আমাদের কথা বলতে ভালো লাগছিল না। ইচ্ছা হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম, ইচ্ছা না হলে দিচ্ছিলাম না, তবে গদু চক্কোত্তি তাদের সঙ্গে সমানে বকর বকর করে যাচ্ছিল।

রাত একটু বাড়লে গদু আমাদের স্টিমারের ক্যানটিন থেকে ভাতটাত খাইয়ে আনল। তবে নিজে কিছু খেল না। কারণ সে ব্রাহ্মণ মানুষ স্টিমারে নানা জাতের লোক রয়েছে। পাছে তাদের ছোঁয়া-টোঁয়া লেগে তার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে সে খাবে না।

এর মানেটা বুঝতে পারছ তো? গোটা রাত তাকে না খেয়ে থাকতে হবে।

ক্যানটিন থেকে খেয়ে আসার পর আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। গদু কিন্তু শুতে পারছিল না। এই হয়ত শুচ্ছিল, আবার তক্ষুনি উঠে পড়ছিল। আর গজর গজর করছিল, 'আমি মরে যাব, নির্ঘাত মরে যাব। কার্তিক মাসের এত বড়ো শীতের রাত। এই রাত যদি উপোস দিয়ে থাকতে হয়, না মরে উপায় আছে।'

আমরা তার কথা শুনছিলাম ঠিকই, তবে উত্তর দিচ্ছিলাম না। চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছিলাম।

খানিকক্ষণ নিজের মনে বক বক করে একসময় গদু আমাদের ডাকল, 'অ্যাই ছোকরারা—'

আমরা ভয়ে ভয়ে সাড়া দিলাম, 'কী বলছেন?'

'কাল সকালে যদি উঠে দেখিস আমি মরে গেছি, আমি দেহরক্ষা করেছি তবে বুঝবি এটা তোদেরই কাজ।'

আমরা চুপ।'

গদু থামেনি, 'হে ভগবান, একটা আস্ত রাত না খেয়ে থাকতে হবে। এরপরও কি আমি বেঁচে থাকব! অ্যাই ছোকরারা, চাদরের তলা থেকে মুণ্ডু বার কর।

কথামত মুণ্ডু বার করলাম।

গদু বলল, 'আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। যদি আমি সত্যিই মরে যাই তোদের ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে এটা মনে রাখিস।'

আমরা কী উত্তর দেব; ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে রইলাম।

গদু বলে যেতে লাগল, 'আর সেই পাপ থেকে কেউ তোদের রক্ষা করতে পারবে না। তোদের সাজা নরকবাস হবে।'

কথাটা একবার ভেবে দেখ। সকাল ন'টার সময় দেড় সের চালের ভাত, বড়ো বড়ো আঠারো টুকরো রুই মাছ, আট বাটি মুগের ডাল, আড়াই সের ঘন আঠালো দুধ আর বারোটা বড়ো বড়ো অমৃতসাগর কলা খেয়ে নৌকায় উঠেছিল গদু। তিন ঘণ্টা পর তিন সেরের মতো চিঁড়ে, ছ'টা কম দু হাঁড়ি রসগোল্লা, পাঁচটা কম তিন ডজন কলা প্রায় আড়াই সের পাতক্ষীর, মুছি গুড়, নাড়ু, কদমা ইত্যাদি পাকস্থলীতে চালান করেছে।

ভাবতে পার স্টিমারে উঠতে না উঠতেই এত এত খাবার ভস্ম করে ফেলেছে গদু। এখন আবার তার পেটে আগুন জ্বলছে।

গদু সমানে বকে যেতে লাগল। আমরা টুঁ শব্দটি করলাম না। তার গজগজানি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

ঘুম ভাঙল গদু চক্কোত্তির ডাকে, 'অ্যাই ছোকরারা ওঠ্ ওঠ্— উঠে পড়।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চোখ মেলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। আর আমাদের স্টিমারটা গোয়ালন্দে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর তারপাশা থেকে কখন স্টিমারটা ছেড়েছিল আর কখন সেটা গোয়ালন্দে এসেছে টের পাইনি।

কাল রাত্তিরে খিদের চোটে গদু যা করছিল তাতে ভাবতে পারিনি আজ সকালে উঠে তাকে জ্যান্ত দেখতে পাব।

বিনু চোখের কোণ দিয়ে গদুকে দেখতে দেখতে ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'এখনও বেঁচে আছে রে দাদা।'

আমিও বিনুর মতোই ফিসফিসিয়ে বললাম, 'তাই তো দেখছি।'

বিনুটা ভীষণ ফাজিল। সে বলল, 'কাল সকালে আর দুপুরে পেটে যা জমা করেছে তাতে দু মাস না খেলেও কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা দাদা—'

'কী?'

'ওর পেটে খাবার রাখার জন্যে ক্যাঙারুর মতো ডজন দশেক থলে আছে, না রে? না হলে এত খাবার রাখে কোথায়?'

'চুপ কর, শুনতে পাবে।'

বিনু চুপ করল না। বকবক করে যেতে লাগল, 'যাক একটা ব্যাপারে বাঁচা গেল।'

বিনুর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন ব্যাপারে রে?'

'গদু চক্কোত্তি মরেনি; আমাদেরও ব্রহ্মহত্যার পাপটা আর হল না।'

এদিকে কুলিরা জেটি থেকে সিঁড়ি বেয়ে বর্গীর মতো স্টিমারে হানা দিতে শুরু করেছিল। গদু একটা কুলি ঠিক করে তার মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দিল। তারপর কুলিটার পেছন পেছন আমরা প্রথমে জেটিতে, পরে জেটি থেকে পাড়ে নেমে এলাম।

নেমেই গদু বলল, 'সারা রাত উপোস দিয়েছি, শরীরে আর কিছু নেই।' আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'বুঝলি বাঁদরেরা, কোন রকমে রাতটা প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু মাথাটা বনবন করছে, বুক ধড়ফড় করছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। এখন যদি খাবারের দোকান একটা খুঁজে বার করতে না পারি নির্ঘাত মরে যাব। তোদের জন্যে আমি মরলাম, একেবারেই মরলাম। তাড়াতাড়ি পা চালা আর নজর রাখ কোথাও খাবারের দোকান চোখে পড়ে কি না।'

বেশিদূর যেতে হল না। হোটেলের টাউটরা চারদিক থেকে মাছির মতো ছেঁকে ধরল।

এখন আছে কিনা জানি না, সেই আটাশ উনত্রিশ বছর আগে গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটায় গণ্ডা গণ্ডা হোটেল ছিল।

এখানে একদিকে নদী। নদীর ওপর স্টিমারঘাটা। আর স্টিমার থেকে নামলেই একটু দূরে রেললাইন। ওখান থেকে কলকাতার ট্রেন পাওয়া যেত।

ট্রেন বা স্টিমার থেকে প্যাসেঞ্জাররা নামলেই হোটেলের লোকেরা ছেঁকে ধরত। নিজের নিজের হোটেল সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা বলে, নানারকম গুণগান করে ওরা প্যাসেঞ্জারদের টেনে নিয়ে যেতে চাইত।

চারিদিকে পঙ্গপালের মতো টাউটদের দেখে গদু চক্কোত্তি ঘাবড়ে গিয়েছিল। কারণ আগে আর কখনও সে গোয়ালন্দে আসেনি। গদু একবার এর মুখের দিকে তাকায়, একবার ওর মুখের দিকে, আর বলে, 'ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? আমাদের ঘিরে ধরেছে কেন? মারবে-টারবে নাকি?'

হোটেলের লোকেরা ততক্ষণে সুর করে বলতে শুরু করেছে, পাকা বাথরুম, খাবেন ভালো।' বলেই কেউ গদুর হাত ধরে, কেউ কাপড় ধরে, কেউ জামা ধরে টানতে শুরু করেছে।

অনেক কষ্টে লোকগুলোর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে গদু বলতে লাগল, 'আরে শকুনের মতো টানাটানি করছ কেন? তোমরা কারা?'

লোকগুলো কি ছাড়তে চায়! গা থেকে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিলেও আবার জোঁকের মতো আটকে যায় আর সমানে বলে, 'চলুন কর্তা। আমাদের পাকা বাথরুম, খাবেন ভালো।'

গদু চক্কোত্তি এবার খেপে উঠল, 'বার বার পাকা বাথরুম, খাবেন ভালো বলছ কেন? ব্যাপারখানা কি হে বাপু?'

হোটেলের টাউটরা তখন বুঝিয়ে দিল, তাদের প্রত্যেকেরেই হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালো এবং প্রত্যেকেরই ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাকা বাথরুম রয়েছে।

শুনে গদু চক্কোতি বলল, 'এই ব্যাপার। এতো বেশ ভালো কথা হে। আমরাও একটা খাওয়া-দাওয়ার জায়গাই খোঁজ করছি।' বলে প্রত্যেকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার করে দেখে নিল। তাদের মধ্য খেকে একটা মোটামুটি গোলগাল চেহারার লোককে পছন্দ করে বাকিদের ভাগিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও যাও, তোমরা যাও। আমরা এর হোটেলেই যাব।'

সেই লোকটা থেকে গেল। বাকিরা আর দাঁড়াল না, অন্য খদ্দের ধরার জন্য ছুটল।

গদু চক্কোত্তি লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোমার?'

লোকটা বলল, 'আজ্ঞে কর্তা, জনার্দন।'

'হোটেলের নাম?'

'পবিত্র চিত্তচমৎকারিণী হিন্দু হোটেল।'

'বা বা, খাসা নাম। কী বললে—চিত্তচমৎকারিণী! তা তোমাদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া করলে চিত্ত চমৎকার হবে তো?'

'হাজার বার হবে। একবার পায়ের ধুলো দিয়েই দেখুন না।'

'তা তো দেবই, তা তো দেবই। নইলে সবাইকে বিদায় করে তোমাকে রাখলাম কেন?'

জনার্দন হেঁ হেঁ করে একটু হাসল।

গদু চক্কোত্তি এবার বলল, 'বাবা জনার্দন, এবার বল তো তোমাদের হোটেলে খাদ্যখাদকের ব্যবস্থাটা কীরকম?' খাদ্যখাদক বলতে খাওয়া দাওয়ার মেনুটা কেমন হবে সেটাই জিজ্ঞেস করল আর কি।

'আজ্ঞে কর্তা, সরু বালাম চালর ভাত—'

তোফা। বলে যাও—'

'এখন তো ইলিশের মরসুম। তাই ইলিশ মাছ ভাজা—'

'উৎকৃষ্ট।'

'সরষে দিয়ে ইলিশ মাছের পেটি ভাতে—'

'আহা, একেবারে স্বর্গীয়।' শুনতে শুনতে চোখ বুজে আসতে লাগল গদু চক্কোত্তির। জিভে জল এসে গিয়েছিল, সুড়ুৎ করে সেটা ভেতরে টেনে নিল।

জনার্দন বলে যেতে লাগল, 'ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল, ইলিশের ডিম দিয়ে টক, শেষ পাতে চিনিপাতা দই—'

'চমৎকার চমৎকার। তা বাবা আরেকটা কথা ছিল।'

'বলুন কর্তা—'

'এই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কী রকম খরচ পড়বে?'

'আজ্ঞে পেট চুক্তি চার আনা।'

'পেট চুক্তি ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বল দিকি—'

'আজ্ঞে খদ্দেরের পেটে যত ভাত আর যত মাছ আঁটে, মানে যতক্ষণ না তার পেট ভরছে ততক্ষণ ভাত-মাছ দেওয়া হবে।'

'যত ভাত চাই?'

'হ্যাঁ, যত ভাত চান।'

'যত মাছ চাই?'

'হ্যাঁ, যত মাছ চান।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'ধর যদি একশো টুকরো মাছ চাই?'

'একশো টুকরো মাছ কি কেউ খেতে পারে কর্তা?'

'ধর যদি পারি?'

'তবে তাই দেওয়া হবে।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো তিন চার বার চেটে নিয়ে গদু বলল, 'ভেবে বল—'

জনার্দন বলল, 'ভেবেই বলেছি।'

একটু চিন্তা করে গদু বলল, 'পেটচুক্তি কত যেন নেবে বললে?'

'আজ্ঞে কর্তা চার আনা করে।'

'আবার বল!'

'চার আনা করে পেটচুক্তি।'

'পাকা কথা তো?'

'নিশ্চয়ই পাকা কথা।'

'পরে আবার বেশি চাইবে না?'

'না-না, তাই কখনো চাইতে পারি। এটাই এখানকার 'রেট' যে—'

'বেশ ভালো কথা। চল তা হলে তোমাদের চিত্তচমৎকারীণী হোটেল' বলেই জনার্দনের দিক থেকে আমাদের দিকে ফিরল গদু চক্কোত্তি, 'চল রে'—

আমরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চললাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, জনার্দন তো জানে না এত আদর করে কাকে তাদের হোটেলে নিয়ে যাচ্ছে।

সাত

চিত্তচমৎকারিণী হোটেলটা একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে। ওপরে টিনের চাল; চারধারে বাঁশের বেড়া। সামনের দিকে দরজার মাথায় সাইনবোর্ড আটকানো রয়েছে।

হোটেল ঘরটা বেশ বড়সড়ই। একধারে বেঁটেমতো একটা তক্তাপোষে গোলগাল ভুঁড়িওলা একটা লোক পায়ের ওপর পা তুলে পদ্মাসন করে বসে আছে। লোকটার পরনে ধুতি আর ফতুয়া। জামা কাপড়ের বাইরে তার গায়ের যেটুকু বেরিয়ে রয়েছে মানে হাত গলা আর বুকের খানিকটা— সব জায়গা বড়ো বড়ো লোমে বোঝাই। নাক আর কান থেকে গোছা গোছা লোম বেরিয়ে আছে। লোকটাকে দেখে মনে হয় যেন বনমানুষ। তার মুখ স্কুলের গ্লোবের মতো গোল, চোখ দুটোও গোল গোল। মাথায় শুয়োরের কুঁচির মতো খাড়া খাড়া চুল; গলায় রুপো দিয়ে বাঁধানো বড়ো সাইজের একটা আমড়ার আঁঠি ঝুলছে। তার কোলের কাছে ক্যাশ বাক্স। দেখেই বোঝা যায়, সে এই হোটেলের ম্যানেজার।

তক্তপোষটা বাদ দিয়ে গোটা ঘরের মেঝে জুড়ে খদ্দেরদের জন্য সারি সারি আসন পাতা রয়েছে। ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা। আমরা যে দরজা দিয়ে ঢুকলাম তার উল্টোদিকে আরও দুটো দরজা রয়েছে। একটা দরজা দিয়ে ভেতরের রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে বিরাট বিরাট উনুনে প্রকাণ্ড সব হাঁড়ি-কড়ায় হাতা-খুন্তি নেয়ে তিন-চারটে লোক রাঁধছে। আরেকটা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম সেদিকে দু-তিনটে ঘর দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব ম্যানেজার, রান্নার ঠাকুর টাকুররা ওখানে থাকে।

আমরা আসার আগেই তিরিশ চল্লিশজন লোক হোটেলঘরে বসেছিল। এরাও স্টিমারের প্যাসেঞ্জার। এখান থেকে খেয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবে।

আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়েই জনার্দন অন্য প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্য দৌড়ে চলে গিয়েছিল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে গদু তক্তপোষের সেই লোমওলা গোলাকার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই ম্যানেজার বুঝি?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ'।

'তোমাদের লোক তো স্টিমারঘাট থেকে আমাদের এখানে জমা করে দিয়ে পালাল। তা চান-টানের কী ব্যবস্থা হবে?'

ম্যানেজার নড়েচড়ে বসল। বলল, 'এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলেই ব্যস্তভাবে ডাকল, 'হরিপদ— হরিপদ—'

একটা সিড়িঙ্গে লিকলিকে চেহারার লোক সুড়ুৎ করে ভেতরের একটা ঘর থেকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

ম্যানেজার হরিপদকে বলল, 'এই বাবুদের ভেতরে নিয়ে যা। চানের বন্দোবস্ত করে দে—'

হরিপদ দাঁত বার করে বলল, 'আসুন কর্তারা—'

সামনের দিকে পা বাড়িয়েই গদু ঘুরে দাঁড়াল, 'ম্যানেজার তোমাদের বাথরুমটা পাকা তো?'

ম্যানেজার বলল, 'নিশ্চয়ই। দেখবেন মাথার ওপর ইট রয়েছে। আমাদের কাছে কোনোরকম গোলমাল পাবেন না। যা বলব তাই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন।'

আর কিছু না বলে বেশ খুশি খুশি মুখ করে গদু আমাদের নিয়ে হরিপদর পিছু পিছু ভেতরে চলে এল। একটা জায়গায় আমাদের সবাইকে বসিয় হরিপদ তেল নিয়ে এল। একটু বাদে তেল-টেল মাখা হয়ে গেলে আমাদের খানিকটা হাঁটিয়ে চটে ঘেরা একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, যান, চান করে আসুন।'

দেখে শুনে আমাদের চোখের তারা ভুরু টপকে কপালে গিয়ে উঠল যেন। গদু বলল, 'এটা বাথরুম নাকি?'

ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে দিয়ে হরিপদ হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে—'

গদু এবার ভীষণ চটে গেল, 'তবে যে ওরা বলল পাকা বাথরুম; মাথার ওপর ইট রয়েছে—'

'আজ্ঞে রয়েছেই তো। আমাদের কাছে মিথ্যের কারবার পাবেন না।' হরিপদ হি-হি করে হাসল।

গদু আরও রেগে উঠল, 'কোথায় মাথার ওপর ইট?'

সুট করে একটা সিঁটকেমতো আঙুল বার করে হরিপদ বলল, 'এই দেখুন—'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, চটের ঘেরা জায়গাটার মাথায় একটা বড়ো গাছের ডাল এসে পড়েছে; আর সেই ডালটার সঙ্গে দড়ি বেঁধে চারখানা ইট ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

হরিপদ বলল, 'দেখলেন তো কর্তারা। আমাদের কথায় যা, কাজেও তাই—' এবার নাক কুঁচকে শেয়ালের মতো ফ্যঁচ ফ্যাঁচ করে একটু হেসে নিল হরিপদ।

ব্যাটারা কি মাথা খেলিয়েছে বুঝে দেখ। আমাদের কিছু বলবার নেই; সত্যিই মাথার ওপর ইট রয়েছে।

গদু গজগজ করে আপন মনে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, এক মাঘে শীত যায় না। আরও মাঘ আছে।' আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'চল রে চানটান করে নিই।'

আধঘণ্টা বাদে ফিটফাট হয়ে আমরা হোটেল ঘরে এসে খেতে বসে গেলাম। চারদিকে আরও লোকজন খেতে বসেছে।

তখনই পাতে ভাত পড়েনি, গদু হঠাৎ ডেকে উঠল, 'ম্যানেজার—'

তক্তপোষের ওপর থেকে ম্যানেজার বলল, 'বলুন কর্তা'—

'যে ঠাকুর পরিবেশন করবে তাকে ডাকো দেখি—'

'কেন কর্তা?'

'আগে ডাকো; দরকার আছে—'

ম্যানেজার চেঁচিয়ে ডাকল, 'নিমাই নিমাই—'

একটু পর নাদুস-নুদুস ক্ষীর খাওয়া চেহারার একটা লোক রান্নাঘরের দিক থেকে হেলেদুলে এসে উদয় হল। ম্যানেজার তাকে বলল, 'কর্তাঠাকুর তোমাকে খুঁজছে—'

নিমাই একটু অবাক হয়েই গদু চক্কোত্তির সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী বলবেন কর্তা?'

গদু বলল, 'তুমিই খদ্দেরদের খেতে দাও তো?'

'আজ্ঞে। আমি ছাড়া আর কে দেবে। দশ বছর এই হোটেলে দশ লাখ লোককে এই হাতে খাইয়ে আসছি। হে-হে—'

'বামুন তো?'

নিমাই এবার আঁতকে উঠল, 'বলেন কি কর্তা! বামুন বৈকি,— নিশ্চয়ই বামুন। আমার চোদ্দ পুরুষ বামুন। এই দেখুন পৈতে—' গেঞ্জির তলা থেকে তেল চিটচিটে পৈতা বার করে দেখাল সে।

গদু বলল, 'পৈতে যে কেউ নিতে পারে। পৈতে থাকলেই বামুন হয় নাকি? তা নাম শুনলাম নিমাই, তা কোথাকার নিমাই? নদের নিমাই নাকি?'

'না, ফরিদপুরের।'

'নিমাই কী?'

'মুখোপাধ্যায়।'

'গোত্র?'

'ভরদ্বাজ।'

খানিকটা চিন্তা করে গদু এবার বলল, 'এবার গায়ত্রীখানা বল তো মানিক; তবে বুঝব তুমি সত্যি বামুন—'

নিমাই গড়গড়িয়ে গায়ত্রী আউড়ে গেল এবং প্রমাণ করে দিল যে সে সত্যিসত্যিই বামুন।

গদু খুশি হয়ে বলল, 'আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান; বামুনদের হাতে ছাড়া খাই না। তুমি পরীক্ষায় পাশ করে গেছ। যাও—গিয়ে রান্নার ঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পর রান্নার ঠাকুর গদুর সামনে এসে দাঁড়াল। আদালতে জজ সাহেবের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামীর মুখ যে রকম হয়ে যায় ঠাকুরের মুখটা অবিকল সেইরকম দেখাচ্ছে।

গদু নিমাইকে যা-যা জিজ্ঞেস করেছিল, মানে নাম পদবী গোত্র দেশের ঠিকানা, রান্নার ঠাকুরকেও তা-ই জিজ্ঞেস করল। নিমাইর মতো তাকেও গায়ত্রী আওড়াতে হল। শেষ পর্যন্ত সেও এই 'ওরাল' মানে মৌখিক পরীক্ষায় একেবারে লেটার টেটার নিয়ে পাশ করে গেল। গদু চক্কোত্তি ওকে ভেতরে পাঠিয়ে ম্যানেজারকে বলল, 'একটা কলাপাতা আনিয়ে দাও তো—'

আমরা যারা খেতে বসেছি তাদের সবার সামনেই কলাপাতা, নুন মাটির গেলাসে জল, এই সব সাজানো রয়েছে। এরপরও বাড়তি আরেকটা কলাপাতার কী দরকার কেউ বুঝতে পারছে না।

ম্যানেজার বলল, 'আর কলাপাতা দিয়ে কী হবে?'

'তুমি আনাও না।'

হোটেলের একটা ছেলেকে দিয়ে ভেতর থেকে কলাপাতা আনিয়ে দিল ম্যানেজার। সেটা ভালো করে ধুয়ে আগের পাতাটার ওপর দিকে বসিয়ে পাতাটাকে ডবল করে নিল গদু চক্কোত্তি। তারপর বলল, 'এবার ভাত দিতে বল ম্যানেজার—'

ম্যানেজার হাঁক দিতেই পেতলের বালতিতে করে ভাত নিয়ে এল নিমাই। আমরা যে লাইনে খেতে বসেছি তার প্রথমেই আছে গদু চক্কোত্তি। হাতায় করে নিমাই তার পাতে ভাত দিতে যাবে, গদু বলল, 'উঁহু, উঁহু—'

নিমাই অবাক হয়ে বলল, 'কী হল কর্তা?'

'হাতা নিয়ে নয়, ঢেলে দাও—'

'ঢেলে দেব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—'

নিমাই হকচকিয়ে গেল। কী করবে যে যেন বুঝতে পারছিল না।

গদু রেগে গেল 'কী হল তোমার? ডাকবাক্সর মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বাঙলা ভাষাটাও বোঝ না নাকি?

চমকে বালতি কাত করে গদুর পাতে ভাত ঢালতে লাগল নিমাই। সবটা ঢালা হলে গদু ভাতগুলো পাহাড়ের চূড়োর মতো করে সাজাতে সাজাতে বলল, যাও আবার ভাত এনে অন্যদের দাও। এবার থেকে যখন ভাত দেবে আমার জন্যে আলাদা একটা বালতি বোঝাই করে আনবে।'

এ রকম কথা আগে আর কোনোদিন কোনো খদ্দেরের কাছে শোনেনি নিমাই। ভয়ে ভয়ে গদুকে একবার দেখে নিয়ে লঙ্ জাম্পের মতো একটা লাফ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আমরা এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে লক্ষ করলাম চারপাশের লোকগুলো হাঁ করে গদুকে দেখছে। আরও লক্ষ করলাম তক্তাপোষের ওপর ম্যানেজার নড়েচড়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেছে!

নিমাই আবার বালতিতে করে ভাত এনে অন্য সবাইকে দু হাতা করে দিয়ে গেল। তারপর এল মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল। প্রথম দু'খানা করে ভাজা আর দু'টুকরো করে মাছের ঝোল বাটিতে সাজিয়ে সবার পাতের সামনে রেখে গেল নিমাই।

বিনু আর আমি সবে পাতের দিকে হাত বাড়িয়েছি অমনি গদু খ্যাঁক করে উঠল, 'খবরদার—'

তক্ষুনি চমকে উঠে সট করে যে যার হাত আমরা কোলের দিকে টেনে নিলাম। আর গদু করল কি, সেই ফাঁকে আমার আর বিনুর ভাগ থেকে একখানা করে ভাজা আর ঝোলের মাছ তুলে নিজের পাতে নিয়ে গেল।

সব লোক গদুর কাণ্ডকারখানা দেখছিল। গদু হেসে হেসে তাদের বলল, 'ব্যাপার কি জানেন, এই ইলিশমাছ খুবই তেলওলা মাছ। ছেলেমানুষের পেটে এই মাছ বেশি ঢুকলে যা-তা কারবার হয়ে যায়। তার ওপর কলকাতা পর্যন্ত এদের নিয়ে যেতে হবে। রাস্তায়

ইলিশের ঠ্যালায় ছেলে দুটো যদি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আমাকেই তো সেই ঝক্কি সামলাতে হবে। সাবধানের মার নেই। তাই ওরা যাতে সুস্থ থাকে, নিরাপদে কলকাতায় বাপ-মা'র কোলে গিয়ে পৌঁছুতে পারে সেই জন্যে মাছগুলো নিয়ে নিলাম। আমার মুখের দিকে আর না তাকিয়ে এবার শুরু করে দিন।

খাওয়া আরম্ভ হল। অন্য লোকেরা খাবে কি, তাদের জোড়া জোড়া চোখ গদুর ওপরেই স্থির হয়ে আছে। আমরাও খাওয়া-দাওয়া ফেলে তাকে দেখতে লাগলাম।

এদিকে চোখের পলকে ভাতের পাহাড়, মাছভাজা, মাছের ঝোল—সব উধাও করে দিয়ে গদু নিমাইকে ডেকে বলল, 'আরও ভাত আনো, মাছ আনো—'

নিমাই দৌড়ে গিয়ে আরেক বালতি ভাত, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল এনে গদুর পাতে ঢেলে দিল। দশ বারো মিনিটের ভেতর সেগুলোও শেষ।

গদুর খাওয়া দেখবার মতো। আগেই জানিয়েছি কোমরের বদলে তার কাপড়ের বাঁধনটা থাকত বুকের কাছে। খেতে খেতে দশ মিনিট বাদে বাদে হ্যাঁচকা টানে বাঁধনটা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নামিয়ে দিত। আমার বন্ধু গোঁসাই বাড়ির সুখেন ছিল ভীষণ ফাজিল। গদুর খাওয়া দেখে সে একবার বলেছিল, 'পেটের যে পর্যন্ত ফিল আপ হচ্ছে সেই পর্যন্ত বাঁধনটা নামিয়ে দিচ্ছে গদু দি গ্রেট।'

এইভাবে একটু একটু করে নামাতে নামাতে বাঁধনটা নাইকুণ্ডুল থেকে যখন এক ইঞ্চি নীচে নামবে তখন গদুর খাওয়া শেষ হত। কিন্তু নাইকুণ্ডুল থেকে এক ইঞ্চি নামতে পুরো একটি ঘণ্টা সময় লাগত। আর এই এক ঘণ্টার ভেতর গদু কী কাণ্ড করত একবার ভেবে দেখ।

দ্বিতীয় বালতির ভাত শেষ করার পর গদু আবার হেঁকে উঠল, 'নিমাই ভাত, মাছ—'

নিমাই আবার রান্নাঘরে ছুটল। তারপর ভাত আনতে আনতে মাছ সাবাড়, মাছ আনতে আনতে ভাত। কতবার যে নিমাইকে রান্নাঘরে দৌড়াদৌড়ি করতে হল তার হিসেব নেই। দৌড়তে দৌড়তে তার পায়ের খিল খুলে যাবার যোগাড়। দেড় হাত জিভ বার করে সে হাঁপাতে লাগল; তার গা বেয়ে গল গল করে ঘাম বেরুতে লাগল।

ওদিকে তক্তাপোষের ওপর ম্যানেজারও ঘামতে শুরু করেছে। তার চুলগুলো মাথার চাঁদির ওপর সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে; চোখ-দুটো আট আনা সাইজের পান্তুয়ার মতো গোল হয়ে গেছে।

এদিকে খেতে খেতে গদুর কোমরের বাঁধনটা নাইকুণ্ডুলে এসে থেমেছে। বাঁধনটা আরও এক ইঞ্চি নামলে তবে খাওয়া শেষ হবে। তার মানে এখনও পুরো একটি ঘণ্টা গদু খেয়ে যাবে।

গদুর খাওয়া আমরা দেখছিলাম ঠিকই। তার ফাঁকে ফাঁকে হোটেল-ঘরের অন্য লোকদের দিকেও তাকাচ্ছিলাম। সবারই চোখ ম্যানেজারের চোখের মতো গোল্লা পাকিয়ে গেছে। এমন খাওয়া তারা বোধ হয় আর কখনও দ্যাখেনি।

সবাইকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার চোখে পড়ল ম্যানেজার চোখের কোণ দিয়ে নিমাইকে কী যেন ইসারা করেছে। অমনি নিমাই করল কি, একটু ঝুঁকে হোটেলঘরের দরজা

দিয়ে বাইরে উঁকি মেরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'লাইনে ট্রেন দিয়েছে, লাইনে ট্রেন দিয়েছে—'

তার মানে রেল লাইনে কলকাতায় যাবার ট্রেন নিয়ে আসা হয়েছে।

আমরা যেখানে বসে খাচ্ছি সেখান থেকে রেললাইন দেখা যায়। মুখ বাড়িয়ে সেখানে কোনো ট্রেন দেখতে পেলাম না।

না দেখলে কী হবে, যারা খেতে বসেছিল খাওয়া-দাওয়া ফেলে হুড়মুড় করে কোনোরকমে আঁচিয়ে ম্যানেজারকে পয়সা-টয়সা দিয়ে দে ছুট, দে ছুট।

তখনকার দিনে গোয়ালন্দের হোটেলওলারা এইভাবে ট্রেনের কথা বলে প্যাসেঞ্জারদের দৌড় করাত। আসলে এটা হল চালাকি। ট্রেনের কথা বললেই কেউ আর বসে থাকবে না; পাতের ভাত ফেলে পয়সা-টয়সা দিয়ে দুড়-দাড় করে চলে যাবে। তাতে হোটেলওলাদের অনেক লাভ। প্যাসেঞ্জাররা বেশি খেতে পারবে না, অথচ পয়সাটা ঠিক গুনে দিয়ে যাবে।

ট্রেন দেখতে না পেলেও বিনু আর আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বিনু গদুকে বলল, 'ট্রেন দিয়েছে। যাবেন না?'

হাতের ইসারায় তাকে থামিয়ে দিল গদু।

তক্তাপোষ থেকে ম্যানেজারও বলে উঠল, 'এখন না গেলে কলকাতার ট্রেন ধরতে পারবেন না কর্তাঠাকুর।'

গদুর মুখচোখ দেখে মনে হল না, কলকাতায় যাবার খুব একটা তাড়া আছে। সে বলল, 'ম্যানেজার তোমার ঠাকুর রাঁধে বড়ো ভালো। এই ইলিশের ঝোল ঝাল ফেলে আমি এখন মেরে ফেললেও উঠতে পারব না। লাইনে ট্রেন দিয়েছে, দিক। ভাবছি আজ আর কলকাতায় যাব না, কাল যাব।'

চালাকি কাজে লাগল না দেখে পাক্কা দু কিলো চিরতার জল খাবার মতো মুখ করে বসে রইল ম্যানেজার। এধারে গদুর খাওয়া আমরা দেখছিলাম ঠিকই, তবে ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্কর মতো নিজেরাও খেয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের এঁটো হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে উঠেছিল। সেদিকে নজর পড়তেই গদু বলল, 'শুধু শুধু এঁটো হাতে বসে আছিস কেন? আঁচিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বসে থাক।' বলেই বাজখাঁই গলায় হেকে উঠল, 'ঠাকুর মাছ আনো, ভাত আনো—'

নিমাই চমকে উঠে প্রায় লং জাম্পের ভঙ্গিতে রান্নাঘরের দিকে উড়ে চলে গেল।

তারপর আবার বালতি বালতি ভাত আসতে লাগল। গণ্ডা গণ্ডা মাছ ভাজা, ডজন ডজন ঝোলের মাছ ঝালের মাছও আসতে লাগল। নিমাইর গা বেয়ে আবার গলগলিয়ে ঘাম ছুটল, পায়ের গুলি টনটনাতে লাগল। কিন্তু গদুর নাইকুণ্ডুল থেকে কাপড়ের বাঁধন শেষ ইঞ্চিটা আর নামে না।

তখন ম্যানেজারের ইসারা পেয়ে নিমাই আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ভাত নেই কর্তাঠাকুর।'

গদু চটে উঠে বলল, 'নেই মানে?'

ম্যানেজার তখন তক্তাপোষ থেকে বলল, 'আজ্ঞে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে বসানো হয়েছে।'

'ও, এই কথা।' গদুর মুখটা হাসিহাসি দেখাল, 'বেশ তো, ধীরে সুস্থে নতুন গরম ভাত হোক। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি ততক্ষণ তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি ম্যানেজার। তারপর বল দেখি তোমার দেশ কোথায়?'

দু'নম্বর চালাকিটাও যখন খাটল না, গদুকে যখন কিছুতেই পাত থেকে তোলা গেল না তখন মুখখানা হুতোম প্যাঁচার মতো করে ম্যানেজার বলল, 'ময়মনসিং জেলায়—'

'কোন থানা?'

'কিশোরগঞ্জ—'

'গ্রাম?'

'নবীপুর।'

'আচ্ছা ওখানে খাদ্যখাদক কীরকম পাওয়া যায় বল তো? ওদিকটায় আমার যাওয়া হয়নি।'

ম্যানেজার উত্তর দিল না।

গদু তাড়া লাগাল, 'কি হে চুপ করে রইলে কেন?'

হাজার হোক খদ্দের। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যায় না। সে কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতেই হয়। নইলে হোটেলের একবার বদনাম হয়ে গেলে ব্যবসা চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। ম্যানেজার খুব অল্প কথায় জবাব দিল, 'ভালই পাওয়া যায়—'

'আগে মাছ দিয়েই শুরু করা যাক। ইলিশ, রুই, কাতলা, চিতল মেলে?'

'প্রচুর।'

গদুর চোখ চকচকিয়ে উঠল। সে এবার জিজ্ঞেস করল, 'গলদা চিংড়ি, ভেটকি, বড়ো বড়ো গোলসা ট্যাংরা, পাবদা, কই, মাগুর?'

ম্যানজোর বলল, 'অঢেল। একেকটা কই এক হাত করে, একেকটা ট্যাংরা দেড় হাত করে—'

জিভের ডগায় জল এসে গিয়েছিল গদুর। তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে সে বলল, 'এবার তা হলে মিষ্টির কথায় আসা যাক। রসগোল্লা পাওয়া যায়?'

'যায় বৈকি। রসগোল্লা ছাড়া দেশ আছে নাকি?'

'ক্ষীরমোহন?'

'তাও পাবেন।'

এবার নামতা পড়ার মতো করে গদু বলে গেল, 'সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, রাজভোগ?'

ম্যানজার বলল, 'যেদিকে তাকাবেন শুধু ওসবেরই দোকান। রাস্তায় ঘাটে সন্দেশ রসগোল্লা গড়াগড়ি খাচ্ছে।'

শুনতে শুনতে গদুর চোখ এত চকচক করছিল যে মনে হচ্ছে সেখানে হাজার পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সড়াৎ করে জিভের জল টেনে নিয়ে সে বলল, 'আহা সোনার দেশ গো তোমাদের, সোনার দেশ। ভাবছি তোমাদের ওখানে কিছুদিন গিয়ে থাকব।'

এমনি সব গল্পে গল্পে ভাত হয়ে গেল। অতএব আবার বালতি বালতি ভাত, ডজন ডজন ইলিশের টুকরো পাতে পড়তে লাগল গদুর।

পুরো একটি ঘণ্টা বাদে নাইকুণ্ডল থেকে কোমরের বাঁধন এক ইঞ্চি নামবার পর প্রকাণ্ড তিনটে ঢেকুর তুললো গদু। তার মানে খাওয়া এবার শেষ।

হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচিয়ে এল সে। তারপর ম্যানেজারের কাছে এসে আমাদের তিনজনের পেটচুক্তি খাওয়ার দাম তিনটে সিকি অর্থাৎ বারো আনা (এখনকার পঁচাত্তর পয়সা) ট্যাঁক থেকে বার করে দিল।

ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে পয়সাটা নিল ঠিকই। তবে তার মুখখানা দেখে মনে হল, এর চাইতে ঠাস ঠাস করে তিনটে চড় বসিয়ে দিলে বেশি খুশি হত।

দাম মিটিয়ে দিয়ে গদু চক্কোত্তি বলল, 'তোমাদের ব্যবহারে আমি খুব সন্তুষ্ট। তা ছাড়া তোমাদের ঠাকুর রাঁধে বড়ো খাসা। আহা—' বলেই একমুঠো মৌরি তুলে নিয়ে চাকুম চুকুম করে চিবোতে চিবোতে আবার বলল, 'তাই একটা কথা ভাবছিলাম—'

ম্যানেজার সেইরকম পান্তুয়ার মতো চোখ করে বলল, 'কী?'

'এই ছেলেদুটোকে—' বিনুকে আর আমাকে দেখিয়ে গদু বলতে লাগল, 'কলকাতায় ওদের মা-বাপের কাছে জমা করে দিয়ে দেশে ফেরার সময় তোমার এখানে দিন কয়েক থেকে যাব। আহা, তোমার ঠাকুর রাঁধে বড়ো ভালো।' বলতে বলতে তার চোখ আধবোজা হয়ে এল।

আচমকা এক কাণ্ড করে বসল ম্যানেজার। হাত জোড় করে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বলল, 'কর্তাঠাকুর নিশ্চয়ই আপনি আসবেন। আপনার শোবার জন্য নতুন পালঙ্ক দেব, মশারি দেব, পা টেপার জন্যে চাকর দেব, তার ওপর পাকা বাথরুম তো দেখেছেনই। কিন্তু কর্তা—'

'কিন্তু কী?'

'খাওয়াটা কর্তা ওই হোটেলে—' বলে উলটো দিকের একটা হোটেল দেখিয়ে দিল ম্যানেজার, 'ক'মাস ধরে ওই হোটেলটা হওয়াতে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেছে। সাতদিন এখানে থেকে যদি হোটেলটা তুলে দিয়ে যেতে পারেন বড়ো উপকার হয়।

একটু চুপ করে রইল গদু। তারপর চোখ পিটপিট করে দেবতারা যেভাবে বর দেয় সেইভাবে হাত বাড়িয়ে বলল, 'এই কথা। তথাস্তু—'

শুনেছি ফেরার পথে সাতদিনে নয়, মোট তিনটে দিন থেকেই উল্টোদিকের সেই হোটেলটা তুলে দিয়েছিল গদু। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এটাই নাকি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আরও শুনেছি সেই হোটেলটা উঠে যাবার পর তার জায়গায় গদুর নামে একটা প্রকাণ্ড মনুমেন্ট তুলে তার গায়ে পাথরের ফলকে লেখা হয়েছিল :

'হে শ্রীযুক্ত শ্রীল গদু চক্কোত্তি; তোমার কীর্তির জন্য বাঙালি জাতির ইতিহাসে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।'

আলসে চোরের গল্প

পাঁচুর মতো অলস, অপদার্থ চোর ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। কোনোকালে তার জোড়া আরেকটা জন্মাবে বলেও মনে হয় না।

তার শরীরে চটপটে ভাব বলতে কিচ্ছুটি নেই। বসে আছে তো বসেই আছে, বিড়ি ফুঁকছে তো ফুঁকেই চলেছে। একদিকে কাত হয়ে শুলো তো সারা রাত সেভাবেই কাবার করে দিল। আলসেমির জন্য আরেক পাশে ফিরতেও তার ভীষণ কষ্ট। সে যদি ভাবে সকালে বাজারে যাবে, বেরুতে বেরুতে দুপুর গড়িয়ে যায়। আসলে নড়তে চড়তে তার ইচ্ছা করে না। খাওয়াই বল, বেড়ানোই বল আর চুরি করাই বল, কোনো ব্যাপারেই তার চাড় নেই।

এই নিয়ে পাঁচুর সঙ্গে তার বউ নেত্যকালীর দিনরাত খটামটি লেগেই আছে।

নেত্যকালী হল ডাকসাইটে ভবা চোরের মেয়ে। ভবার খ্যাতির সুবাস সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। নেত্যকালীর ভাইরাও নাম-করা চোর। শুধু কি বাপ আর ভাইরা? ওর খুড়ো-জ্যাঠা-পিসে-মেসোরাও চুরিবিদ্যায় একেক জন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এমন বনেদি বংশের মেয়ে হয়ে সে কিনা এসে পড়েছে পাঁচুর মতো একটা লক্ষ্মীছাড়া অকর্মার ধাড়ির হাতে? এজন্য লজ্জায় ঘেন্নায় আর আপসোসে তার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

নেত্যকালীর বাপ-ভাইরা থাকে মস্ত দালান কোঠায়। ঘোর নিশুতিতে লোকের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে কত কত সোনাদানা, হীরে জহরত নিয়ে আসে। তারা খায় ক্ষীরমণ্ডা, রাবড়ি-পোলাও, রুইয়ের মাথা, চিতলের পেটি। নেত্যকালীর মা আর ভাই-বৌরা পরে দামী দামী জামদানি আর বেনারসী শাড়ি, তাদের গা ভর্তি গয়না। আর সে থাকে কিনা মাটির ঘরে, যার মাথায় ফুটোফাটা টিনের চাল। কপাল ভাল হলে কোনো দিন দু'বেলা জোটে গাবের দানার মতো মোটা মোটা লাল চালের ভাত, নইলে খুদের জাউ। পরতে পায় লাল পাড়ের খেলো শাড়ি। তার বড্ড কষ্ট।

বাপ-ভাইরা, মা আর বৌদিদিরা নেত্যকালীকে ভাল শাড়ি, গয়নাগাটি, মাছ-মাংস, ঘি-দুধ পাঠাতে চায়। কিন্তু সে নেবে কেন? এতে তার স্বামীর অসম্মান হয় না? পাঁচু ভাল খেতে, ভাল পরতে না-ই দিক, তাই বলে অন্যেরা দিতে থুতে আসে কেন? নিজে বকাঝকা যাই করুক, পাঁচুর ওপর তার বড় টান।

পাঁচু চোরের চেহারাখানা চমৎকার। ফর্সা রং, খাঁড়ার মতো চোখা নাক, মাথায় বাবরি। এক্কেবারে রাজপুত্তুর যেন। কিন্তু কে জানত তা গা-ভর্তি এত আলসেমি! নেত্যকালীকে তার হাতে দিয়ে এখন বাপ-ভাইরা কপাল চাপড়ায়। মাঝে মাঝে চড়াও হয়ে ধমক ধামকও দিয়ে যায়, জামাই বলে নেহাত মারধরটা আর করে না।

আজ বিকেল বেলায় পাঁচুর সঙ্গে নেত্যকালীর তুমুল একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। কেননা, চাল-ডাল যা ছিল সব শেষ। আজ যদি গেরস্তর ঘর থেকে পাঁচু কিছু হাতিয়ে আনতে না পারে কাল থেকে স্রেফ উপোস।

ঝগড়ার পর দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে মন-মরা হয়ে বসে আছে পাঁচু। আজ রাগের মাথায় বড্ড কড়া কড়া কথা বলেছে নেত্যকালী। পাঁচুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে তার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল, বাপ-ভাইদের কাছে মুখ দেখাবার যো রইল না, মরলে তার হাড় জুড়োয়, ইত্যাদি।

মুখ হাঁড়ি করে একসময় ঘরের কোনা থেকে সরষের তেলের বাটি, সিঁদকাঠি, কালো খাটো প্যান্ট এনে পাঁচুর সামনে রাখতে রাখতে নেত্যকালী বললে, 'সন্ধের পর আঁধার নামলে বেরিয়ে পড়বে। খালি হাতে যদি ফেরো, তোমার কপালে ল্যাঠা আছে, এই বলে দিলুম। আমি একবার মা আর বৌদিদিদের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

গাঁয়ের এক মাথায় নেত্যকালীরা থাকে, আরেক মাথায় তার বাপের বাড়ি। রোজ একবার সেখানে না গেলে পেটের ভাত হজম হয় না তার।

নেত্যকালী তো চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইল পাঁচু। একসময় যখন গাছপালার আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সন্ধে নামার আর দেরি নেই তখন চোখ নামিয়ে তেলের বাটি আর সিঁদকাঠি টাঠির দিকে তাকাল। না, আর বসে থাকলে চলবে না। খানিক পরেই ঝপ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। গাঁয়ের লোকের পয়সা নেই। পাঁচুকে চুরি করতে যেতে হবে পাঁচ মাইল দূরের শহরে। সেখানে গিয়ে তাক মতো কোনো বাড়িতে ঢুকে কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় কাবার হয়ে আসবে। তার চেয়ে বড় কথা, সন্ধের পর বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে নেত্যকালী তাকে বসে থাকতে দেখলে হুলস্থুল বাধিয়ে দেবে।

চুরি করতে যাবার আগে সারা গায়ে জবজবে করে সরষের তেল মেখে নেয় পাঁচু। কেননা গেরস্ত বাড়ির কেউ তাকে জাপটে ধরলে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারবে।

আজ বেরুবার ইচ্ছা ছিল না পাঁচুর। কিন্তু নেত্যকালীর মুখটা মনে পড়তেই হাতের চেটোয় তেল ঢেলে সারা গায়ে ভাল করে মাখতে শুরু করল সে। তারপর ভেতরে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে তার ওপর পাজামা আর শার্ট চড়াল। গেরস্তর বাড়িতে ঢোকার আগে পাজামা আর শার্ট কোথাও খুলে রাখবে, কেননা গায়ে জামাকাপড়ের বোঝা থাকলে হঠাৎ কেউ তাড়া দিলে পালাতে অসুবিধে হয়।

এবার সিঁদকাঠিটা এক টুকরো ময়লা কাপড়ে পেঁচিয়ে বেরিয়ে পড়ল পাঁচু।

শহরে যখন সে এসে পৌঁছল, বেশ রাত হয়ে গেছে। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় অনেকগুলো বাড়ির সামনে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারল কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে, লোকজনের কথা শোনা যাচ্ছে। তার মানে সবাই জেগে আছে। গেরস্তরা ঘুমিয়ে না পড়লে তো আর বাড়িতে ঢোকা যায় না।

গাঁ থেকে পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে পাঁচু। তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছে। ফলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হাঁটু দু'টো যেন ভেঙে আসছিল। পথের ধারে

একটা গাছতলায় গিয়ে বসে সে। ভাবে চুরি আজ মাথায় থাক, এখানেই এক ঘুমে রাত কাটিয়ে কাল সকালে গাঁয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণে খেয়াল হয়, পরের বাড়ি থেকে দামী কিছু হাতিয়ে না নিয়ে গেলে নেত্যকালী নির্ঘাত তাকে খুন করে ফেলবে।

অগত্যা কিছুক্ষণ জিরিয়ে খুব বেজার হয়ে উঠে পড়ে পাঁচু। এখানে ওখানে হানা দিতে থাকে। কিন্তু আজ শহরের লোকেরা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই ঘুমোবে না। কোনো মানে হয়?

এমনিতেই বেশি হাঁটাহাঁটি ছোটাছুটি পছন্দ নয় পাঁচুর। সর্বক্ষণ বসে থাকতে কি ঘুমোতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নেত্যকালীর পাল্লায় পড়ে প্রাণে আর সুখ নেই তার।

লোকজন না ঘুমোলেও কিছু একটা করতেই হয়। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ওপরের শার্ট আর পাজামা খুলে দলা পাকিয়ে নিচে রেখে একটা বাড়ির পাঁচিলের ওপর চড়ে বসে পাঁচু। দেখে সামনের একটা ঘরে আলো জ্বেলে ক'টা লোক হই হই করতে করতে তাস খেলছে।

খানিকক্ষণ ওদের লক্ষ করে পাঁচু। তারপর বলে, 'ও মশাইরা, একটু শুনবেন?'

চমকে লোকগুলো জানালা দিয়ে পাঁচুর দিকে তাকায়। তারপর একসঙ্গে সবাই বলে ওঠে, 'কে, কে রে?'

'আমি — আমি পাঁচু। আর কতক্ষণ আপনারা তাস খেলবেন?'

একটা ষণ্ডামতো লোক, মাথায় বাবরি চুল, বলে, 'সে কৈফিয়ত কি তোকে দিতে হবে?'

পাঁচু তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলে, 'এজ্ঞে না। কথাটা হল বেশি রাত জাগতে নেই। শরীর খারাপ হয়।'

'তুই যে জেগে আছিস?'

'আমার যে বেশি রাতেই কাজ। নিন নিন, এবার শুয়ে পড়ুন। আপনারা না ঘুমোলে কাজটা শুরু করতে পারছি না যে—'

'ওরে হারামজাদা — বুঝেছি, তুই চোর। এই কে কোথায় আছিস, ধর তো ব্যাটাকে। মজাটা তোমাকে টের পাওয়াচ্ছি।' বলতে বলতে লোকগুলো লাফিয়ে উঠে পড়ে।

ওরা ধরতে পারলে একখানা হাড়ও যে আর আস্ত থাকবে না, সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধি পাঁচুর আছে। প্রাণের ভয়ে কোনোরকমে পাঁচিল থেকে হাঁচোড় পাঁচোড় করে নেমে পাজামা-শার্ট কুড়িয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায় সে। সামনের মোড় ঘুরে একটা টিনের চালওয়ালা বাড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকে। তাস খেলোয়াড়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস না পেয়ে ফিরে যায়।

না, আজকের দিনটাই খারাপ। অনেকক্ষণ পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোরাঘুরি করতে করতে আচমকা পাঁচুর চোখে পড়ে একটা তেতলা বাড়ি একেবারে অন্ধকার। ভেতরে আলোটালো জ্বলছে না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। তার মানে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচু। ভেতরে ঢুকলে বিপদে পড়ে যাবে কিনা, বুঝতে চেষ্টা করে। যখন মনে হয় সেরকম ভয় নেই, তখন লোহার উঁচু গেট পেরিয়ে ওধারে নেমে পড়ে। তারপর বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায়। বৃষ্টির জল বেরুবার যে মোটা পাইপ ওপরে উঠে গেছে সেটা বাইতে বাইতে দোতলায় এসে দেখা গেল। একটা জানালা খোলা রয়েছে। আর কী আশ্চর্য, সেটার গরাদ নেই।

আনন্দে বুকের ভেতরটা নাচতে লাগল পাঁচুর। চোরেদের দেবতা বাবা তস্করেশ্বর এতক্ষণে তা হলে মুখ তুলে চেয়েছেন।

সড়াৎ করে পাঁচু খোলা জানালা গলে ভেতরে ঢুকে একটা দেওয়ালে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশের জমাট অন্ধকার চোখে সয়ে এলে দেখতে পায় মাঝখানে বিরাট বারান্দার মতো একটা জায়গা ঘিরে চার পাঁচখানা ঘর। প্রতিটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বারান্দায় রয়েছে অনেকগুলো কাঠের আর কাচের আলমারি। এক দেওয়ালে প্রকাণ্ড দামী ঘড়ি।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এ বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ আগে শোয় নি। ঘুমটা আরেকটু গাঢ় হোক। তার নিজেরও ধকল কম হয় নি। খানিকক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে তারপর কাজ শুরু করা যাবে।

আস্তে আস্তে বসে দেওয়ালে হেলান দেয় পাঁচু। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

কতক্ষণ কেটে গেছে হুঁশ ছিল না। দেওয়াল ঘড়িতে ঘ্যানঘেনে আওয়াজ করে দু'টো বাজলে ঘুম ছুটে যায় পাঁচুর। চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

এখানে দুই দেওয়াল ঘেঁষে সবসুদ্ধু চারটে আলমারি — দু'টো কাঠের আর দু'টো কাচের। পায়ে পায়ে সেদিকে চলে যায় পাঁচু। আলমারিগুলোর গায়ে তালা নেই, টানতেই পাল্লা খুলে যায়। কোনোটার ভেতর লেপ-কাঁথা-কম্বল, কোনোটায় থাক থাক জামাকাপড়। হাত দিয়ে বোঝা গেল ওগুলো পুরনো। একটা কাচের আলমারি বোঝাই কাচের আর চীনামাটির বাসন। আরেকটা কাচের আলমারিতে শুধু তামা-কাঁসার বাটি গেলাস থালা— এইসব।

লেপকাঁথা আর পুরনো কাপড়চোপড় ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার মানে হয় না, ওগুলো কেউ কিনবে না। তামা-কাঁসার জিনিসগুলো দামী, আর দামী হল দেওয়াল ঘড়িটা। পাঁচু মনে মনে ঠিক করল, বেশি লোভে কাজ নেই। ঘড়ি আর তামা-কাঁসার কিছু বাসন নিয়ে সে সরে পড়বে।

বাসনগুলো বাঁধার জন্যে দু'টো কাপড় বার করে পাঁচু। এক কোণে একটা উঁচু টুল ছিল। সেটা টেনে এনে ঘড়িটা নামায়। এইসব করতে করতে তার হাঁফ ধরে যায়। পরিশ্রমটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। একটু জিরিয়ে না নিলেই নয়। পাঁচু মেঝের ওপর থেবড়ে বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সেই কাপড়খানা বিছিয়ে বাসন কোসন আর ঘড়িটা সাজিয়ে বাঁধাছাঁদা করতে যাবে, সেই সময় ডানদিকের ঘর থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে আচমকা পাঁচুকে দেখে চিৎকার জুড়ে দেয়, 'চোর-চোর—' সঙ্গে সঙ্গে হুলস্থূল কাণ্ড। একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত বাড়ির যত আলো ছিল সব জ্বলে ওঠে। ঝড়াং ঝড়াং করে দরজা খুলে মেয়েপুরুষ মিলিয়ে একদঙ্গল লোক বেরিয়ে আসে। হই চই বাধিয়ে তারা পাঁচুর ওপর কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকে।

পাঁচু এমনিতে যেমন আলসে তেমনি ভীতু। দুই হাতে মার ঠেকাতে ঠেকাতে হাউমাউ করে বলে, 'মারবেন না, মারবেন না। সারাদিন আজ আমার ভীষণ খাটুনি গেছে। তার ওপর এত পেটালে পেরানে বাঁচব না।'

একটা লোক হেঁড়ে গলায় গর্জে ওঠে, 'মারব না তো কি তোমায় কোলে বসিয়ে ক্ষীর খাওয়াব? ব্যাটা চোর—'

দোতলায় যখন তুলকামাল চলছে সেই সময় তেতলা থেকে ভারী, ঘুমজড়ানো গলায় কে যেন বলে ওঠে, 'কী হয়েছে রে, মাঝরাতে এত চেল্লাচিল্লি কেন?'

যারা পাঁচুকে মারধর করছিল তারা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'বাড়িতে চোর পড়েছে বাবা। আমরা তাকে একটু দলাই মলাই করছি।'

এদের যখন বাবা তখন তেতলার ওই লোকটি নিশ্চয়ই এ বাড়ির কর্তা। তিনি এবার হেঁকে ওঠেন, 'কেমন চোর একবার দেখি। ওপরে নিয়ে আয় ব্যাটাকে।'

ভয়ে পেটের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে পাঁচুর। ছেলেরা যদি এমন করে, তাদের বাবার পাল্লায় পড়লে হাড়গোড় কি আর আস্ত থাকবে? কিন্তু পালাবার উপায় নেই। ছেলেবেলায় একখানা যাত্রাপালা দেখেছিল সে। 'অভিমন্যু বধ'। মহাভারতের অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুকে সপ্তরথী সাত দিক থেকে ঘিরে মেরেছিল। এখন তারও হয়েছে সেই অবস্থা। যে ফাঁদে পড়েছে সেখান থেকে জ্যান্ত বেরুনো অসম্ভব।

সবাই মিলে টেনে হেঁচড়ে পাঁচুকে তেতলার একখানা ঘরে নিয়ে এল। সেখানে প্রকাণ্ড একটা খাটে পেল্লায় চেহারার একটা লোক কোল-বালিশের ওপর পা তুলে কাত হয়ে শুয়ে ছিল। অনেক কষ্টে ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে পাঁচুকে দেখতে দেখতে কর্তাবাবু বললেন, 'তোর নাম কী?'

পাঁচু কাঁপতে কাঁপতে নাম বলল।

'থাকিস কোথায়?'

পাঁচু তা-ও বলল।

'তা বাপু মাঝরাত্তিরে লোকের বাড়ি ঢুকে মালপত্তর না হাতালেই নয়?'

পাঁচু বলে, 'কী করব কত্তাবাবু, এ ছাড়া তো অন্য কাজ কিছু শিখিনি।'

কর্তাবাবু পাশ বালিশটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'চুরিবিদ্যে মহাবিদ্যে যদি না পড়ে ধরা। তা ধরা পড়তে গেলি কেন—অ্যাঁ?'

কর্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভয় কেটে যাচ্ছিল পাঁচুর। লোকটাকে ভালই মনে হচ্ছে তার। বলে, 'আমি খুব আলসে লোক। চটপট কোনো কাজ করতে পারি না। আপনাদের বাড়ি সেই কখন ঢুকেছি। তারপর অনেকক্ষণ চোখ বুজে জিরিয়ে নিলুম। আর কেউ হলে মালপত্র বেঁধে ছেঁদে ঢের আগেই পালিয়ে যেত। আলসেমির জন্যে ধরা পড়ে গেলুম।'

ঘুমন্ত চোখ দু'টো এবার পুরোপুরি খুলে যায় কর্তাবাবুর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচুকে আগাগোড়া একবার দেখে নিয়ে কর্তাবাবু বলেন, 'বা বা, লোকে আমাকে বলে কুঁড়ের রাজা, দিনরাত বিছানায় পড়ে থাকি। অ্যাদ্দিনে আমার একটা জোড়া পাওয়া গেল। চুরি করতে এসে গেরস্তর বাড়িতে বসে জিরোয়, এই প্রথম দেখলাম। তোর সঙ্গে কথা বলে বড় ভাল লাগছে। আলসে বলে তোকে ক্ষমা করে দিলুম। যা, ধীরে-সুস্থে এবার বাড়ি চলে যা।' নিজের ছেলেদের বললে, 'ওকে আর মারধর করিস না।'

পাঁচুর ওঠার নাম নেই।

ভুরু কুঁচকে কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল রে, বাড়ি যাবি না?'

হাতজোড় করে পাঁচু জানায়, 'খালি হাতে বাড়ি ফিরলে আমার বউ নেত্যকালী বঁটি দিয়ে আমার গলা কেটে নেবে।'

কর্তাবাবু বললেন, 'এ তো ভারি চিন্তার কথা। তা এক কাজ কর না, অন্য কোনো বাড়িতে গিয়ে দ্যাখ কিছু হাতিয়ে নিয়ে যেতে পারিস কিনা—'

কাঁচুমাচু হয়ে পাঁচু বলে, 'সেই সন্ধে থেকে বড্ড মেহনত গেছে কত্তাবাবু। আমার হাত-পা ভেঙে আসছে। তাছাড়া অন্য বাড়িতে যে যাব, সেখানেও তো ধরা পড়তে পারি। সবার তো আপনার মতো দয়ার শরীর নয়। মেরে চামড়া তুলে ফেলবে।'

কর্তাবাবুকে খুবই চিন্তিত দেখায়। তিনি বলেন, 'ফ্যাসাদে ফেলে দিলি দেখছি।'

পাঁচু সুযোগ বুঝে বলে, 'সোনাদানা, টাকাকড়ি, বাসনকোসন না নিয়ে গেলে রক্ষে থাকবে না। আপনার পায়ে ধরছি, কিছু একটা বিহিত করেন।' সত্যি সত্যিই সে কর্তাবাবুর দুই পা জাপটে ধরে।

খানিক ভেবে কর্তাবাবু বলেন, 'ঠিক আছে, কাপড়ে বেঁধে ক'টা তামা-কাঁসার বাসন নিয়ে বাড়ি যা। খবরদার দেওয়াল-ঘড়িটা নিবি না, ওটা আমার ঠাকুরদার।'

কর্তাবাবুর ছেলেরা তুমুল গোলমাল জুড়ে দেয়, চোরকে এভাবে আশকারা দিতে তারা একেবারেই রাজি নয়।

কর্তাবাবু তাদের বুঝিয়ে বলেন, 'পাঁচু আলসে বলে কি না খেয়ে মরবে! আহা ভগবানের জীব। তোরা বাপু এই নিয়ে আর হাঙ্গামা করিস না।'

ছেলেরা খুবই বাধ্য, বাবার কথায় চুপ করে যায়।

এদিকে পাঁচু কর্তাবাবুর পা ছাড়েনি। অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আবার কী?'

পাঁচু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'কত্তাবাবু, এতটা রাস্তা মাল ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার শক্তি নেই। কেউ একটু কষ্ট করে যদি বাসনকোসনগুলো পৌঁছে দেয় —'

'জ্বালালে দেখছি।' কর্তাবাবু তাঁর এক ছেলেকে বলেন, 'যা, পাঁচুর বাড়িতে ওগুলো দিয়ে আয়।'

বাপকে ছেলেরা ভীষণ মান্য করে। যাকে বলা হল, খানিক পরে বাসনকোসনের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে পাঁচুর সঙ্গে তার গাঁয়ে রওনা হল।

এ সব অনেক কাল আগের কথা।

এখন আর কর্তাবাবুর মতো সমঝদার দয়ালু মানুষ আর পাঁচুর মতো আলসে চোরেদের দেখা যায় না।

এক চোর এবং ধনঞ্জয় পাল

ষাট বছর আগের কথা।

তখনও দেশভাগ হয়নি। পূর্ব আর পশ্চিম, দুই বাংলা মিলিয়ে ছিল অখণ্ড বাংলাদেশ। তখন ওপার বাংলায় যেতে পাসপোর্ট, ভিসা কিছুই দরকার হত না। শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলে গড়গড়িয়ে চলে যাওয়া যেত গোয়ালন্দে। সেখান থেকে বিশাল স্টিমার নদীর বুকে তুফান তুলে পৌঁছে দিত তারপাশা, ভাগ্যকুল, মুন্সিগঞ্জ কি আরো দূর দূর জায়গায়। সে সব এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

আমার মামার বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বাজিতপুরে। ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে সেটা ছোটখাটো একটা শহর। এই শহরের একধারে ছিল মস্ত এক জঙ্গল। ওটা সাপখোপ, ভাম বেড়াল, পাল পাল শিয়াল আর খরগোশের আস্তানা। বাজিতপুরের লোকজন পারতপক্ষে ওধার মাড়াত না।

এই জঙ্গলেই এক গরমের দুপুরে চোরেদের মহা সম্মেলন ঘটে গেল। শুধু বাজিতপুরেরই নয়, আশেপাশের যত গ্রাম আর শহর আছে, সব জায়গা থেকে নাম-করা চোরেরা এসে হাজিরা দিল। এই মহামিলনের একটাই উদ্দেশ্য, তা হল ধনঞ্জয় পালের বাড়িতে চুরি করা।

ধনঞ্জয় পাল সম্পর্কে দু'চার কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার। লোকটার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। চারটে লোহার সিন্দুকে সেই টাকা পুরে বাইরে থেকে পেল্লায় পেল্লায় তালা লাগিয়ে রেখেছে। চাবির গোছাটা সর্বক্ষণ তার কোমরে বাঁধা থাকে।

যে ঘরে সিন্দুকগুলো রয়েছে সেখান থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে বেরোয় না ধনঞ্জয়। স্নান টানের জন্য ঘরের এক কোণে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ফলে তার আর বাইরে বেরুবার দরকার হয় না। রাতে ঘুমোয় না লোকটা। দিন হোক আর রাত হোক, সিন্দুক পাহারা দিয়ে যায়।

বাড়িতে ধনঞ্জয় ছাড়া আছে তার বউ আর দুই মেয়ে। বউ-মেয়েদের প্রত্যেকের সামনে পেছনে এক ডজন করে চোখ। সেই চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ির একটা কুটোও সরাবার উপায় নেই। দিনের বেলা তারা চারদিকে নজর রাখে, যাতে চোর চোট্টা কেউ ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে। সন্ধে হলেই বাসন কোসন, আটপৌরে জামাকাপড়, এমনকি বালতি বা ঝাঁটাটা পর্যন্ত ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় খিল এঁটে দেয়।

এই ধনঞ্জয়ের বাড়িতে চারপাশের চোরেরা কতবার যে হানা দিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু এক টুকরো সুতোও কেউ নিয়ে যেতে পারেনি। এখানকার চোরেদের কত নাম। তাদের খ্যাতির সুবাস শুধু ঢাকা জেলাতেই নয়, তখন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকে বলে, ওদের হাতে নাকি জাদু আছে। গেরস্ত যেখানেই তাদের সোনাদানা, টাকাপয়সা বা গয়নাগাটি লুকিয়ে রাখুক না, ওরা খুঁজে বার করে লোপাট করবেই। কিন্তু ধনঞ্জয়ের কাছে কোনো কৌশলই খাটে না। লোকটা তাদের মুখে একেবারে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে।

এবার জঙ্গলের ভেতরকার সেই সভার দিকে তাকানো যাক। এ অঞ্চলের চোরেদের যে গুরু, যার কাছে তালিম না নিলে চুরি বিদ্যাটা পুরোপুরি রপ্ত করা যায় না, তার নাম হল পীতাম্বর। কালো কুচকুচে গায়ের রং, বয়স ষাট, মাথার চুল ধবধবে সাদা। পরনে সবুজ পাজামা আর লাল হাফ শার্ট। আজকের সভার সে-ই সভাপতি। তার সামনে বসে আছে তার শ'দেড়েক শিষ্য।

পীতাম্বর বাজখাঁই গলায় বলল, 'আমাদের মানসম্মান বলতে কিছু রইল না। আমার দেড়শ' চেলার ভেতর এমন কেউ নেই যে ধনঞ্জয় পালের বাড়ি থেকে পাঁচটা টাকা কি একটা ঘটি নিয়ে আসতে পারে?'

চেলারা কেউ উত্তর দিল না, মুখ নিচু করে বসে রইল।

পীতাম্বর মুষড়ে পড়ল যেন, 'লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে রোগা, লিকলিকে চেহারার একজন বলল, 'কতবার ধনঞ্জয়ের বাড়ি গেছি। কিন্তু লোকটা সবসময় জেগে থাকে। কোনো জিনিস রাত্তিরে বাইরে ফেলে রাখে না। ওর বউ আর মেয়ে দু'টোর চোখেও ঘুম নেই। কোথাও একটু আওয়াজ পেলে রে রে করে ওঠে। গেরস্ত এত সেয়ানা হলে কিছু কি করা যায়, তুমিই বল দাদা?'

পীতাম্বর বলল, 'সিঁদ কাটতে পারিস না?'

'তুমি কি ভুলে গেলে দাদা, ধনঞ্জয়ের বাড়িটা পাকা। ভিত আর দেওয়াল যা মজবুত, ফুটো করা সিঁদকাঠির কম্ম নয়।'

'আরে তাই তো, বাড়িটা যে পাকা আমার খেয়ালই ছিল না। কিন্তু—'

'কী?'

আক্ষেপের সুরে পীতাম্বর বলল, 'আমার এতগুলো সাকরেদ থাকতে লোকটা পার পেয়ে যাবে?'

সবাই চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে পীতাম্বর বলল, 'দ্যাখ, হার আমরা কিছুতেই মানব না। একটা কথা ভেবে দেখলাম, তোদের ভেতর কেউ যদি ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে একখানা থালা কি দশটা টাকাও হাতিয়ে আনতে পারিস তাকে নগদ আড়াই শ'টাকা পুরস্কার দেব।'

ষাট বছর আগের আড়াই শ' টাকা মানে এখনকার সাত আট হাজার টাকার সমান, কি তারও বেশি। পুরস্কারের কথায় জমায়েতটা চনমন করে উঠল। দু'চারজন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কী ভেবে বলল না। ঠোঁট টিপে বসে রইল।

পুরস্কারের কথাতেও যখন কেউ চাঙ্গা হল না, তখন হতাশ হয়ে পড়ল পীতাম্বর। সে বুড়ো হয়েছে, চোখে ছানি পড়ায় ভাল দেখতে পায় না, তাই চুরি টুরি ছেড়ে দিয়েছে। সারা জীবন গেরস্তদের বাড়ি থেকে এত টাকাপয়সা, সোনার গয়না সে সরিয়েছে যে এখন আর চুরির দরকার হয় না। যা জমানো আছে তা দিয়ে পীতাম্বর নিজে তো বটেই, তার ছেলেরা আর নাতিরা পায়ের ওপর পা তুলে আরামে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। আজকাল সে অন্য চোরেদের শুধু তালিম দেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমাকেই কি ধনঞ্জয় পালের মালপত্তর হাতাবার জন্যে যেতে হবে?'

এবার জমায়েতের পেছন দিকে একটা সিড়িঙ্গে চেহারার ছোকরা উঠে দাঁড়াল। তার নাম ফটিক। বয়স আঠার উনিশ। গালে পাতলা দাড়ি। চোখ দু'টো একেবারে গোল। বলল, 'দাদা, তোমাকে যেতে হবে না। কাজটা আমিই করব।'

বছরখানেকও হয়নি, ফটিক এ লাইনে এসেছে। চুরিতে এখনো সেভাবে হাত পাকাতে পারে নি। পুরস্কারের লোভ দেখিয়েও যখন ঘাগু চোরেদের রাজি করানো যায় নি তখন ওর মতো আনকোরার পক্ষে কি কাজটা সম্ভব হবে? চিন্তিতভাবে পীতাম্বর বলল, 'তুই কি পারবি?'

ফটিক বলল, 'তোমার আশীব্বাদ থাকলে ঠিক পেরে যাব।'

পীতাম্বর খুশি হল। বলল, 'দ্যাখ তা হলে চেষ্টা করে।'

ফটিক উত্তর না দিয়ে হাত কচলাতে লাগল।

পীতাম্বর ওকে লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ।'

'বল না—'

'ধনঞ্জয় পালের বাড়ি থেকে কিছু আনতে পারলে, পুরস্কারের টাকাটা পাব তো?'

পীতাম্বর ভীষণ রেগে গেল, 'আমি কি মিথ্যে আশা দিয়েছি? জানিস না, পীতাম্বরের বাত হাতিকা দাঁত? যেদিন জিনিস এনে দেখাতে পারবি সেদিনই পুরস্কার পাবি। একেবারে নগদ নগদ—'

দিন দুই পর রাত্তিরবেলা ফটিক সারা গায়ে জবজবে করে সরষের তেল মেখে নিল, তারপর পরল কালো টাইট হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি। তেল মাখার কারণ, কেউ জাপটে ধরলে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারবে! কালো প্যান্ট ট্যান্ট পরার উদ্দেশ্য হল, রাতের অন্ধকারে খুব সহজে তাকে দেখা যাবে না।

সাজসজ্জা সেরে সে বেরিয়ে পড়ল।

ধনঞ্জয় পালের একতলা পাকা বাড়িটা বাজিতপুর শহরের ঠিক মাঝখানে। বাজিতপুর তো কলকাতা নয় যে গায়ে গায়ে বাড়ি থাকবে। এখানে প্রতিটি বাড়ির সামনে পেছনে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা।

ধনঞ্জয়ের বাড়ির সামনে মস্ত মাঠ, সেখানে বেশ কিছু উঁচু উঁচু গাছ। সেই মাঠটায় এসে ফটিক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে নজর রাখতে লাগল। এধারের একটা

জানালা দিয়ে ঘর থেকে আলো বাইরে এসে পড়েছে। ফটিক জানে ওই ঘরটা ধনঞ্জয়ের, সারা রাত ওখানে আলো জ্বলে।

ফটিক ভেবে ভেবে ঠিক করল, সামনে দিয়ে নয়, বাড়িটার পেছনের দিক দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

পেছনে গিয়ে দেখা গেল, কোনো আশা নেই। দশ হাত উঁচু পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাচ সিমেন্টের ভেতর গেঁথে দেওয়া হয়েছে। টপকাতে গেলে হাত-পা কেটে রক্তারক্তি হয়ে যাবে। পেছন দিকে যে দরজা রয়েছে সেটার পাল্লায় লোহার পাত বসানো। ওটা এতই মজবুত, ভাঙা অসম্ভব। তা ছাড়া, তারা ডাকাত নয় যে বাড়িঘর ভেঙেচুরে, গেরস্তকে খুন করে লুটপাট করবে। কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে হাতের সূক্ষ্ম কাজে তারা অন্যের মালপত্র সরায়। তলোয়ার-বন্দুক নয়, খুনখারাপি নয়, তাদের হল নিঃশব্দে শুধু দু'টো হাত দিয়ে ভেলকিবাজি দেখানো।

অগত্যা ফটিক আবার সামনের মাঠে চলে আসে। গাছের পেছন থেকে উঁকি মেরে ধনঞ্জয়ের ঘরটা দেখতে থাকে। আলো আগের মতোই জ্বলছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, ধনঞ্জয় ঘরময় পায়চারি করছে। খুব সম্ভব, একনাগাড়ে বসে থাকার জন্য পায়ে খিল ধরেছে তার। তাই কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নিচ্ছে।

এদিকে মশার ঝাঁক ফটিককে চারদিক থেকে একেবারে ছেঁকে ধরেছে। তাদের কামড়ে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, সারা গায়ে হাজারটা চোখা চোখা ছুঁচ ফুটছে।

ফটিকের হঠাৎ খেয়াল হল, পেছনের তুলনায় ধনঞ্জয়ের বাড়ির সামনের দিকের পাঁচিল অনেকটা নিচু। ভাবল, এধার দিয়েই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

হেঁটে বাড়িটার দিকে গেলে ধনঞ্জয় দেখে ফেলতে পারে, তাই হামাগুড়ি দিয়ে মাঠ পেরিয়ে পাঁচিলের কাছে চলে এল ফটিক। তারপর খুব আস্তে আস্তে মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, পাঁচিল থেকে হাত পাঁচেক দূরে জানালার ওধারে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

চোখাচোখি হতেই ট্যারাবাঁকা বড় বড় দাঁত বার করে হাসল ধনঞ্জয়, 'অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, মাঠে ঘুরঘুর করছিস। তোর মতলবটা কী রে?'

ফটিক আঁতকে উঠল। এত চেষ্টা করেও ধনঞ্জয়ের চোখে ধুলো দেওয়া যায়নি। তো তো করে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

ধনঞ্জয় আবার বলল, 'তোর আগে এই এলাকার ঘাগী ঘাগী চোরেরা এখানে এসেছে। কিন্তু কাঁচকলা—' দুই হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে সে বলল, 'কারো বাবার সাধ্যি নেই, আমার বাড়ি ঢুকে কিছু হাতিয়ে নিয়ে যায়।'

ফটিক দিশেহারা হয়ে গেল। হঠাৎ পেছন দিকে ঘুরে চোঁ চাঁ দৌড় লাগিয়ে সেই গাছের জটলাটার ভেতর চলে যায়। পাক্কা সাত মিনিট ধরে হাঁপায়। ভাবে, এখান থেকেই ধনঞ্জয়কে নমস্কার করে ফিরে যাবে কি না। পরক্ষণে মনে হল, বড় মুখ করে সে গুরু পীতাম্বরকে কথা দিয়ে এসেছে। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, পুরস্কারের নগদ আড়াইশ' টাকা। নাঃ, এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বসে মশার কামড় খেল ফটিক। তারপর ফের হামাগুড়ি দিয়ে মাঠ পেরিয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ির পাঁচিলের গা ঘেঁষে ঘাপটি মেরে বসে রইল। সে শুনেছে, ধনঞ্জয় পাল রাতে ঘুমোয় না। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে সারারাত জেগে থাকা কি সম্ভব? বেশিক্ষণ না হোক, আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টাও কি ধনঞ্জয়ের ঢুলুনি আসবে না? সেই সময়টুকুর ভেতর কাজ হাসিল করতে হবে।

জানালার ওধার থেকে ধনঞ্জয়ের হেঁড়ে গলা শোনা গেল, 'কি রে, আবার এসেছিস?'

ফটিক চমকে উঠল। দেখা যাচ্ছে, হামাগুড়ি দিয়ে এসেও ধনঞ্জয়ের নজর এড়াতে পারে নি। মনে মনে ভীষণ দমে যায় সে।

ধনঞ্জয় আবার বলল, 'বসে বসে মশার কামড় খেয়ে কী হবে? ওঠ, ওঠ—উঠে দাঁড়া।'

এ বাড়িতে কোনো আশাই নেই। তবু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হল ফটিক।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম রে তোর?'

ফটিক বারকয়েক ঢোক গিলে নামটা বলল।

ধনঞ্জয় বলল, 'তুই এসেছিস, তা একরকম ভালই হয়েছে। রাত্তিরে কথা বলার মতো লোকজন তো পাই না, মুখ বুজে বসে থাকতে হয়। একা একা বড্ড খারাপ লাগে। তা তোর সঙ্গে গল্প করে আজকের রাতটা কাটানো যাক। হ্যাঁ রে, তোর বাড়ি কোথায়?'

বাজিতপুর থেকে দশ মাইল দূরে সানকিভাঙা বলে একটা গ্রামের নাম বলল ফটিক।

'বাড়িতে তোর কে কে আছে?'

'শুধু আমি আর আমার মা।'

'তা এই চুরি চামারির লাইনে এলি কেন?'

'এছাড়া আর কিছুই যে তেমন পারি না।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে ধনঞ্জয় বলল, 'সেটা একটা কথা বটে। আর কিছু না পারলে চুরিটা তো করতেই হবে। নইলে খাবি কী? পেট চলবে কী করে?' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তা মায়ের পেট থেকে পড়েই কি চুরি শুরু করেছিস?'

ফটিক বলল, 'তাই কখনো হয়! আগে এটা সেটা করতাম। কিন্তু দু'বেলা খাওয়া জুটত না। বছরখানেক হল এই কাজটা ধরেছি।'

'এতে কীরকম হয়?'

'খারাপ নয়। সব গেরস্ত তো আপনার মতো রাত জেগে টাকাপয়সা পাহারা দেয় না।'

ধনঞ্জয় ফটিকের কথায় সায় দিয়ে বলে, 'তা বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানিস—'

উৎসুক সুরে ফটিক জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'আলসেমি। যাদের ঘরে টাকাপয়সা আর দামি দামি জিনিস আছে তারা কী করে যে ঘুমোয়, ভেবে পাই না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ধনঞ্জয় বলে 'তুই কি চোরেদের মহাগুরু পীতাম্বর দাসের চেলা?'

ফটিক জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

'আমার বাড়িতে তুই যে আসবি, পীতাম্বর তা জানে?'

'জানে।'

'জেনেও আসতে দিল তোকে?'

ফটিক চুপ করে রইল।

ধনঞ্জয় ফের বলে, 'তুই শুনিস নি, এ বাড়ি থেকে মহা মহা চোরেরা সোনাদানা দূরে থাক, এক টুকরো কাগজও হাতাতে পারে নি?'

ফটিক ঘাড় হেলিয়ে জানালো—শুনেছে। ধনঞ্জয় বলে, 'তা হলে তোর মতো সেদিনের ছোকরার এত সাহস হল কী করে যে আমার বাড়িতে চুরি করতে আসিস?'

অনেকক্ষণ ভেবে ফটিক বলল, 'সত্যি কথা বলব?'

'হ্যাঁ, যা সত্যি তাই বলবি। মিথ্যে কথা শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।'

ধনঞ্জয়ের বাড়িতে আসার কারণটা এবার জানিয়ে দিল ফটিক। সেই সঙ্গে পুরস্কারের কথাটাও। হাতজোড় করে বলল, 'যাতে পুরস্কারের ওই আড়াইশ'টা টাকা পাই, দয়া করে তার ব্যবস্থা করে দিন।'

শুনতে শুনতে ধনঞ্জয়ের মাথায় একটা দারুণ মতলব খেলে গেল। খুশিতে তার চোখদু'টো চকচক করতে লাগল। বলল, 'ব্যবস্থা আমি করব, কিন্তু তার আগে তোকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?'

'পুরস্কারের অর্ধেক আমাকে দিবি।'

মানে একশ' পঁচিশ টাকা। মুখটা একেবারে চুপসে গেল ফটিকের।

ধনঞ্জয় বলতে লাগল, 'এতে যদি রাজি থাকিস তো বল। নইলে সাত জন্ম চেষ্টা করলেও আমার বাড়ি থেকে কিছু হাতাতে পারবি না।'

ধনঞ্জয়কে আধাআধি দিলেও তার ভাগে একশ' পঁচিশ থাকছে। সেটাও অনেক টাকা। ফটিক বলল, 'আমি রাজি।'

'দাঁড়া একটু।'

ধনঞ্জয় ঘরের কোণ থেকে একটা পেতলের গাড়ু আর একখানা কাঁসার থালা এনে জানালা গলিয়ে ফটিককে দিতে দিতে বলল, 'এ দু'টোর গায়ে আমার নাম খোদাই করা আছে। দেখলে পীতাম্বর বিশ্বাস করবে, আমার বাড়ি থেকেই সরিয়েছিস। পুরস্কারের ভাগ দিতে যেদিন আসবি সেদিন মনে করে এ দু'টোও আনিস।'

'আচ্ছা—'

ফটিক কথা রেখেছে। দিন কয়েক পর রাত্রিবেলা এসে ধনঞ্জয়কে গুনে গুনে একশ' পঁচিশ টাকা এবং গাড়ু আর থালাটা দিয়ে গিয়েছিল।

আমার ছাত্র গাবুল

ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ওধারের ফুটপাতে উঠে বগেন বলল, 'আমরা এসে গেছি। ওই দ্যাখ—'

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি সামনেই পেল্লায় খাবারের দোকান। সেটার মাথায় মস্ত সাইনবোর্ডে লেখা : 'দি গ্রেটেস্ট বার বার খাবো মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।' প্রোঃ শ্রী জটাধর হালদার।

বগেন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এক পাড়ায় থাকি। থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করে মারোয়াড়ীদের অফিসে কী একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। এই গল্পটা অনেকদিন আগের। এখন যেটা মাধ্যমিক তখন সেটাই ছিল ম্যাট্রিক বা ম্যাট্রিকুলেশন। যাই হোক, ম্যাট্রিক পাস বগেন চাকরি পেয়েছে আর অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেও আমি বেকার বসে আছি। সেজন্য সবসময় আমার মন খারাপ।

বগেন মানুষটা খুবই ভালো। পরের দুঃখে তার প্রাণ গলে যায়। আমি যে চাকরি টাকরি পাচ্ছি না, তাতে ওর মনেও ভীষণ কষ্ট। আমার জন্য নানা অফিসে ছোটাছুটি করেছে যে, অনেককে ধরেছে, কিন্তু কিছুই হয়নি।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। 'দি গ্রেটেস্ট বার বার খাবো মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর প্রোপ্রাইটর জটাধর হালদারের সঙ্গে বগেনের অনেকদিনের জানাশোনা। জটাধর ছেলের জন্য তাকে একজন প্রাইভেট টিউটর জোগাড় করে দিতে বলেছিল। বলামাত্র সে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে। মাইনে পঁচাত্তর টাকা; এখনকার সাত আট শ'র সমান। আমার উপকার না করে সে ছাড়বে না।

বগেনের যতই উৎসাহ থাক, টিউশনিটা পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। বললাম, 'শুধু শুধু আমাকে টেনে আনলি বগেন।'

বগেন অবাক, জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

বললাম, 'সবে পাস করে বেরিয়েছি। পঁচাত্তর টাকায় স্কুলের ভালো ভালো টিচার পাওয়া যায়। আমাকে রাখবে কেন?'

গম্ভীর চালে হাসল বগেন, 'দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখেছিস?'

টিউশনি পাওয়ার সঙ্গে সাইনবোর্ডের কী সম্পর্ক, বুঝতে পারলাম না। বোকার মতো বললাম, 'দেখেছি। তাতে কী হল?'

'আগে নাম ছিল 'দি গ্রেট জগদ্বিখ্যাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। বিজনেস খুব ভালো হচ্ছিল না বলে জটাধর হালদার আমার অ্যাডভাইস চাইল। বললাম ওই বস্তাপচা নামে চলবে না। গ্রেটের জায়গায় গ্রেটেস্ট করলাম আর জগদ্বিখ্যাত কেটে 'বার বার খাবো'। তারপর

দোকানের বিক্রি দশগুণ বেড়ে গেছে। তুই আমার বন্ধু। হালদার তোকে টিউশনিটা না দিয়ে যাবে কোথায়? আয়—'

আমরা দোকানে ঢুকলাম। একদিকে সারি সারি কাচের শো-কেসে থরে থরে সাজানো রকমারি মিষ্টি—কাঁচাগোল্লা, সরভাজা, জল-ভরা সন্দেশ, ক্ষীরের বরফি, দরবেশ, অমৃতি। সিলভারের বিরাট বিরাট গামলায় রসগোল্লা, রাজভোগ, পানতুয়া। তা ছাড়া সিঙাড়া, নিমকি, হিঙের কচুরি।

দোকানের আরেক ধারে চেয়ার টেবলে খাওয়ার ব্যবস্থা। একটা চেয়ারও এখন খালি নেই, খদ্দের বোঝাই। তিনটে ছোকরা ছোটাছুটি করে তাদের খাবার দিতে দিতে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে।

খাওয়ার জায়গাটার পেছন দিকে একটা দরজা দিয়ে ভেতরের আরেকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে দুটো উনুনে প্রকাণ্ড লোহার কড়াইতে মালপো আর কচুরি ভাজা হচ্ছে।

খাবারের শো-কেসগুলোর পাশেই একটা গতিওলা তক্তপোষের ওপর যে লোকটা বিশাল ক্যাশবাক্স আগলে বসে আছে তার মাথায় কাঁচাপাকা, কদমছাঁট চুল। হাঁড়ির মতো মুখ, মস্ত ভুঁড়ি। চোখ দু'টো পুরোপুরি গোল, জিওমেট্রির সার্কেলের মতো। সারা গায়ে থাকে থাকে চর্বি। পরনে খাটো ধুতির ওপর চার পকেটওলা ফতুয়া। এই লোকটাই যে জটাধর হালদার, দেখামাত্র বুঝে গেলাম।

জটাধর আমাদের দেখতে পেয়েছিল। এক গাল হেসে দু হাত নেড়ে হেঁড়ে গলায় ডাকল, 'আসুন বগেনবাবু, আসুন—' গদির ওপর নিমকি সিঙাড়ার টুকরো উড়ে এসে পড়েছিল। আমরা এগিয়ে গেলে কোঁচার খুঁট দিয়ে সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে বেশ খাতির করে বলল, 'বসুন, বসুন—'

জটাধর হালদার যে সত্যি সত্যিই বগেনকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করে সেটা টের পাওয়া গেল। আমরা বসলে সে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলের মাস্টারের কী হল?'

'এই তো নিয়ে এসেছি।' বলে জটাধরের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল বগেন।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জটাধর চোখ কুঁচকে বলল, 'এই মাস্টারকে দিয়ে কী হবে?'

যেভাবে সে তাকিয়ে আছে তাতে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। তার ওপর যা বলল, ভীষণ দমে গেলাম।

বগেন কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হবে না মানে? জানেন সুকুমার বি.এ'তে দুর্ধর্ষ-রেজাল্ট করার জন্যে সোনার মেডেল পেয়েছে।'

সোনার মেডেলটা বাজে কথা। সেটা আমার দাম বাড়ানোর জন্য বলেছে বগেন।

দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে হাতজোড় করে জটাধর বলল, 'আপনি যখন সঙ্গে করে এনেছেন তখন সুকুমারবাবু পণ্ডিত মানুষই হবেন। ভালো পড়াবেনও। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলিনি।'

বগেনের রাগ পড়েনি। কড়া গলায় বলল, 'তা হলে কী ব্যাপারে বলেছেন?'

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে জটাধর বলল, 'ওনার চেহারাখানা ভাল করে দেখুন। যেন একখানি ফড়িং। ফুঁ দিলে উড়ে যাবেন।'

এটা ঠিকই, আমি বেজায় রোগা। বারো মাস পেটের অসুখে ভুগি।

ফড়িংয়ের উপমা শুনে থতমত খেয়ে গিয়েছিল বগেন। বলল, 'পড়ানোর সঙ্গে চেহারার কী সম্পর্ক?'

হুঁ হুঁ করে নাকের মধ্যে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করতে করতে জটাধর বলল, 'আছে, আছে। আমার ছেলেকে তো দেখেননি। এমন ত্যাঁদড়, হাড়বজ্জাত ছোকরা সারা দুনিয়া ঘুরে আর একটাও পাবেন না। ওকে টিট করা খুব সহজ কম্ম নয় বগেনবাবু।'

বগেন অবাক হয়ে বলল, 'কীরকম?'

'বাড়ি চলুন। নিজের চোখে গাবুলকে দেখলে বুঝতে পারবেন।'

বগেনের শ্যামবাজারে জরুরি একটা কাজ ছিল। বলল, 'আমি আর থাকতে পারছি না। সুকুমার গিয়ে তার স্টুডেন্টকে দেখে আসুক।' তারপর কী ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'কী জটাধরবাবু, টুইশনিটা আমার বন্ধুকে দিচ্ছেন তো?'

জটাধর ক্যাশবাক্সে সজোরে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আলবত। আপনি সুকুমারবাবুকে নিয়ে এসেছেন। দেব না মানে? তবে আগে উনি ছাত্তরটিকে (ছাত্রকে) দেখুন—'

বগেন চলে গেল।

দু'টো মাঝবয়সী লোক শো-কেসগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে খাবার বিক্রি করছিল। তাদের একজনকে ডেকে জটাধর বলল, 'পশুপতি তুমি ক্যাশে বসো। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আধঘণ্টার ভেতর ফিরে আসব।'

পশুপতি নামের বেঁটেখাটো লোকটি গদিতে উঠে কোলের কাছে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। আর জটাধর আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাশাপাশি যেতে যেতে বলল, 'সুকুমারবাবু, গাবুলটা ফি বচ্ছর ফেল করে। অঙ্কে গোল্লা, বাংলায় দশ, ইংরেজিতে তিন। এইসব হল নম্বরের বহর। ইস্কুলের মাস্টারদের রাজভোগ সরভাজা খাইয়ে খাইয়ে কেলাস সেভেনে তুলেচি। আমাদের বংশে কেউ কেলাস ফোরের বেশি উঠতে পারেনি। আমার বড্ড ইচ্ছে, গাবুল ম্যাট্রিকটা পাস করে হালদার বংশের মুখ আলো করুক।'

টুইশনিটা নিলে হালদার বংশের মুখ উজ্জ্বল করার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। কিন্তু গাবুলের রেজাল্টের যে নমুনা পাওয়া গেল তাতে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওকে ম্যাট্রিক পাস করানো কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? হোক বা না হোক, টুইশনিটা আমার চাইই। মাসে পঁচাত্তরটা টাকা সেই সময় আমার কাছে যেন স্বপ্ন।

জটাধরদের বাড়িটা দূরে নয়, কাছাকাছি একটা গলির ভেতর। সেখানে পৌঁছে আমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে জটাধর বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠল। 'গেবলো—অ্যাই গেবলো—'

সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের বয়স ছয় সাত থেকে বারো তেরোর মধ্যে। সবার চেহারা অবিকল জটাধরের মতো।

জটাধর বলল, 'গেবলো কোথায় রে?'

ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, 'কেলাবে কুস্তি করতে গেচে বাবা।'

জটাধর হুমকে উঠে, 'করাচ্ছি কুস্তি! এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'বাঙালির ছেলে হয়ে পালোয়ান বনবে। কাছেই একটা ব্যায়ামের আখড়া আছে। হতচ্ছাড়াটা দু বেলা সেখানে গিয়ে কুস্তি লড়ে। যত্ত সব বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড!'

এদিকে সেই ছেলেটা দৌড়ে চলে গিয়েছিল। মিনিট দশেক বাদে যাকে সঙ্গে করে ফিরে এল তাকে মাঝারি সাইজের একটা গোরিলা বলা যেতে পারে। বয়স ষোল-সতেরো। স্পষ্ট দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গেছে। পরনে হাফ প্যান্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জি। হাত-পা, বুক আর কাঁধের মাসল দেখা যাচ্ছে। সেগুলো মনে হল, একেকটা লোহার গোলা। সারা গায়ে, মাথায় মাটি লেগে আছে। ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে সে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। বোঝা যায়, আখড়ায় কুস্তি লড়ছিল, সেখান থেকে তাকে ধরে আনা হয়েছে।

জটাধর পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই হচ্ছে আপনার ছাত্তর গাবুল আর ইনি নতুন মাস্টারমশাই সুকুমারবাবু।' আমার পা দুটো দেখিয়ে গাবুলকে বলল, 'পেন্নাম করো।'

গাবুল নিচু হয়ে আমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

জটাধর এবার বলল, 'সুকুমারবাবু, আপনার ছাত্তরকে ভালো করে দেখে শুনে বাজিয়ে নিন। দোকান ফেলে এসিচি। আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনি গেবলোর সঙ্গে কথাবার্তা বলে দোকানে আসুন। আমার স্ত্রী ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগচে। বিছানা থেকে উঠতে পারচে না। বাড়িতে কে আর চা'টা দেবে। দোকানেই খাবেন। গেবলোকে আপনার কেমন লাগল তখন জেনে নেব।' গাবুলকে বলল, 'মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে মোটে বেয়াদপি করবি না।'

জটাধর চলে গেল।

বৈঠকখানায় একটা বড়ো টেবল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। তার একটায় আমি বসে আছি। গাবুল এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর ভাইবোনেরা ঘর ছেড়ে যায়নি। খুব মন দিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

গাবুলকে বললাম, 'বসো।'

আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল গাবুল। লক্ষ করেছি, আখড়া থেকে আসার পর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ছেলেটার তাকানোটা অদ্ভুত। চোখের পাতা পড়ে না। ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ভালো নাম কী?'

গাবুল বলল, 'আমার ওই একটাই নাম—গাবুলচন্দ্র হালদার।'

'কোন স্কুলে পড়ো?'

'ভবানীচরণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।'

এরপর কী প্রশ্ন করব যখন ভাবছি, হঠাৎ গাবুল বলে উঠল, 'মাস্টারমশাই, আপনাকে ক'টা কথা বলব।'

বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল না—'

'আমার গায়ে কিন্তু ভীষণ জোর।' গাবুল বলতে লাগল, 'মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে নারকেল ফাটাতে পারি।'

আমি চমকে উঠলাম।

গাবুলের ভাইবোনদের একজন সগর্বে বলল, 'গাবুলদা একবার ঘুষি মেরে একটা পাগলা ষাঁড়কে রাস্তায় শুইয়ে দিয়েচিল। একবার বুকের ওপর জিপ গাড়ি তুলে সোনার মেডেল পেয়েচিল। একবার—'

শুনতে শুনতে আঁতকে উঠছিলাম। বললাম, 'তাই বুঝি, তাই বুঝি—'

গাবুল বলল, 'আমার যেমন গায়ে জোর তেমনি রাগ। মাস্টারমশাই, যার ওপর রেগে যাই তাকে তুলে আছাড় মারি। কত লোকের হাত পা মাথা ভেঙে দিয়েচি জানেন?'

এমন বিপজ্জনক খবরগুলো আমাকে শোনাবার মানে কী? মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

গাবুল ফের বলল, 'একটা ব্যাপার সবসময় মনে রাখবেন। পড়া পড়া করে বেশি ঝামেলা করবেন না। আপনার আগে একুশটা মাস্টারকে ভাগিয়েচি।'

ওর এক ভাই শুধরে দিয়ে বলল, 'একুশটা না রে দাদা, তেইশটা। আমি গুনে রেখেচি।'

গাবুলের সামনে বসে থাকতে আর সাহস হল না। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে 'দি গ্রেটেস্ট বার বার খাবো মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ ফিরে এসে জটাধরের গদিতে ধপাস করে বসে পড়লাম।

জটাধর একটা চোখ ছোটো করে বলল, 'হাল খুব খারাব দেখচি। গেবলোটা খুব বজ্জাতি করেচে বুঝি?'

ঢোক গিলে বললাম, 'না, মানে কুস্তি লড়ে, ভীষণ রাগ, অনেক মাস্টার তাড়িয়েছে—'

'ঘাবড়ে গেছেন?'

মাসে মাসে পঁচাত্তরটা টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই ভয়ে তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'না না, ঘাবড়াব কেন?'

আমার কথা জটাধর কতটা বিশ্বাস করল, কে জানে। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'বগেনবাবু যখন আপনাকে এনেছেন তখন মাস্টারিটা লিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু তার আগে—'

'তার আগে কী?'

'আপনার শরীরটাকে তাগড়া করতে হবে। ছ' মাস দু'বেলা ফ্রিতে সন্দেশ খাওয়াব। দেখবেন চেহারা পালটে গেচে। গায়ে তাগদ না থাকলে ওই বুনো মোষকে সামলাতে পারবেন না।'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। পড়ানোর জন্য শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। এমন কথা আগে কখনও শুনিনি।

জটাধর আবার বলল, 'আজ থেকেই সন্দেশ শুরু করুন। ছ'মাস চলুক। তারপর পড়াবেন।' দোকানের একটা ছোকরাকে ডেকে বলল, 'চারটে করে বড়ো জল-ভরা সন্দেশ আর রাজভোগ নিয়ে আয়।'

তক্ষুনি সন্দেশ টন্দেশ এসে গেল।

জটাধর জানতে চাইল, 'এখন আপনার ওজন কত সুকুমারবাবু?'

বললাম, 'বত্রিশ সের।'

'ওটা কম করে এক মণ দশ সের করতে হবে।' তখন মণ সের টেরে ওজন করা হত। কিলো টিলো চালু হয়নি।

মাসখানেক সন্দেশ রাজভোগ খাওয়ানোর পর জটাধর একদিন আমাকে তার খদ্দের খুব বড়ো একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে মেপে দেখা গেল, মাত্র তিন সের ওজন বেড়েছে।

ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল জটাধর। ডাক্তারকে সব জানিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, 'হাতে মোটে পাঁচ মাস সময় আছে। এর ভেতর সুকুমারবাবুর ওজন আরও পনেরো সের বাড়াতে হবে ডাক্তারবাবু। দয়া করে আপনি তার ব্যবোস্তা করে দিন।'

ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে প্রচুর ভিটামিন, টনিক আর ইঞ্জেকশানের নাম লিখে দিলেন। সন্দেশ-টন্দেশের সঙ্গে সেগুলোও চলতে লাগল।

মাসখানেক বাদে ওজন নিয়ে দেখা গেল, আরও চার সের বেড়ে গেছে। এভাবে চললে ছ'মাসে নির্ঘাত এক মণ দশ সের হয়ে যাবে। এত আনন্দ হল যে মনে মনে তিন পাক নেচে নিলাম।

জটাধর কিন্তু ততটা খুশি হল না। আমার হাত-পা, বুকের ছাতি টিপেটুপে একদিন বলল, 'ওজনই শুধু বাড়চে সুকুমাবাবু। গা এত নরম থাকলে তো চলবে না। হাতের গুলি, পায়ের গুলি, বুক, সব পাথরের মতো শক্ত করতে হবে। নইলে গেবলোর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। এক কাজ করুন—'

জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

'খাওয়া দাওয়া, ওষুধ, ইনজেকশান যা চলছে চলুক। তার সঙ্গে ব্যায়ামটাও শুরু করে দিন।'

'ব্যায়াম!'

জটাধর বলল, 'হ্যাঁ, হ্যঁ, এ ছাড়া শরীর মজবুত করা যায় না।'

সেইদিনই জটাধর মুগুর, ডাম্ব-বেল ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম কিনে দিল। আমিও উঠে-পড়ে লাগলাম। যেভাবেই হোক, আমাকে গাবুলের উপযুক্ত টিউটর হয়ে উঠতে হবে।

ছ'মাস পর আমার ওজন এক মণ চোদ্দ সের হয়ে দাঁড়াল। তার মানে জটাধর যা চেয়েছিল তার চেয়ে চার সের বেশি। বুকের মাপ পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি। রীতিমতো বলবান যে হয়ে উঠেছি সেটা টের পাচ্ছি। নিজের ওপর বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। শ্রীমান গাবুলকে আর ট্যাঁ ফোঁ করতে হবে না।

সুতরাং একদিন জটাধরের সঙ্গে আবার তার বাড়ি গেলাম। কিন্তু গাবুলকে দেখে চুপসে যেতে হল। সাহস টাহস কর্পূরের মতো উবে গেল। ছ'মাস আগে সে মাঝারি একটা গোরিলা ছিল। এখন মস্ত পাহাড়ের মতো হয়ে উঠেছে। আমি যখন শক্তি সঞ্চয় করছি, তার মধ্যে কুস্তি লড়ে লড়ে শরীরটাকে দ্বিগুণ বানিয়ে ফেলেছে সে। ইচ্ছা করলে দু আঙুলে আমাকে পিষে মারতে পারে।

চিঁ চিঁ করে বললাম, 'আমি বাড়ি যাব—' এক লাফে বেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তার দিকে দৌড় লাগালাম।

'ও মশাই, কী হল আপনার? আরে দাঁড়ান—' জটাধর চেঁচাচে চেঁচাতে আমার পিছু নিল।

পেছন ফিরে তাকালাম না। আমার দৌড়ও থামল না। দমবন্ধ করে ছুটছি তো ছুটছিই। শ্রীমান গাবুলকে পড়ানো আমার কম্ম নয়।

এক জমিদার, এক চোর

এই গল্পটা একালের নয়, বহু বছর আগেকার। তখনো দেশ স্বাধীন হয়নি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আর ওপারের বাংলাদেশ, এই দুইয়ে মিলিয়ে ছিল আস্ত একখানা রাজ্য। আজকের বাংলাদেশকে সেই সময় বলা হত পূর্ব বাংলা।

আজকাল রাজা-বাদশা, জমিদার-টমিদার আর নেই। স্বাধীনতার পর তাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ষাট সত্তর বছর আগে সারা বাংলায়, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে কত যে ছোট বড় এবং মাঝারি ধরনের জমিদার ছিল তার লেখাজোখা নেই।

আমাদের এই গল্পটা ওপার বাংলার এক জমিদার আর এক চোরকে নিয়ে।

শুরুটা চোরকে দিয়েই করা যাক। তার নাম টানু। ওদের বাড়ি ছিল ঢাকা শহর থেকে ষাট মাইল দূরের এক গ্রাম টনকপুরে। টনকপুরের চারপাশে আরো কুড়ি বাইশটা বড় বড় গ্রাম তো ছিলই, ছিল দু'তিনটে ছোটখাটো শহরও। এরকম একটা শহরে থাকতেন জমিদার রঘুবীর চৌধুরী। কিন্তু তাঁর কথা পরে।

টানুর বাবা, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাবা, তার বাবা, তার বাবা—সবাই ছিল দুর্ধর্ষ চোর। গভীর রাতে মানুষজন যখন গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে, খাটো প্যান্ট পরে, সারা গায়ে জবজবে করে সরষের তেল মেখে তারা বেরিয়ে পড়ত। তেল মাখার কারণ হল, যদি কেউ ধরতে চায় পিছলে বেরিয়ে যেতে পারবে। তাদের হাতে ছিল দারুণ ম্যাজিক। চুপিসারে এ বাড়ি সে বাড়ি হানা দিয়ে টাকাপয়সা, গয়নাগাটি বা বাসনকোসন হাতিয়ে ভোরবেলা ফিরে আসত। তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুম। অনেক বেলায় উঠে, চান সেরে, টেরি বাগিয়ে, ফুলবাবুটি সেজে, চকচকে জুতোয় মস মস আওয়াজ তুলে পাড়া ঘুরতে বেরুত। তখন কেউ বুঝতেই পারত না, মাঝরাতে এরা কী করে বেড়ায়।

সাত পুরুষ ধরে টানুরা চোর। এমন একটা বিখ্যাত বংশে জন্মেও সে কিন্তু বাপ-ঠাকুদার নাম রাখতে পারেনি। বলা যায়, বংশের মুখে কালিই লেপে দিয়েছে। অথচ তার হাতের কাজ যে খুব খারাপ তা নয়। ইচ্ছা করলে গেরস্তর বাড়ি থেকে সোনাদানা সরিয়ে এনে সে ঘর ভরিয়ে ফেলতে পারত, কিন্তু তার নজর সেদিকে নেই। সারাক্ষণ তার শুধু খাই-খাই, দিনরাত পেটে যেন আগুন জ্বলতে থাকে। নিশুতি রাতে বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে কোনো বাড়িতে ঢুকলে আগে সে খোঁজ করবে কোথায় খাবারদাবার আছে।

সে আমলে গ্রামে চপ, কাটলেট, প্যাস্ট্রি, কেক টেকের নাম কেউ শোনেনি। গেরস্তরা মুড়ি, চিঁড়ে, পাটালি গুড়, নারকেল নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, তিলের নাড়ু, কদমা বা চিনির মঠ

দিয়ে হাঁড়ি বা টিন বোঝাই করে রাখত। সে সব সাবাড় করে খুব খুশি মনে ফিরে আসত টানু। চিঁড়ে মুড়ি না পাওয়া গেলে পান্তাভাত, বাসি ডাল-তরকারি, শসা, আম, কাঁঠাল— যা মিলত তাই খেত। একেবারে রাক্ষসের খিদে টানুর। সে যে কী পরিমাণ খেতে পারে, তা দেখলে লোকের চোখ কপালে উঠে যাবে।

সংসারে মা ছাড়া আর কেউ নেই টানুর। বাবা অনেকদিন আগেই মরে গেছে। তারপর থেকে বাড়ির হাল ভীষণ খারাপ। ঘরের চাল টুটোফুটো, বর্ষাকালে ভেতরে একেবারে বান ডেকে যায়। তালি মেরে মেরে জামা-কাপড়ের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পরা যায় না। টানু না হয় লোকের বাড়ি থেকে চুরিচামারি করে খেয়ে আসে। কিন্তু তার মা মঙ্গলা খায় কী? সেদিকে যদি টানুর এতটুকু হুঁশ থাকে! কীভাবে যে মঙ্গলা সংসার চালায় শুধু সে-ই জানে। ছেলে যদি মানুষ হত, তার কি দুঃখ থাকত!

মঙ্গলা প্রায় রোজই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলে ফেলত, 'লক্ষ্মীছাড়া, বংশের নাম ডোবালি! খালি খাওয়া আর খাওয়া! গেরস্তর বাড়ি চিঁড়ে মুড়ি ভাত ডাল ছাড়া আর কিছু থাকে না? জামাকাপড়, চুড়ি-হার, থালা-ঘটি-বাটি— এসব নজরে পড়ে না? নাকি অন্ধ হয়ে গেছিস? এবার থেকে খালি হাতে বাড়ি ফিরলে তোর একদিন কি আমার একদিন।'

টানু উত্তর দিত না, মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকত। কেননা সে জানত কিছু বললে মায়ের রাগ আরো চড়ে যাবে।

এইভাবেই দিন কাটছিল। কিন্তু সেবার শীতকালে মঙ্গলা এত খেপে গেল যে মাথার ঠিক রইল না। রাগের কারণও ছিল। ঘরে জমানো যে টাকাপয়সা ছিল তা ভাঙিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছে। টানুর বাবা চুরি করে যে সব সোনাদানা আনত, পেতলের হাঁড়িতে ভরে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। অকর্মার ধাড়ি ছেলের জন্য সেগুলো একটা একটা করে বেচে পেট চালাতে হয়েছে। শেষ গয়নাটি হাতছাড়া হওয়ার পর একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল মঙ্গলা। বলল, 'দু' দিন সময় দিলাম তোকে। এর ভেতর যদি কিছু ঘরে আনতে না পারিস, তোর কী হাল করি গাঁয়ের লোক দেখতে পাবে।'

মায়ের এমন অগ্নিমূর্তি আগে দেখেনি টানু। সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। না, এবার কিছু একটা না করলেই নয়। মাকে দেখিয়ে দেবে বংশের মানমর্যাদা রাখতে সেও জানে। এবার থেকে বস্তা বস্তা সোনারুপো হীরেপান্না এনে মাকে দেবে সে।

টনকপুরে টানুর এক শাগরেদ ছিল। তার নাম জগা। ছোকরা খুবই তুখোড়। চারদিকের বিশখানা গ্রাম আর তিনটে শহরে কোন বাড়ির কোন সিন্দুকে গয়না আর টাকা থাকে, কোন আলমারিতে থাকে দামী দামী জামাকাপড়, সব খবর সে রাখে। কিন্তু টানুর জন্য সিন্দুক বা আলমারিতে হাত দেবার যো নেই। কেননা কোনো বাড়িতে ঢুকলে খাবারদাবার ছাড়া অন্য দিকে মন থাকে না টানুর। ফলে আসল কাজটা আর হয়ে ওঠে না। টানুকে ছাড়া সিন্দুক টিন্দুক খোলার কথা ভাবতে পারে না জগা, সে শুধু পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখে। তারপর ভীষণ মনমরা হয়ে খালি হাতে ফিরে আসে।

সেদিন মায়ের কাছে প্রচণ্ড ধাতানি খাওয়ার পর জগাদের বাড়ি এল টানু। তাকে বলল, 'মা আজ খুব রাগারাগি করেছে। কালকের মধ্যে কিছু হাতিয়ে আনতেই হবে।'

চুরিবিদ্যায় তার মাস্টারমশাই হল টানু। এতকাল বাদে তার সুমতি হওয়ায় জগা বেজায় খুশি। একমুখ হেসে বলল, 'টানুদা, আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না।'

'শোন, এই প্রথম শুভকাজে হাত দিতে যাচ্ছি। ঘটি বাটি সরিয়ে হাত নোংরা করব না।'

'কী ধরনের মাল হাতাতে চাইছ?'

'দামী দামী গয়না, সোনার মোহর। চারদিকে খোঁজ কর, কাদের বাড়িতে এ সব আছে।'

'কাল দুপুরের ভেতর খবর পেয়ে যাবে।'

সত্যি সত্যিই পরদিন সুসংবাদটা পাওয়া গেল। জগা এসে জানালো, টনকপুর থেকে চার মাইল দূরে রাজানগর বলে যে শহরটা আছে, সেখানে জমিদার রঘুবীর চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে। ঢাকা থেকে দু'দিন আগে প্রচুর সোনা আর হীরের গয়না, গাদা গাদা বেনারসী শাড়ি, রুপোর বাসন, এমন কত কী যে আনা হয়েছে তার হিসেব নেই। সে সব রাখা হয়েছে জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের দোতলায়, দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানায়।

জগা বলে, 'টানুদা, ওখানে যা জিনিসপত্তর আছে তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি সরাতে পারি, সারা জীবনে আর কিছু করার দরকার হবে না। গাঁ ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে রাজার হালে থাকব।' উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

জগার যতই উৎসাহ হোক, জমিদার বাড়ির নাম শুনে বেশ দমে যায় টানু। বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'জমিদার বাড়িতে বন্দুকওলা দারোয়ানরা আছে। ওখানে ঢুকলে প্রাণ নিয়ে কি ফিরে আসতে পারব?'

জগা চোখ নাচিয়ে বলে, 'দারোয়ানরা থাকে বাড়ির সামনের দিকে। আমরা ওধার দিয়ে ঢুকব নাকি?'

টানু বলে, 'তা হলে?'

'ঢোকার অন্য রাস্তা আছে। কোনো চিন্তা নেই তোমার। আজ জমিদারবাবুর মেয়ের বিয়ে। আজই ওখানে যেতে হবে কিন্তু। নইলে গয়নাটয়না কিছুই মিলবে না। মেয়ের সঙ্গে সে সব কাল শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে।'

'ঠিক আছে, তাই যাব। কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'রাজনগরে পৌঁছুতে আমাদের সন্ধে হয়ে যাবে। তার আগেই যদি মেয়েকে গয়না পরিয়ে দেয়? বিয়ের কনের গা থেকে খুলে তো আর নেওয়া যাবে না। তখন এতটা রাস্তা যাওয়া-আসাই সার।'

জগা সে খবরও নিয়েছে। বিয়ের লগ্ন ভোরে। রাত আটটা ন'টার আগে ওরা মেয়ে সাজাবে না। ভোর পর্যন্ত দু'সের সোনা, হীরে, মুক্তো, পাঁচ সের বেনারসী টেনারসী গায়ে চাপিয়ে কেউ বসে থাকতে পারে!'

'এত সব খবর কোথায় পেলি?'

'জমিদার বাড়িতে আমার বন্ধু গণশা কাজ করে, তার কাছেই পেয়েছি। মালপত্তর সরাতে পারলে তাকে বখরা দিতে হবে কিন্তু।'

'তা দেওয়া যাবে।'

সেদিনই বেলা থাকতে থাকতে টানু আর জগা একটা বড় থলেতে আংটা লাগানো লম্বা দড়ি, সরষের তেলের শিশি আর খাটো প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়ে। তাদের পরনে এখন পাজামা আর হাফশার্ট। জমিদার বাড়িতে ঢোকার আগে পাজামা টাজামা খুলে প্যান্ট পরে জম্পেশ করে সারা গায়ে তেল মেখে নেবে।

টানুরা যখন রাজানগরে জমিদার রঘুবীর চৌধুরীর বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হল, সন্ধে হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড দু' মহল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে টানুর চক্ষু চড়কগাছ।

রাজানগরে তখনো ইলেকট্রিক লাইট আসেনি। জমিদারের মেয়ের বিয়ে তো আর ম্যাড়মেড়ে লণ্ঠন কি হ্যাজাক জ্বেলে হয় না। রঘুবীর চৌধুরী ঢাকা থেকে পেল্লায় ডায়নামো আনিয়ে বাড়িটা আলোয় আলোয় ভরে দিয়েছেন। ভটর ভটর করে মেশিনটার প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে।

দেখা গেল, গেটের সামনে উর্দি আর পাগড়ি-পরা দারোয়ানরা বুকে টোটার মালা আর হাতে বন্দুক নিয়ে মিলিটারি কায়দায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি-পরা কয়েকজন নানা বয়সের লোকও সেখানে রয়েছে, আর আছে সিল্কের শাড়ি-পরা দু'টি কিশোরী। এদের একজনের হাতে রুপোর বড় রেকাবি বোঝাই গোলাপ ফুল, আরেকজনের হাতে গোলাপ জল। বিয়ে সেই ভোরের দিকে হলে কী হবে, এর মধ্যেই নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছে। একটি কিশোরী তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে গোলাপ ফুল দিচ্ছে আর অন্য কিশোরীটি তাদের গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

গেটের ঠিক ওধারেই উঁচু মঞ্চ করে নহবতখানা বসানো হয়েছে। সেখানে সানাইওলারা সমানে বাজিয়ে চলেছে। নহবতখানার পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর ফুল আর আলো দিয়ে সাজানো বিশাল শামিয়ানা। সেখানে প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছে। তাদের হইচই, ব্যস্ততা আর হাসাহাসিতে সারা বাড়ি সরগরম।

ভয়ে ভয়ে টানু বলে, 'তুই বলেছিলি ভেতরে ঢোকার অন্য রাস্তা আছে।'

জগা বলে, 'আছেই তো। এস আমার সঙ্গে—'

'বাড়িভর্তি এত লোক, এদের চোখে ধুলো দিয়ে কি কিছু করতে পারব? ধরা পড়লে তোর আর আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে রে জগা!' টানুকে খুবই চিন্তিত দেখায়।

টানুকে নিয়ে জমিদার বাড়ির পেছন দিকে চলে আসে জগা। এ ধারটা অন্ধকার, লোকজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে একেবারে ফাঁকা। যত মানুষজন আর হইচই সামনের দিকে। তবে গোটা বাড়িটার চৌহদ্দি ঘিরে যে পাঁচিল, এখানে তা দশ হাতের মতো উঁচু। দশ হাত কেন, বিশ হাত হলেও টানুদের ঠেকানো অসম্ভব।

টানু বলল, 'জব্বর একখানা জায়গা খুঁজে বার করেছিস। আর চিন্তা নেই, চটপট তৈরি হয়ে নে।' তার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, এবার কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

যে বিরাট থলেটা ওরা নিয়ে এসেছিল, তার ভেতর থেকে আংটাওলা দড়ি, সরষের তেল আর হাফ প্যান্ট বার করে টানু। তারপর গায়ের পাজামা শার্ট খুলে, প্যান্ট পরে পা

থেকে গলা পর্যন্ত আচ্ছা করে তেল মেখে, দড়িটা নিয়ে পাঁচিলের কাছে চলে আসে। দড়িটা ওপরে ছুঁড়ে দিতেই পাঁচিলের মাথায় আংটা আটকে যায়।

টানু বলে, 'আমি আগে উঠছি। ওপারে গিয়ে দেখি ধারে কাছে কেউ আছে কি না। আমি শিস দিলে তুই পাঁচিল টপকাবি।'

ঘাড় হেলিয়ে জগা বলে, 'আচ্ছা—'

দড়ি বেয়ে চোখের পলকে পাঁচিলের মাথায় চড়ে বসে টানু। ওধারে ঠিক তলা থেকেই বাগান। বাগানটা পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলে তবে মূল বাড়ি। টানু ভাল করে লক্ষ করল—না, কেউ কোথাও নেই। তবু ওপারে নেমে পাঁচিলের গা ঘেঁষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার ভয়, হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে সে টুই টুই করে শিস দেয়। একটু পরে পাঁচিল ডিঙিয়ে নেমে আসে জগা। তারপর আংটা সুদ্ধ দড়ি খুলে নিয়ে গুঁড়ি মেরে দু'জনে বাড়িটার কাছে চলে আসে।

চাপা গলায় ফিসফিস করে টানু জিজ্ঞেস করে, 'যে ঘরে গয়না টয়না আছে, সেটা কোথায়?'

জগা বলে, 'গণশা বলেছিল দোতলায় দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায়। মনে হচ্ছে ওটা—' বলে আঙুল বাড়িয়ে একটা ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘরটার এ ধারের দরজা বন্ধ, তবে জানালার একটা পাল্লা একটুখানি খোলা রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে আলো বেরিয়ে এসেছে।

'যদি ওটা না হয়?'

'তখন অন্য ঘরে খুঁজে দেখতে হবে।'

'গণশাকে পাওয়া গেলে ভাল হত। সে ঘরটা দেখিয়ে দিতে পারত।'

'তাকে এখন কোথায় পাব?'

'তা হলে আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? ওপরে উঠে পড়া যাক।'

দোতলার এদিকটায় লোহার রেলিং দেওয়া টানা বারান্দা। যেভাবে দড়ির আংটা লাগিয়ে পাঁচিল টপকেছিল, অবিকল সেইভাবে দোতলায় উঠে পড়ে দু'জনে। তারপর বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে কোণের ঘরটার কাছে চলে আসে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে ভেতরে কিচ্ছু নেই, ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

হতাশভাবে টানু বলে, 'এ ঘরটা নয় রে জগা, জিনিসপত্তর অন্য কোথাও আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ভেতরে ঢুকে খোঁজ করতে হবে।'

যে প্যান্ট পরে তারা লোকের বাড়ি হানা দেয় তার পকেটে একটা অদ্ভুত ধরনের চাবি আর লম্বা চ্যাপ্টা লোহার পাত থাকে। ওই চাবি দিয়ে পৃথিবীর সব তালা খোলা যায়। আর লোহার পাতটা দরকার হয় বাইরে থেকে দরজার হুড়কো খোলার জন্য।

টানু বলল, 'চারদিকে নজর রাখ, আমি ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করছি।' বলে দরজার দু'টো পাল্লার সরু ফাঁকের ভেতর লোহার পাত ঢুকিয়ে খুব সাবধানে হুড়কো তুলে ফেলে। তারপর একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল ওধারেও একটা দরজা আছে, সেটা খোলা। টানুরা আস্তে আস্তে ওটার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে এদিকটা বাড়ির অন্দরমহল। মাঝখানে চৌকো বর্গক্ষেত্রের মতো বিশাল বাঁধানো উঠোন

ঘিরে সারি সারি ঘর। উঠোনের এধারে অর্থাৎ যেদিকটায় টানুরা রয়েছে সেখানে কেউ নেই, কিন্তু উঠোনে এবং উঠোনের ওধারের ঘরগুলোতে মেয়েদের ভিড়। দোতলায় বিয়েবাড়িতে যেমন হয় তেমনি হই-হুল্লোড় আর হাসাহাসি, মাতামাতি চলছে। ডাইনে এবং বাঁয়ের ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। তবে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

টানু ডান দিকটা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'আগে এদিকের ঘরগুলো দেখি। মাল পাওয়া না গেলে বাঁয়ে যাব। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়, বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে হবে। নইলে নিচে থেকে কেউ দেখে ফেললে কী হবে তা তো জানিসই।'

ডান ধারের তিনখানা ঘর খোঁজাখুঁজি করে একটা ফুটো পয়সাও পাওয়া গেল না। এদিকের শেষ মাথায় আর একটিমাত্র ঘর রয়েছে, কিন্তু তার দরজায় ঢাউস তালা ঝোলানো। পকেট থেকে চাবি বার করে সেটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, পর পর তিনখানা জবরদস্ত সিন্দুক। চাবি দিয়ে প্রথম সিন্দুকটা খুলতেই দু'জনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গণশা ঠিক খবরই দিয়েছে। টানুরাই ঘর ভুল করে ফেলেছিল।

সিন্দুকটা সোনা আর হীরেমুক্তোর গয়নায় বোঝাই। জগা টানুর কানে মুখ ঠেকিয়ে বলে, 'টানুদা, দেরি করা চলবে না। যতগুলো পারি পকেটে পুরে সরে পড়া যাক—'

'হ্যাঁ—' বলে সিন্দুকের ভেতর সবে হাত ঢুকিয়েছে টানু, সেই সময় হঠাৎ কিসের একটা গন্ধ নাকে লাগতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জগা পেছন থেকে তাড়া লাগায়, 'কী হল টানুদা, তাড়াতাড়ি কাজ সারো। তোমার নেওয়া হলে আমি নেব।'

তার কথা যেন শুনতেই পায় না টানু। ঘুরে দাঁড়িয়ে নাক টেনে টেনে হাওয়ায় গন্ধ শুঁকতে থাকে।

জগা দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে তটস্থ ভঙ্গিতে বলে, 'হুট করে কেউ যদি এ ঘরে চলে আসে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী দাদা, চটপট মাল হাতিয়ে সরে পড়ি চল।'

টানু নাক টানতে টানতে বলে, 'আ, কী চমৎকার গন্ধ ! নিশ্চয়ই পোলাওয়ের। কোত্থেকে আসছে বল তো—' বলতে বলতে ডান দিকের জানালার কাছে চলে যায়।

নিচে প্যান্ডেল খাটিয়ে বিয়েবাড়ির রান্নাবান্না চলছে। একধারে চার পাঁচটা বিরাট বিরাট উনুনে পেল্লায় পেল্লায় কড়াইতে টগবগ করে কী সব ফুটছে। আরেক দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াইতে পোলাও, মাংস, চার রকমের মাছ, সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, পেল্লায় পেল্লায় জালায় রাজভোগ, পানতুয়া, ক্ষীরমোহন এবং আরো কত রকমের যে সুখাদ্য তার লেখাজোখা নেই। সে সব দেখতে দেখতে লোভে টানুর চোখ চকচক করতে থাকে।

পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করছিল জগা। টানু কী চায় তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না তার। চাপা গলায় বলে, 'টানুদা, ওদিকে তাকিও না। এধারে চলে এস।'

টানুর বোধহয় জিভে জল এসে গিয়েছিল। সড়াৎ করে টেনে নিয়ে বলে, 'জগা রে, সোনারুপো হীরেমোতি জীবনে অনেক হাতাতে পারব কিন্তু এমন পোলাও কালিয়া আর কখনো পাব না। আয় আমার সঙ্গে—'

'টানুদা, ভাল ভাল খাবার দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আজকের মতো লোভটা সামলাও দাদা।'

'বকর বকর বন্ধ করে আমি যা বলি তাই কর।' বলে খপ করে জগার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাইরের বারান্দার শেষ মাথায় চলে যায়। রেলিংয়ে সেই দড়িটার আংটা আটকে একরকম জোর করে জগাকে নামিয়ে দিয়ে তারপর নিজে নেমে পড়ে। প্যাণ্ডেলের কোণের দিকে যেখানে সুখাদ্যগুলো থরে থরে সাজানো রয়েছে তার পাশেই আছে অগুনতি মাটির গেলাস আর কলাপাতার স্তূপ। সেখানে এসে একটা কলাপাতা নিয়ে টানু সবে পোলাওতে হাত দিয়েছে, তক্ষুণি রান্নার লোকেদের চোখে পড়ে যায়। 'চোর চোর', 'ধর ব্যাটাদের—' চিৎকার করতে করতে তারা দৌড়ে আসে।

জগা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'তখনই তোমাকে বলেছিলাম লোভ করো না। আমার কথা কানেই নিলে না। এখন—এখন কী হবে? প্রাণটা স্রেফ গেল—'

দু'জনে উর্ধ্বশ্বাসে পেছনের বাগানের দিকে দৌড় লাগায়। কিন্তু যাবে কোথায়? রান্নার লোকেদের চেঁচামেচি শুনে চারপাশ থেকে হই হই করতে করতে বিয়েবাড়ির অন্য লোকজন তাড়া করে আসে। কোনো দিকেই পালাবার পথ নেই। জগা আর টানু পলকে ধরা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ওপর বেধড়ক কিল চড় পড়তে থাকে। তারই মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'মেরো না, মেরো না। জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে চল। বিচার করে যা সাজা দিতে হয় তিনিই দেবেন।'

হিড় হিড় করে টানতে টানতে জগা এবং টানুকে বার-মহলে অর্থাৎ যেখানে শামিয়ানা আর নহবতখানা বসানো হয়েছে, সেখানে নিয়ে আসা হয়। রঘুবীর চৌধুরী আর নিমন্ত্রিত অতিথিরা ওখানেই ছিলেন।

চোর ধরার খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুহূর্তে টানুদের চারপাশে ভিড় জমে যায়। এমনকি গেটের দারোয়ানরা পর্যন্ত ছুটে এসেছে। মেয়েরা অন্দরমহল ছেড়ে আসেনি বটে, তবে ওধারে ছাদে উঠে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

রঘুবীর চৌধুরীর জবরদস্ত চেহারা, মোটা পাকানো গোঁফ, মাথায় বাবরি। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর কুঁচনো ধুতি আর দামী শাল। পায়ে চকচকে পাম্প-শু। গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

ভিড়ের ভেতর থেকে গলা মিলিয়ে কয়েকজন বলে ওঠে, 'দু'টো চোর বড়বাবু। পোলাও কালিয়া চুরি করছিল—' তাদের দেখাদেখি আরো অনেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তেজিতভাবে একটানা কী যেন বলতে থাকে যার একটা বর্ণও বোঝা যায় না।

হাত তুলে হট্টগোল থামিয়ে দেন রঘুবীর। চোখ পাকিয়ে টানু আর জগার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে হুঙ্কার ছাড়েন, 'সত্যি করে বল, কী মতলবে আমার বাড়িতে ঢুকেছিস?'

গলার আওয়াজে টানুদের হাত পায়ের হাড় যেন আলগা হয়ে যায়। টানু ঢোক গিলে বলে, 'বড়বাবু ভাল ভাল খাবার দেখে—মানে—' বলতে বলতে থেমে যায়।

'মানে খাবার চুরি করতে?'

'বড্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল। আর ওইসব খাবার জন্মে দেখিনি—'

'খাবারই যদি চুরি করবি তা হলে সারা গায়ে তেল মেখে হাফ প্যান্ট পরে এসেছিস কেন?'

এবার আর গলায় স্বর ফোটে না টানুর।

হুঙ্কারটা এবার দশগুণ বেড়ে যায় রঘুবীরের, 'সত্যি কথা বলবি, না নিচে বাঁশ ওপরে বাঁশ দিয়ে ডলা দেবার ব্যবস্থা করব?'

টানু সটান রঘুবীরের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলে, 'মাপ করে দিন হুজুর। জীবনে আর কখনো এধারে আসব না।'

'সত্যি করে বল কী হাতাতে এসেছিলি? তারপর মাপ করব, না মাটিতে কোমর অব্দি পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়াব সেটা ভেবে দেখব।'

টানু রঘুবীরের দু' পা আঁকড়ে ধরে বলে, 'গয়না চুরি করতে এসেছিলাম হুজুর। আপনাদের সিন্দুক খুলেও ফেলেছিলাম। তারপর পোলাওয়ের গন্ধ পেয়ে—মানে ভাল খাবারদাবার দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।'

চারদিক থেকে দারোয়ান আর অন্য লোকজনেরা তুমুল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, 'হুজুর, শুধু হুকুম দিন, দুই হারামজাদাকে মেরে একেবারে কিমা বানিয়ে ফেলি।'

তাদের চুপ করিয়ে দিয়ে রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো মুখ করে রঘুবীর বলেন, 'হীরে সোনা ছেড়ে তোরা পোলাও মাংস চুরি করতে গেলি, আমাকে এসব বিশ্বাস করতে বলিস?'

মুখ কাঁচুমাচু করে টানু বলে, 'হুজুর, বললাম তো ভাল ভাল খাবার পেলে আমি আর কিচ্ছু চাই না।'

জগা এতক্ষণ হাতজোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে মুখ খোলে, 'ও খুব খেতে পারে হুজুর। কিন্তু আমরা তো ভীষণ গরিব, মণ্ডা মিঠাই, পোলাও কালিয়া, রাবড়ি সন্দেশ কোথায় পাব? তাই—' বলতে বলতে থেমে যায়।

জগাকে এক পলক দেখে আবার টানুর দিকে চোখ ফেরান রঘুবীর। জিজ্ঞেস করেন, 'তোর জুড়িদার বলছে তুই নাকি খুব খেতে পারিস?'

টানু বলে, 'আপনার আশীর্বাদে তা একটু আধটু পারি।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করেন রঘুবীর। তারপর বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যদি ভবা পালকে খাওয়ার লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে পারিস, তোকে মাপ তো করে দেবোই, চাই কি একটা পুরস্কারও পাবি।'

ভবা পাল রাজানগরেরই বাসিন্দা এবং বিখ্যাত খাইয়ে। তার নাম ওই এলাকার সবাই জানে।

ঢোক গিলে টানু বলে, 'ওনার সঙ্গে কি পেরে উঠব! তবু চেষ্টা করে দেখি—'

রঘুবীর হুমকে উঠলেন, 'না পারলে কোনো কাঁদুনি শুনব না, স্রেফ বাঁশডলা। এটা মনে রাখিস। এবার আমার পা ছেড়ে ওঠ—'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় টানু। জগা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, টানুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে, 'ভবা পাল বক রাক্ষসের মতো খায়। ওর সঙ্গে সত্যি সত্যি পারবে তো টানুদা?'

টানু বলে, 'না পারলে সাজা তো কপালে আছেই। তা ভালমন্দ খেয়েই না হয় বাঁশডলাটা খাই—'

ভবা পালকে তক্ষুণি লোক পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনালেন রঘুবীর। শামিয়ানার তলায় মুখোমুখি আসনে তাকে এবং টানুকে বসিয়ে খাওয়ার কম্পিটিশন শুরু হল। গোটা বিয়েবাড়ির লোকজন তাদের গোল করে ঘিরে দাঁড়াল।

ভবা পাল প্রথমটা নাক কুঁচকে খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চোখের কোণ দিয়ে টানুকে দেখে নিল। ভবার বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ, বুকের ছাতি আটচল্লিশ, ইয়া বাইসেপ, ইয়া ট্রাইসেপ। নাকের তলায় মোমে মাজা গোঁফ। সেই তুলনায় টানু বড্ড রোগা পটকা। তার ওপর চোর। কাজেই তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার যথেষ্ট কারণ আছে। এরকম একজন বাজে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কক্ষণো সে লড়ত না। নেহাত জমিদার রঘুবীর চৌধুরীর হুকুম, সেটা তো আর অমান্য করা যায় না।

দু'জনকে খাবার দেবার জন্য তিনজনকে লাগিয়ে দিলেন রঘুবীর। তারা প্রথমে লুচি আর বেগুনভাজা নিয়ে এল। ভবা দশখানা লুচি তাই দিয়ে উড়িয়ে দিল। টানুও তাই। তারপর এল ফুলকপির তরকারি। দু'জনেই দশখানা করে খেল। এবার এল পোলাও, ইলিশ মাছ ভাজা আর রুইয়ের কালিয়া। দু'জনে পনের মিনিটের ভেতর দু'সেরের মতো খেয়ে ফেলল। তারপর একে একে এসে গেল গলদা চিংড়ির মালাইকারি, মাংসের কোর্মা, চিতলের পেটি। এসবের সঙ্গে পাহাড় প্রমাণ পোলাও তো রয়েছেই। পাতে পড়তে না পড়তেই সেসব উড়ে যেতে লাগল।

চারপাশের জনতা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই চিৎকার করে করে তারিফ করতে লাগল, 'শাবাশ—শাবাশ—'

গোড়ার দিকে যতই নাক সিটকে টানুকে অবজ্ঞা করুক, তার খাওয়ার বহর দেখে নড়েচড়ে বসে ভবা। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, একে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে না। চোখে মুখে ভয় আর অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠছিল তার। খাইয়ে হিসেবে গোটা ঢাকা জেলা জুড়ে ভবার নাম। খাওয়ার কম্পিটিশনে জিতে প্রচুর কাপ মেডেল পেয়েছে সে। একটা সিড়িঙ্গে চোরের কাছে শেষ পর্যন্ত এত বড় সম্মানটা কি খোয়াতে হবে?

লুচি পোলাও কালিয়া কোর্মার পর শুরু হল মিষ্টি। পাল্লা দিয়ে পঁচিশটা করে রাজভোগ আর সন্দেশ খাওয়ার পর একধারে এলিয়ে পড়ল ভবা। গলা পর্যন্ত তার ঠাসা। হাঁসফাঁস করতে করতে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। হাতজোড় করে রঘুবীর চৌধুরীকে চিঁচিঁ করে বলল, 'হুজুর, আমি আর পারব না। আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

অগত্যা চারজন ধরাধরি করে ভবাকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল।

এদিকে টানু তখনো পিঠ সোজা করে বসে আছে। রঘুবীর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, আর খেতে পারবি? পেটে জায়গা আছে?'

'আজ্ঞে আছে। পেছনে রান্নার জায়গায় ক্ষীরমোহন আর রাবড়ি দেখেছিলাম। সেগুলো—'

রঘুবীরের হুকুমে তক্ষুণি সে সব এসে গেল। সের দেড়েক রাবড়ি আর বাইশটা ক্ষীরমোহন সাবাড় করার পর টানু বলল, 'আজ তা হলে এই পর্যন্ত থাক। আপনি আমাদের মাপ করেছেন তো হুজুর?'

রঘুবীরের চোখের তারা কপালে উঠে গিয়েছিল। তিনি ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যা খেল দেখালি, আমার মুণ্ডু ঘুরে গেছে।'

আঁচিয়ে এসে হাত কচলাতে কচলাতে টানু বলে, 'পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন—'

টানুর খাওয়া দাওয়া দেখতে দেখতে কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন রঘুবীর, এবার তা মনে পড়ে যায়। বলেন, 'কী পুরস্কার চাস?'

'আমরা বড্ড গরিব, ভালমন্দ খেতে পাই না। এবার আপনিই বিবেচনা করুন—'

রঘুবীর কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, চুরিচামারি বন্ধ করে তুই আমার বাড়িতে এসেই থাক। খাওয়া দাওয়া সব এখানেই করবি।'

টানুর মুখ খুশিতে আলো হয়ে যায়। সে বলে, 'কিন্তু আমার একটা মা যে আছে।'

'মাকেও নিয়ে আয়।'

এবার রঘুবীরের পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জগা বলে, 'টানুদার তো হিল্লে হয়ে গেল। আমার কী হবে হুজুর?'

রঘুবীর বললেন, 'কী জ্বালা! ঠিক আছে তুইও চলে আসবি।'

এরপর রাজানগরের জমিদারবাড়িতে ভাল ভাল খাবার খেয়ে আনন্দে দিন কাটতে লাগল জগা, টানু আর মঙ্গলার। আজ সেই জমিদারবাবুরাও নেই, সেই টানুরাও নেই। সোনার দিনগুলো কবেই শেষ হয়ে গেছে।

চোর যখন গোয়েন্দা হল

অনেক কাল আগে, ইংরেজরা তখনো আমাদের বুকের ওপর বসে এদেশে রাজত্ব চালাচ্ছে। এটা সেই সময়ের গল্প।

কলকাতা থেকে দু' আড়াই শ' মাইল দূরে ঢাকা জেলার এক গ্রামে ছিল আমাদের মামাবাড়ি। গ্রামটার নাম হাজিপুর। আমার ছেলেবেলার বেশ ক'টা বছর সেখানে কেটেছে।

হাজিপুর আর তার চারপাশের আরো বাইশখানা গ্রাম নিয়ে ছিল একটিমাত্র থানা। থানাটা ছিল হাজিপুরেই।

সেবার আমাদের থানায় মাখন দারোগা বদলি হয়ে এল। গোলগাল ভালমানুষ চেহারা, মাথায় অল্প টাক। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। তার সারা গা তাবিজ কবজে বোঝাই, দু'হাতের আট আঙুলে পলা, গোমেদ, মুক্তো ইত্যাদি নানারকম পাথর বসানো আংটি।

থানার একতলা লাল রঙের বাড়িটার সামনে ছিল পেল্লায় মাঠ। বাজিতপুরে এসেই ট্যাঁড়া দিয়ে সবগুলো গাঁয়ের লোকজন সেখানে জড়ো করে ফেলল মাখন দারোগা। বলল, 'আমি জানি এই এলাকায় যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই ভদ্রলোক। তাই বলে দু'চারটে চোর-ডাকাত, ঠগ-জোচ্চোর কি আর নেই? নিশ্চয়ই আছে। তাদের কাছে আমার নিবেদন, সোনামানিকেরা, আমাকে এই বয়েসে কষ্ট দিও না। আমার হাঁটুতে, কাঁধে, মাজায়, মানে প্রায় সর্ব অঙ্গে বাত। সে যে কী যন্ত্রণা বলে বোঝাতে পারব না। দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। আর মোটে ক'বছর চাকরি আছে। তোমরা যদি ঝঞ্ঝাট কর, চাকরিটা নির্ঘাত খোয়াতে হবে। ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসব। তোমরা যদি আজকের মিটিংয়ে এসে থাক, কথা দাও আমার শেষ বয়েসটা শান্তিতে কাটাতে দেবে।'

ভিড়ের ভেতর যুধিষ্ঠির আর তার দলবলও ছিল। যুধিষ্ঠির হল এ অঞ্চলের সব চাইতে ডাকসাইটে চোর। তার হাতের কাজ অতি সূক্ষ্ম। অন্যের মালপত্র যখন সে সরায় কেউ এতটুকু টের পায় না। তার লাইনের আর যারা আছে তারা তার শাগরেদ মাত্র। আসলে যুধিষ্ঠির হল এখানকার চোরেদের রাজাধিরাজ।

যুধিষ্ঠির তার সাত অ্যাপ্রেন্টিস নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। চৌকো মুখ, বেজায় ঢ্যাঙা, বেজায় কালো, চোখ দু'টো গোল গোল, উঁচু কপাল, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। হারমোনিয়ামের রিডের মতো বড় বড় দাঁত। পরনে নীল পাজামা আর লাল ফুল শার্ট।

হাতজোড় করে মাথা হেলিয়ে হাসি হাসি মুখে যুধিষ্ঠির বলে, 'আমি কথা দিলাম স্যার, আপনার থানায় আজ থেকে অশান্তি বন্ধ।'

মাখন দারোগা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে ভাই?'

যুধিষ্ঠির তার নামটা জানিয়ে বলে, 'আমাকে এখানকার তেইশটা গাঁয়ের সবাই চেনে।'

'কী কর তুমি?'

'এই গেরস্তের বাড়তি থালাবাসন কাপড়চোপড় তুলে আমার ঘরে নিয়ে যাই। তবে মাঝে মধ্যে এট্টু আধটু ভুলচুক হয়ে যায়। আঁধারে হয়তো দু' একখানা সোনার গয়নাই নিয়ে গেলাম—এই আর কি।'

জনতা সমস্বরে এই সময় চেঁচিয়ে ওঠে, 'স্যার, যুধিষ্ঠির নাম-করা চোর।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন খানিক খানিক আঁচ করতে পারে মাখন দারোগা। হেসে হেসে যুধিষ্ঠিরকে বলে, 'ও, তাই বল। তা আমার জন্যে চুরি ছেড়ে দিচ্ছ?'

আরো নুয়ে পড়ে মাটিতে প্রায় মিশে যেতে যেতে যুধিষ্ঠির বলে, 'তাই কখনো পারি স্যার! ছেলেপুলে আছে, মা আছে, বউ আছে। হাতের কাজ ছেড়ে দিলে খাব কী?'

দুশ্চিন্তায় চুল খাড়া হয়ে যায় মাখন দারোগার। সে বলে, 'তা হলে তো আমার দিনের বিশ্রাম, রাতের ঘুমটি গেল। এখানে এসে কী বিপদে পড়লাম রে বাবা!'

তাকে ভরসা দিয়ে যুধিষ্ঠির বলে, 'আহা-হা, অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন স্যার? আপনাকে তো কথা দিয়েছি, আপনার এলেকায় একটা ঘটিও চুরি হবে না।'

পিট পিট করে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ করতে করতে মাখন দারোগা বলে, 'তবে কি অন্যের এলেকায় গিয়ে—'

নাকমুখ কুঁচকে দু'কানে হাত দিয়ে যুধিষ্ঠির বলে, 'ছি ছি ছি, পুলিশের দারোগার সামনে এ কথা কি মুখে আনতে পারি? আপনিও শুনবেন না স্যার। অন্যের এলেকায় কোথায় কী হচ্ছে তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামিয়ে লাভটা কী?'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো। যেখানে ঝামেলা হবে সেখানকার লোকজন বুঝবে। আমার তাতে কী।'

'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার, আপনার কোনো অশান্তি হবে না।'

'বাঁচালে।' বলতে বলতে আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে মাখন দারোগা, 'কিন্তু—'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'চুরিচামারি না হয় তোমরা বন্ধ রাখলে, কিন্তু ডাকাতি তো হতে পারে।'

'আপনার বরাতটা খুব ভাল স্যার। আমাদের এই তেইশখানা গাঁয়ে একটাও ডাকাত নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে এই বাবুমশায়দের জিজ্ঞেস করুন।' বলে ভিড়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় যুধিষ্ঠির।

জনতা জানিয়ে দেয়, যুধিষ্ঠির যা বলেছে তার একটা শব্দও মিথ্যে নয়।

মাখন দারোগা বলে, 'তারপরেও একটা কথা থেকে যাচ্ছে।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে, 'কী সেটা?'

'তোমরা কেউ কিছু করলে না, কিন্তু বাইরে থেকে উটকো কেউ এসে তো ঝামেলা পাকাতে পারে।'

'তা পারে।'

'তখন?'

একটু চিন্তা করে যুধিষ্ঠির বলে, 'আপনি যখন আমার ওপর এত নিভভর (নির্ভর)

করেছেন তখন আপনার দিকটা তো দেখতে হবে। কেউ অশান্তি করতে এলে আমার দলবল আর আমি তাকে ছাড়ব না।'

'পাকা কথা তো?'

'নিশ্চয়ই। দুনিয়া টলে যাবে কিন্তু আমার কথার নড়চড় হবে না স্যার'।

মাখন দারোগা হাজিপুরে আসার পর ছ'মাস কেটে গেল। যুধিষ্ঠির কথা রেখেছিল। এই এলাকার কোনও গেরস্তর বাড়ি থেকে একটা কুটোও চুরি যায়নি। মাখন দারোগা এবং তার কনস্টেবলরা পরমানন্দে দুপুরে আর রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারা গায়ে প্রচুর চর্বি জমিয়ে ফেলল।

কিন্তু একটানা শান্তি বলে কিছু নেই। ঠিক ছ'মাস বাদে এক সপ্তাহের ভেতর এ অঞ্চলে চার চারটে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাতরা চার গেরস্ত বাড়ির সাতজনকে জখম করেছে, টাকাপয়সা গয়নাগাটি বাসনকোসন জামাকাপড়, সব লুটেপুটে নিয়ে গেছে।

তার ফলটা হল এই, মাখন দারোগার প্রাণে সুখ বলে আর কিছু রইল না। খুবই দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। তার বাতের ব্যথাটা দশ গুণ চাগিয়ে উঠল।

ডাকাতির মতো এমন বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে যাবার পর কী করা উচিত যখন মাখন দারোগা ভাবছে, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের কথা মনে পড়ে গেল। সে কথা দিয়েছিল, এই এলাকায় কাউকে ঝঞ্ঝাট পাকাতে দেবে না।

তক্ষুণি যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়ে এনে মাখন দারোগা করুণ সুরে বলে, 'ডাকাতগুলো কী বজ্জাত বল দেখি! মানুষকে এমন বিপদে কেউ ফেলে? আমি এবার গেলাম।'

যুধিষ্ঠির গলার স্বরে সহানুভূতি মাখিয়ে বলে, 'অত ভেঙে পড়বেন না স্যার।'

মাখন দারোগা বলে, 'ডাকাতি করলি করলি, তা আমার এলাকায় কেন বাবা? অন্য জায়গা কি এত বড় বাংলাদেশে আর ছিল না?' একটু থেমে বলে, 'ডাকাতি যখন হয়েছে তখন ডাকাত ধরতেই হবে, নইলে এই শেষ বয়েসে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

মাথা নেড়ে যুধিষ্ঠির বলে, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

'কিন্তু আমার গাঁটে গাঁটে যে বাত তা তো তুমি জানোই। আমার কনস্টেবলগুলো আমারই মতো বেতো রুগী। তাদের সরু সরু লিকলিকে পা, জালার মতো পেট। ওরা কি পারে ডাকাত ধরতে?'

'এটা খুব ভাবনার কথা হল। ডাকাত না ধরলে আপনার মান-সম্মান যে থাকবে না।'

যুধিষ্ঠিরের দু'হাত ধরে মাখন দারোগা এবার বলে, 'তুমি কথা দিয়েছিলে আমার এখানে অশান্তি করে কেউ পার পাবে না। একটা কিছু ব্যবস্থা কর।'

যুধিষ্ঠির একটু চিন্তা করে বলে, 'তা তো করতেই হবে। ঠিক আছে, ডাকাত ধরার দায়িত্বটা আমি নিলাম। তবে আপনাকেও একটুআধটু সাহায্য করতে হবে।'

'আমাদের থানার হাল তো জানোই, খুব বেশি কিছু আশা করো না।'

যে চার বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, যুধিষ্ঠির একে একে সেসব জায়গায় গিয়ে গেরস্তদের সঙ্গে দেখা করল। নানা প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে পারল, চার বাড়ির ছেলেরাই শহরে থেকে চাকরি বাকরি বা পড়াশোনা করে।

ডাকাতরা রাত্তিরে দল বেঁধে এসে এই বাড়িগুলোতে চড়াও হয়েছিল। মাথা খাটিয়ে দারুণ একখানা কৌশল বার করেছিল তারা। প্রতিটি বাড়ির যে সব ছেলেরা বাইরে থাকে, তাদের মতো গলা করে গেরস্তদের ডেকেছে। তাই শুনে মা-বাবারা মনে করেছে, ছেলে বুঝি শহর থেকে এসেছে। যেই না দরজা খোলা অমনি রামদা, বল্লম, ছোরাছুরি নিয়ে ডাকাতরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারল, যারা ডাকাতি করেছে তারা এই গেরস্তদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে। অনেকদিন ধরে লক্ষ করে করে ছেলেদের গলার স্বর নকল করেছে।

ডাকাতিগুলো এক গ্রামে হয়নি, হয়েছিল চার গ্রামে। বাড়ির কর্তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ডাকাতির বেশ কিছুদিন আগে তারা নতুন চাকর রেখেছিল। তখন ছেলেদের গরমের ছুটি পড়েছে, শহর থেকে তারা বাড়ি এসেছে।

চাকররা বেশিদিন অবশ্য কাজ করেনি, দশ বারো দিন থেকেই হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিল।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করেছে, 'চাকরদের বয়স কত?'

চার গেরস্তই জানিয়েছে, 'চল্লিশ বেয়াল্লিশ।'

'দেখতে কেমন?'

চার বাড়ির কর্তাই এবার চেহারার যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে বোঝা গিয়েছিল, চারটে আলাদা আলাদা চাকর চার বাড়িতে কাজ করেনি, একটা লোকই পালা করে ছুটির সময়টা আট দশ দিন করে চার বাড়িতে কাজ জুটিয়ে ছেলেদের গলার স্বর নিজের গলায় তুলে নিয়েছে। লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাত দলের একজন এবং তুখোড় হরবোলা। আরো বোঝা গেল, ডাকাতি করবে বলে দলটা অনেকদিন ধরেই আটঘাট বেঁধে তৈরি হয়েছিল।

যুধিষ্ঠির চার বাড়িতে জিজ্ঞেস করেছে, 'লোকটার নাম কী?'

চার বাড়ির কর্তা চারটে নাম বলেছে। ভোলা, শিবু, হারু আর ফটিক। তার মানে নাম পালটে পালটে লোকটা চার জায়গায় কাজ করেছে। এই নামগুলো যে আসল নাম নয় সেটা ধরে ফেলতে অসুবিধা হয়নি যুধিষ্ঠিরের। সে এবার জানতে চেয়েছে, লোকটার চেহারায় এমন কিছু কি আছে যা দেখলে চট করে তাকে চেনা যেতে পারে?

চার গেরস্তই বলেছে, লোকটার ডান গালে একটা বড় সাইজের লাল জড়ুল রয়েছে। বোঝা গিয়েছিল এই জড়ুলটা নকল নয়।

এই সব খবরাখবর নেবার পর নিজের সাত শাগরেদকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসল যুধিষ্ঠির। শুধু বাজিপুর থানা এলাকারই নয়, চারপাশে যেখানে যত চোর-ডাকাত আছে তাদের সকলকে চোখে না দেখলেও তাদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তার জানা।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে, 'এই ডাকাতিগুলো কাদের কাজ বলে তোদের মনে হয়?'

তার এক নম্বর শাগরেদ হলো গণু। বয়স খুব বেশি নয়—আঠার উনিশ। রোগাপটকা, ইঁদুরের মতো পাতলা সরু মুখ, চোখ গর্তে ঢোকানো, কথা বলার সময় কণ্ঠমণিটা ঘন ঘন ওঠানামা করে। চুরিবিদ্যায় খুবই ঝানু। বললে, 'আমাদের থানার চারদিকে চারটে ডাকাতের দল রয়েছে। পুবদিকে রঘু মল্লিকের দল, পশ্চিমে জালাল শেখের দল, দক্ষিণে মোতি সর্দার

আর উত্তরে জগা ঘোষের দল। এদের মধ্যে যে দলে লাল জড়ুলওলা লোকটা রয়েছে, ডাকাতিগুলো তাদেরই কাজ।'

গণু যে খুবই চালাক চতুর সেটা বরাবরই জানতো যুধিষ্ঠির, কিন্তু তার মাথায় এত বুদ্ধি রয়েছে তা ভাবতে পারেনি। তারিফ করার ভঙ্গিতে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'শাবাশ গণু, ঠিক বলেছিস। জড়ুলওলার খোঁজ পেলেই বুঝতে পারব এগুলো কাদের কাজ।'

এর পর শাগরেদদের চারদিকে চার ডাকাত দলের, বিশেষ করে সেই জড়ুলওলার সন্ধান আনার জন্য পাঠিয়ে দেয় যুধিষ্ঠির। বার বার তাদের হুঁশিয়ার করে বলে, 'খুব সাবধান। ওরা টের পেলে ঘাড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দেবে।'

যুধিষ্ঠিরের সাত শাগরেদের চারজন —নগা, হরু, ফকির আর বুধাই গিয়েছিল পুবে এবং পশ্চিমে। দু'দিন পর তারা এসে জানালো, রঘু মল্লিক আর জালাল শেখের দল এ তল্লাটে নেই। মাসখানেক আগে তারা অনেক দূরে আলাদা আলাদা জায়গায় ডাকাতি করতে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

যুধিষ্ঠিরের বাকি তিন শাগরেদের দু'জন—মদন আর পানু গিয়েছিল দক্ষিণে। দিন চারেক পর ওরা এসে খবর দিল মোতি সর্দারের দলটা কোথাও যায়নি, তাদের ঘাঁটিতেই রয়েছে। তবে এই দলে জড়ুলওলা কেউ নেই।

মোক্ষম খবরটা এল দিন সাতেক বাদে। গণু গিয়েছিল উত্তরে। সে এসে যা বলল তা এইরকম।

উত্তর দিকে হাজিপুর থানার এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে, তার ঠিক পরেই একটা মরা নদী। নদীটা অনেকদিন আগেই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। তার এধারে ছোটখাট একটা বাজার, তার নাম মীরপুর। বাজারের ওধার থেকে শুরু হয়েছে ঘোর জঙ্গল।

ঘুরতে ঘুরতে গণু ওই বাজারে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। কানাঘুষো শুনে তার মনে হয়েছিল, নদীর ওপারে জঙ্গলের ভেতরে কোথাও রয়েছে জগা ডাকাতের ঘাঁটি।

উটকো লোক দেখে যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে তাই সকালবেলা এক ঝোড়া আনাজ নিয়ে গিয়ে বাজারে বসত গণু। সারাদিন সেখানে বেচাকেনা করত ঠিকই, আসলে একজোড়া সতর্ক চোখ মেলে চারপাশের লোকজনের ওপর নজর রাখত। ডাকাত হলেও খেতে তো হবে। চাল ডাল মাছ মাংস কেনার জন্য জঙ্গল থেকে না বেরিয়ে উপায় নেই।

কিন্তু জঙ্গলের দিক থেকে মরা নদী পার হয়ে কাউকেই আসতে দেখেনি গণু। দিন দুয়েক কাটার পর যখন তার মনে হল কোনো আশাই নেই তখন হঠাৎ এক খাবারের দোকানে একটা লোককে দেখে তাক লেগে গেল তার। লোকটা কুকুর বেড়াল গাধা শিয়াল—নানারকম পশুপাখির গলা নকল করে শোনাচ্ছে। তাকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে যায়। আনাজের ঝোড়া ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে গণু। কিন্তু লোকটার মুখ ঘন দাড়িগোঁফে বোঝাই। তার ভেতর জড়ুল আছে কিনা বোঝা গেল না।

রীতিমতো ধন্দে পড়ে যায় গণু। এ লোকটা ডাকাত দলের নাও হতে পারে। পৃথিবীতে হরবোলা একটাই আছে নাকি ? তা ছাড়া, মাত্র কিছুদিন আগে চার বাড়িতে কাজ করে গেছে সে। তখন গালটাল কামানো ছিল। এর ভেতর এক হাত লম্বা দাড়ি গজানো সম্ভব নয়।

লোকটা মজাদার ভঙ্গি করে একেকটা পশু বা পাখির ডাক ডাকে আর চারপাশে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

জনতাকে প্রচুর আনন্দ দিয়ে পেল্লায় হাঁড়ি বোঝাই রসগোল্লা কিনে একসময় উঠে পড়ে সে।

লোকটা কিন্তু নদীর ধারে গেল না, উলটোদিকে হাঁটা দিল। গণুর মনে যে সন্দেহটুকু দেখা দিয়েছিল তা পলকে উবে যায়। নাঃ, লোকটা জগা ঘোষের দলের সেই হরবোলা হতেই পারে না। তবু কী ভেবে খাবারওলাকে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা তো চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। কে ও? কোথায় থাকে?'

খাবারওলা জানায়, ওর নাম হরেন, কোথায় থাকে তার জানা নেই। তবে একদিন পর পর তার দোকান থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে নিয়ে যায়।

একটু চিন্তা করে গণু জিজ্ঞেস করে, 'হরেন কি মানুষের গলা নকল করতে পারে?'

'কেন পারবে না? কারুর গলা একবার শুনলে তক্ষুণি তা শুনিয়ে দিতে পারে।'

'এদিকে আর কোনো হরবোলা আছে?'

'না। ওই একজনই। তা তোমার এত খোঁজে দরকার কী? যাও, এখন বিকিকিনির সময় অত বকবক করতে পারব না।'

গণু আর দাঁড়ায় না। ওখান থেকে সোজা চলে আসে তার গুরু যুধিষ্ঠিরের কাছে। সব জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী করব বল?'

চোখ বুজে থুম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকে যুধিষ্ঠির। তারপর গণুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় ওই হরেন ব্যাটাই জগা ঘোষের দলের লোক, চাকর সেজে চার বাড়িতে কাজ করে গেছে।'

'কিন্তু দাড়ি?'

গণু কী বলতে চায়, বুঝতে পারছিল যুধিষ্ঠির। বলে, 'আরে বাবা, ওটা নকল। যাত্রাদলে কীভাবে লোকে মুনিঋষি সাজে জানিস না?'

চোখে মুখে ঝিলিক খেলে যায় গণুর। সে বলে, 'আরে তাই তো, হরেনটা গালে দাড়ি লাগিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছে। তবে—'

'কী?'

'ও কিন্তু নদীর ওধারে জঙ্গলের দিকে যায়নি।'

'সেইখানেই খটকা লাগছে। ভাল করে ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে, 'একদিন পরপর হরেন রসগোল্লা কিনতে আসে, তাই না?'

গণু বলে, 'হ্যাঁ। আবার পরশু আসবে।'

'ঠিক আছে, তোর সঙ্গে পরশু ভোরে মীরপুরের বাজারে যাব।'

একদিন পর মীরপুরে এসে খাবারের দোকান থেকে খানিক দূরে একটা ঝাঁকড়া জামরুল গাছের তলায় বসল যুধিষ্ঠির আর গণু। তাদের চোখ দোকানটার দিকে।

দুপুরবেলায় হেলেদুলে হরেন এসে হাজির। তাকে দেখেই ভিড় জমে গেল। সবাই

হৈচৈ বাধিয়ে সমানে বলতে লাগল, 'ও হরেনদাদা, গাধার ডাক শোনাও।' বা 'আজ বাঘের ডাক শোনাতে হবে।' প্রত্যেকে একেকটি পশু বা পাখির নাম করতে লাগল।

দোকানের সামনে বাঁশের লম্বা বেঞ্চ। সেটার ওপর জাঁকিয়ে বসতে বসতে হেসে হেসে হরেন বলে, 'হবে হবে।' তারপর একে একে সবার আবদার মেটাতে থাকে।

জামরুল তলা থেকে যুধিষ্ঠির আর গণু গুটি গুটি উঠে এসে হরেনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। যুধিষ্ঠির একদৃষ্টে হরেনকে লক্ষ করতে থাকে। সে যা ভেবেছিল তাই, লোকটার দাড়ি আসল নয়।

জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে ডাকতে বেলা হেলে যায়। তখন তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হরেন বলে, 'আজ আর নয়। এবার আমাকে ফিরতে হবে।' হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা কিনে হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বাজারের ভেতর চলে আসে সে, সেখান থেকে কেনে এক পেল্লায় কাতলা মাছ। তারপর নদীর উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করে।

যুধিষ্ঠির আর গণু জোঁকের মতো পেছনে লেগে থাকে। বাজারটা ছাড়ালেই কাঁচা রাস্তার দু'ধারে উঁচু উঁচু গাছ। এর জন্য সুবিধাই হল যুধিষ্ঠিরদের। গাছের আড়ালে আড়ালে থেকে হরেনের ওপর নজর রাখতে পারল।

হরেন বেশ ঝানু লোক। খানিকটা যায় আর পেছন ফিরে তাকায়। কেউ পিছু নিয়েছে বলে হয়তো তার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরা গাছের পেছনে থাকায় তাদের দেখতে পায় না।

মাইলখানেক এভাবে চলার পর মরা নদীটা যেখানে ধনুকের মতো বেঁকে দক্ষিণে ঘুরে গেছে সেখানে এসে চারপাশ ভাল করে দেখে নেয় হরেন। তারপর টুক করে নদী পেরিয়ে ওপারের জঙ্গলের দিকে পা বাড়ায়।

যুধিষ্ঠির আর গণু একটা ঝাঁকড়া বটগাছের পেছনে দাঁড়িয়ে হরেনকে লক্ষ করছিল। তারা বুঝতে পারছিল, লোকজনকে ধোঁকা দেবার জন্য বাজারের উলটো দিকে নদী পেরোয় না হরেন, এক মাইল ঘুরে এই নিরালা জায়গায় এসে পার হয়।

হরেন জঙ্গলে ঢুকে গেলে যুধিষ্ঠির আর গণু দৌড়ে নদী পেরুল। চটপট তারাও জঙ্গলের ভেতর চলে আসে। এখানে প্রচুর ঝোপঝাড়, গাছপালাও খুব ঘন। তবে একটা অসুবিধা, মাটিতে যতদূর চোখ যায়, আধ হাত পুরু শুকনো পাতা পড়ে আছে। পা ফেললেই মচমচ আওয়াজ হয়।

হরেন বেশিদূর যায়নি। ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছের পেছন থেকে তার ওপর লক্ষ রাখতে রাখতে খুব সতর্কভাবে পা টিপে টিপে এগোয় যুধিষ্ঠির আর গণু।

শুকনো পাতায় নিজের পায়ের শব্দ তো হচ্ছিলই, আরো দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ কানে আসতে থমকে দাঁড়ায় হরেন। এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। সে থামতেই যুধিষ্ঠিররা একটা বড় ঝোপের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হরেন কাউকে দেখতে না পেয়ে বিড়বিড় করে, 'নিশ্চয়ই শেয়াল কি খরগোশটোশ হবে। এই জঙ্গলে কে আর মরতে আসবে?' তারপর বলে, 'নাঃ, গাল দু'টো বড্ড কুটকুট করছে।' বলতে বলতে এক টানে দাড়িটা খুলে ফেলে আর তখনই ডান গালের লাল জড়ুলটা বেরিয়ে পড়ে।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির গণুর দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। অর্থাৎ আসল লোক চিনতে তার ভুল হয়নি।

হরেনের এক হাতে এখন রসগোল্লার হাঁড়ি আর দাড়ি, অন্য হাতে কাতলা মাছ। সে আবার চলতে শুরু করে। কাজেই যুধিষ্ঠিররাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর হরেন যেখানে এসে থামে, সেখানে গাছপালা কেটে বেশ খানিকটা জায়গা সাফ করে পনেরো কুড়িটা টিনের ঘর তোলা হয়েছে।

একশ'গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়ির পেছন থেকে যুধিষ্ঠির আর গণু কালো কুচকুচে তাগড়াই চেহারার কুড়ি বাইশটা লোককে ওখানে দেখতে পায়। ক'জন বসে বসে গল্প করছে। ক'জন মালকোঁচা মেরে লাঠি খেলছে। ক'জন রামদা আর খাঁড়ায় শান দিচ্ছে। এদের ভেতর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে জোয়ান যে লোকটা সে বসে আছে একটা খাটিয়ায়। তার গোঁফ দু'দিকে তিনবার পাক খেয়ে ঝুলে পড়েছে। কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরি চুল। বুকটা কম করে পঞ্চাশ ইঞ্চি। কপালে গোলা সিঁদুরের মস্ত টিপ, চোখ দু'টো লাল টকটকে। সে-ই যে দলের সর্দার জগা ঘোষ, তা বলে না দিলেও চলে।

যুধিষ্ঠির গণুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে, 'ব্যাটাদের আস্তানাটা দেখে গেলাম। চল এবার ফিরে যাই।'

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা দু'জনে হাজিপুর থানায় চলে আসে। ওদের দেখে মাখন দারোগা প্রায় লাফিয়ে উঠে নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'সাত আট দিন ধরে তোমাদের পাত্তা নেই। কোথায় ছিলে তোমরা? ডাকাত ধরার কী হল? জানো, ওপর থেকে বড় কর্তারা তাড়া দিয়ে আমার জান বার করে দিচ্ছে!'

মাখন দারোগার সরু গলার চিৎকার আর থামতেই চায় না। অনেক কষ্টে তাকে চুপ করিয়ে যুধিষ্ঠির বলে, 'ডাকাতদের ঘাঁটি খুঁজে বার করেছি স্যার।'

'বার করেছ তো ধরনি কেন?' মাখন আবার হইচই জুড়ে দেয়।

'স্যার, চোর হয়ে ডাকাত ধরা কি সম্ভব? লোকে শুনলে বলবে কী? তা ছাড়া, কাছে ঘেঁষলে রামদা দিয়ে ঘাড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দেবে না?'

'তা হলে উপায়?'

'ওদের আপনাকেই ধরতে হবে।'

মাখন দারোগা আঁতকে ওঠে। বলে, 'জানো আমি কত দুর্বল লোক! ডেঙ্গুতে মর মর হয়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর গেঁটে বাত, বুক ধড়ফড়ানি। ডাকাত ধরতে গেলে আমি কি আর বাঁচব?'

যুধিষ্ঠির বলে, 'বাঁচবেন, বাঁচবেন। একবার চেষ্টা করে দেখুন না—'

অনেক টানাহ্যাঁচড়ার পর শেষ পর্যন্ত রাজি হল মাখন দারোগা। কীভাবে জগা ঘোষের দলটাকে ধরা হবে তার একটা ছক কষে দিল যুধিষ্ঠির। হাজিপুর তো বটেই, চারপাশের যত থানা আছে, সব জায়গা থেকে বন্দুকওলা কনস্টেবলদের নিয়ে জঙ্গল ঘেরাও করা হবে। ডাকাতরা যদি ধরা দিতে না চায়, চারদিক থেকে সমানে গুলি চালানো হবে।

দিন দুই বাদে যুধিষ্ঠিরের ছক অনুযায়ী দু'শ' কনস্টেবল জঙ্গল ঘেরাও করল।

তাদের কমান্ডার-ইন-চিফ হয়ে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিল মাখন দারোগা। তবে সে সামনের দিকে থাকেনি, কনস্টেবলদের তিন শ' গজ পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল। একটু বেগতিক দেখলেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে থানার দিকে চম্পট দেবে। পালাতে অবশ্য তাকে হয়নি। কেননা রামদা বা লাঠি দিয়ে তো বন্দুকের সঙ্গে লড়া যায় না। তাই ডাকাতেরা একে একে ধরা দিয়েছিল।

জগা ঘোষের দলটাকে ধরার ফলে মাখন দারোগার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঠিক করলে তাকে বিরাট কিছু পুরস্কার দেবে।

মাসখানেক পর হাজিপুর থানার সামনে মস্ত প্যান্ডেল খাটানো হল। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে তার আগেই চারপাশের লোকজনকে জানানো হয়েছে, পরের রবিবার যেন সবাই প্যান্ডেলে জড়ো হয়। মাখন দারোগাকে সেখানে পুরস্কার দেওয়া হবে।

রবিবার দুপুর থেকে হাজিপুর তো বটেই, দূর দূর থেকে লোকজন এসে প্যান্ডেল ভরে ফেলল। বিকেলবেলা ঢাকা থেকে এলেন পুলিশের কর্তারা।

সবচেয়ে বড়কর্তা অর্থাৎ আই জি হলেন একজন ইংরেজ। তিনি চুটিয়ে মাখন দারোগার প্রশংসা করলেন। এমন সাহসী, দায়িত্বশীল দারোগা নাকি আজকাল দেখা যায় না। জগা ডাকাতের দলটাকে ধরে সে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে। এ ধরনের ভাল ভাল কথা বলে মাখনের গলায় ইয়া বড় একখানা সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে প্যান্ডেল ফেটে পড়তে লাগল।

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল মাখন দারোগা। প্যান্ডেলের মাঝখানে ভিড়ের ভেতর শাগরেদদের নিয়ে বসে ছিল যুধিষ্ঠির। মাখন তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে আই জি'র সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। তারপর নিজের গলা থেকে মেডেলটা খুলে তার গলায় পরিয়ে দিল।

হাততালি থামিয়ে দর্শকরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পুলিশের কর্তারাও কম অবাক হননি। আই জি মাখন দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী হল?'

মাখন সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে বলে, 'স্যার, এবার বলুন মেডেলটা যুধিষ্ঠিরের পাওয়া উচিত কিনা?'

আই জি খুব খুশি হয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' বলে আস্তে আস্তে হাততালি দিতে লাগলেন।

তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্যান্ডেলে নতুন করে যে হাততালি শুরু হল তা আর সহজে থামল না।

এক দারোগা, এক চোর

ষাট বছর আগের কথা।

ননী দারোগা সেবার আমাদের থানায় বদলি হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একেবারে সাড়া পড়ে গেল।

ননী চাটুজ্জের মতো এমন দুর্ধর্ষ দুঁদে দারোগা তখনকার দিনে ভূ-ভারতে আর একটিও ছিল না। সেটা ইংরেজ আমল। শোনা যায়, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তার নাম নাকি খাস বিলেতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নামটি ননী হলে কি হবে, মানুষটি কিন্তু দুর্দান্ত। সে যখন যে থানায় বদলি হয়ে যেত, সেখানকার যত চোর-ডাকাত-খুনে তার ত্রিসীমানায় থাকত না, বাক্স-বিছানা মাথায় চাপিয়ে রাতারাতি উধাও হয়ে যেত। যারা পালাতে পারত না তারা চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে বোষ্টমদের আখড়ায় গিয়ে দিনরাত 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' গাইত আর খিচুড়ি-মালপো খেত।

চেহারাখানা ননী দারোগার ছিল দেখার-মতো। বিরাট ঘেরওলা খাকি হাফ প্যান্টের তলা দিয়ে লিকলিকে দু'খানা কালো ঠ্যাং নেমে এসেছে। কোমর থেকে ওপরের দিকটা পেল্লায়। আড়াই-মণী জালার মতো প্রকাণ্ড পেট। ঘাড় বলতে কিচ্ছু নেই, বিরাট মাথার পেছন দিকটা চ্যাপ্টা। এমন করে সে চুল ছাঁটত যে চারপাশের চামড়া বেরিয়ে পড়ত, শুধু মাথার মধ্যিখানে একগোছা চুল খাড়া খাড়া আলপিনের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। গোঁফ দু'টো ছিল বিশাল আর তার আগা মোম দিয়ে মাজা। গোল গোল চোখ সারাক্ষণ বনবন করে ঘুরছে। কার মাথায় কী ফন্দি গজাচ্ছে, একবার দেখলেই টের পেয়ে যায় সে। তার চোখে ধুলো দিয়ে কারো কিছু করার উপায় নেই। কেউ কোনো খারাপ মতলব আঁটলে তক্ষুণি ক্যাঁক করে তার টুঁটি টিপে ধরত ননী দারোগা।

গলার আওয়াজ শুনলে মনে হবে একসঙ্গে দশটা বাজ পড়ছে। সে একবার হাঁকার দিলে সিকি মাইল দূর থেকে শোনা যেত।

থানাটা ছিল আমাদের গ্রাম বাজিতপুরে। বাজিতপুরকে মাঝখানে রেখে চারপাশে ছোট-বড় আরো পঁচিশখানা গ্রাম। এতগুলো গ্রামের জন্য ওই একটাই থানা।

ননী দারোগার বদলি হয়ে আসার খবরটা অনেক আগেই রটে গিয়েছিল। সবাই দারুণ খুশি। কোথাও দু-চারজন জড়ো হলেই এক কথা, 'যাক, অ্যাদ্দিনে কানাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।'

ননী দারোগা যদি বাঘা তেঁতুল হয়, কানাইও বুনো ওল। সে একজন বিখ্যাত চোর। তার হাতের কাজ একেবারে ম্যাজিসিয়ানের মতো। কখন কিভাবে সে কার ঘরে সিঁদ কাটবে, কার টাকাকড়ি আর দামী দামী গয়না লোপাট করে দেবে, কেউ টের পায় না। ননী দারোগার মতো বিলেত পর্যন্ত তার নাম হয়তো ছড়ায়নি, তবে হিল্লি দিল্লি পাঞ্জাব পেশোয়ার বম্বে মাদ্রাজে তখনকার দিনে তার কীর্তির কথা কে আর না শুনেছে! সারা ভারতের চোরেদের মধ্যে কানাই ছিল রাজচক্রবর্তী। তার নাম শোনামাত্র অন্য চোরেরা মাথা নিচু করে দশ বার স্যালুট দিত।

কানাইয়ের কথা পরে বলা যাবে। ননী দারোগার ব্যাপারটা আগে শেষ করে নেওয়া যাক। সে যেদিন আমাদের থানায় এল সেদিনটার কথা পরিষ্কার মনে আছে। সেটা যেন দুর্গাপুজোর মতো একটা ঘটনা।

ননী দারোগা এসেছিল পুলিশের ফুল ড্রেসে, একটা তাগড়াই ঘোড়ায় চেপে। তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা এসেছিল পাল্কি চড়ে, তার ঘোড়ার পেছন পেছন।

আমাদের বাজিতপুরের লোকজন তো বটেই, চারপাশের পঁচিশখানা গ্রামের অর্ধেক মানুষ তিন মাইল এগিয়ে শোভাযাত্রা করে তাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল। তখন গাঁয়ে ব্যান্ডপার্টি আর কোথায় পাওয়া যাবে, তাই দশজন ঢাকী আর দশজন কাঁসি-বাজিয়ে যোগাড় করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা সবার আগে লাইন দিয়ে বাজাতে বাজাতে আসবে। এইভাবে ননী দারোগাকে বীরের সম্মান দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

থানাটা ছিল বাজিতপুরের দক্ষিণ কোণে, টালির চালের পেল্লায় একখানা একতলা পাকা বাড়িতে। তার গায়ে টালির চালের আরেকটা দোতলা বাড়ি ছিল। সেটা দারোগার কোয়ার্টার। এই দু'খানা ছাড়া ছাব্বিশটা গ্রামে আর কোনো পাকা বাড়ি ছিল না। বাকি সবই চেরা বাঁশ বা কাঠের বাড়ি, মাথায় টিনের চাল।

থানায় পৌঁছে, অনেক কসরত করে ঘোড়া থেকে নিচে নেমে বাজখাঁই গলায় ননী দারোগা হেঁকে উঠেছিল, 'আপনারা তিন মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে এতখানি যত্ন করে আমাদের যে নিয়ে এলেন সেজন্য খুব খুশি হয়েছি। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।' একটু থেমে, দম নিয়ে ফের শুরু করেছে, 'ছেলেবেলায় আমি একবার আমার মামার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। বাজিতপুর হাইস্কুলের সামনে একটা বড় ফুটবল খেলার মাঠ ছিল। সেটা এখনও আছে কি?'

জনতা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে উত্তর দেয়, 'আছে।'

'কালকের দিন রেস্ট নেব। পরশু ফুটবল খেলার মাঠে আমি একটা মিটিং ডাকব। আমরা অনেকটা রাস্তা এসেছি, ধকলে ভীষণ ক্লান্ত, আপনারাও ক্লান্ত। এখন যে যার বাড়ি চলে যান। শুধু ঢাকীরা থেকে যাক। তাদের সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

থানা ফাঁকা করে লোকজন চলে যায়। এবার ঢাকীদের উদ্দেশে ননী দারোগা বলে, 'তোমরা চারপাশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্যাঁড়া দিয়ে আজ থেকেই জানিয়ে দাও, পরশু ফুটবল খেলার মাঠে মিটিং হবে। সবাই যেন বিকেল চারটের সময় হাজির থাকে।'

'আচ্ছা হুজুর।'

ঢাকীরা মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে ননী দারোগাকে প্রণাম করে চলে যায়।

আজ ফুটবল খেলার মাঠে মিটিং। দুপুর থেকেই ছাব্বিশখানা গ্রামের মানুষ কাতারে কাতারে এসে সেখানে জড়ো হতে থাকে। এমনকি থুত্থুড়ে বুড়োবুড়ি, কাচ্চাবাচ্চারাও চলে এসেছে।

কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় মিটিং শুরু হল।

এখনকার মতো পঞ্চাশ বছর আগে মাইক-টাইক ছিল না। বিশেষ করে গ্রামের দিকে। অবশ্য ননী দারোগার গলার এমন জোর যে মাইকের দরকারই হতো না। কুড়ি হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় সে বলতে লাগল, 'আপনারা হয়তো শুনেছেন, আমি হলাম চোর-ডাকাতের যম। আমি যে থানায় যাই সেখান থেকে বদ লোকেরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে যায়। পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, কোনোরকম বদমাইশি, চুরি জোচ্চুরি, জালিয়াতি আমার এখানে চলবে না। দুষ্ট লোকেদের দমন আর ভাল লোকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আশা করি, আমার বদলি হয়ে আসার কথা শুনে এখানকার চোর-ডাকাত-খুনেরা ভেগে পড়েছে। আপনারা রাত্তিরে দরজা-জানালা খুলে ঘুমোবেন। কেউ একটা কুটোতে হাত দিতে সাহস করবে না। সেকালের পবিত্র আশ্রমের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই—'

এই সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা বোকাসোকা ভালমানুষ গোছের লোক উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে বলে, 'হুজুর—'

বক্তৃতাটা সবে তোড়ে বেরুতে শুরু করেছিল। বাধা পড়ায় বেজায় চটে যায় ননী দারোগা। ভুরু কুঁচকে হুঙ্কার ছাড়ে, 'কী ব্যাপার?'

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'হুজুর, আপনার নাম শুনে সব চোর-জোচ্চোর পালিয়ে গেছে, শুধু একজন বাদে।'

রাগে মুখ গন গন করতে থাকে ননী দারোগার। কাঁকড়া বিছের লেজের মতো গোঁফ দু'টো টুক টুক করে নড়তে থাকে। সে বলে, 'বটে! সেই একজনটা কে?'

'আজ্ঞে কানাই।'

'কানাই? তা তিনি কী করেন?'

ভিড়ের ভেতর থেকে আর একটা রোগা পটকা লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ্ঞে হুজুর, কানাই একজন নাম-করা চোর। সারা পৃথিবীর লোক তার নাম জানে।'

রোগা লোকটার-দিকে তাকিয়ে ননী দারোগা চোখ ছোট করে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলে, 'কানাই! ফেমাস চোর! হুঁ, নামটা শুনেছি শুনেছি মনে হচ্ছে। তা তিনি এখন কোথায়?'

কেউ জবাব দেবার আগেই ভিড়ের আরেক মাথা থেকে একটা সিড়িঙ্গে, ঢ্যাঙা চেহারার লোক উঠে দাঁড়ায়। হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'পেন্নাম হুজুর, আমিই কানাই। আপনার 'মিটিন' শুনতে এসেছি।'

কানাইয়ের মুখ বোতলের মতো লম্বা। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। বড় বড় গাবের

দানার মতো দাঁত। তোবড়ানো গাল। ঠোঁটে মিচকে হাসি। দেখেই টের পাওয়া যায়, লোকটা ভীষণ ধূর্ত।

কানাইয়ের পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তেরছা চোখে একবার দেখে নিয়ে ননী দারোগা বলে, 'তুমিই তা হলে সেই মহাপুরুষ!'

কানাই আওয়াজ না করে হাসে। ফের মাথা ঝুঁকিয়ে পরক্ষণেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ে।

ননী দারোগার চোখ বন বন করে ঘুরছিল। সে বলে, 'ব্যাপারখানা কী? চোর-বাটপাড়েরা সবাই ভাগল আর তুমি রয়ে গেলে যে! আমার নাম শোনো নি? আমি কেমন জাঁদরেল দারোগা, জানো না?'

কানাই ফের মাটিতে মিশে যেতে যেতে বলে, 'হুজুর, আপনার নাম শোনেনি এমন লোক এখনও জন্মায়নি। তবু পালাতে পারলাম না।'

ননী দারোগা হুমকে ওঠে, 'কেন?'

'আজ্ঞে, এত কাল আপনার নামই শুনেছি, চোখে দেখার সৌভাগ্যি হয়নি। আপনাকে দেখে পেন্নাম করব, সেই জন্যে থেকে গেলাম। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আপনি আবার রেগে যাবেন না তো?'

'আগে তোমার কথা শুনি। তারপর রাগব, না কোলে বসিয়ে ক্ষীর খাওয়াব, সেটা ভাবা যাবে। এখন বলে ফেল।'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে কানাই বলে, 'ভগমান পরের মাল সরাবার জন্যে আমাকে পিথিবীতে পাঠিয়েছে। সেটি না করলে অধম্ম হয়, তেনাকে ঘোর অমান্যি করা হয়। সেটি তো করতে পারি না। এখেন থেকে পালিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে ঘোঁতঘাঁত বুঝে কাজ শুরু করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তদ্দিন খাব কী? রোজগার বন্ধ হলে উপোস দিয়ে মরতে হবে।'

গোঁফ আরো জোরে জোরে নড়তে থাকে ননী দারোগার। হুমকে ওঠে সে, 'তার মানে চুরিটি তুমি চালিয়ে যাবে? আর সেটা আমার এই থানার ভেতরে থেকেই?'

'আজ্ঞে হুজুর, ওই যে বললাম, ভগমান যাকে যে কাজ করার জন্যে পাঠিয়েছে তাকে তো সেটি করতেই হবে।'

'বুকের পাটা আছে তোমার।'

কানাই উত্তর দেয় না। মাটির দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ননী দারোগা বলে, 'জানো, তোমাকে আমি মাসের পর মাস হাজতে পুরে রাখতে পারি?'

তক্ষুণি ঘাড় কাত করে সায় দেয় কানাই, 'একশ' বার পারেন হুজুর।'

'তোমাকে নানা কেসে ঝুলিয়ে দিয়ে জেল খাটাতে পারি?'

'পারেন হুজুর। আপনি এখানকার মা-বাপ। লাঠির বাড়ি মেরে আমার মাথা দু'ফাঁক করে দিতে পারেন, গুলি করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে!' বাঘাটে গলায় গর্জে ওঠে ননী দারোগা।

নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে কানাই বলে, 'হুজুর, আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি দেব আমি! এত সাহস আমার হতে পারে!'

একটু চুপচাপ।

তারপর কী সব চিন্তা করে হঠাৎ ননী দারোগা বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, তোমাকে এমনি এমনি হাজতে পুরব না, জেলে পাঠাবার ব্যবস্থাও করব না। তুমি এখানেই থাকো। সাত দিন সময় দিলাম। এর ভেতর তুমি যে একজন দুর্দান্ত চোর তা প্রমাণ করতে হবে। যদি এখানকার ছাব্বিশটা গ্রামের কারুর বাড়ি থেকে একটা ঘটিও চুরি করতে পার, বুঝব তোমার মতো ওস্তাদ একজনও নেই। না পারলে কিন্তু মাথা ন্যাড়া করে, দুই গালে চুনকালি লাগিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে ছাব্বিশখানা গ্রাম ঘোরানো হবে। তারপর—'

'তারপর কী হুজুর?'

'থানায় নিয়ে গিয়ে বুকে বাঁশ পিঠে বাঁশ দিয়ে এমন ডলা দেব যে হাড়-মাংস পাউডার হয়ে যাবে। কী, রাজি?'

হাত কচলাতে কচলাতে মিনমিনে গলায় কানাই বলে, 'হুজুর যখন সাত দিন সময় দিতে চেয়েছেন তখন চেষ্টা করেই দেখি।'

ননী দারোগা ভেবেছিল, বাঁশ ডলার কথায় পিছিয়ে যাবে কানাই। কিন্তু যখন বুঝল, সে একেবারেই ভয় পায়নি, উলটে তার চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে তখন বেজায় চটে যায়। হুঙ্কার ছেড়ে বলে, 'ঠিক আছে।'

ঘাড় নুইয়ে কানাই এবার বলে, 'হুজুর, আরেকটা কথা আছে।'

'আবার কী?'

'যদি আপনার আশীব্বাদে কিছু হাতাতে পারি তখন কী হবে?'

কানাই যে এরকম একটা বিদঘুটে প্রশ্ন করে বসবে, ভাবতে পারেনি ননী দারোগা। চোখ দু'টো গোল করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'তুমি বুঝি প্রাইজ-ট্রাইজ চাইছ?'

দাঁত বার করে হাসে কানাই, মুখে কিছু বলে না।

ননী দারোগা তার গোঁফের ডগা দু'টো চুমরে চুমরে সরু করতে করতে বলে, 'ঠিক আছে, কাল থেকে সাত দিন পর এই খেলার মাঠে মিটিং ডেকে তোমাকে একখানা সোনার মেডেল দেব।'

কানাইয়ের মুখ হাসিতে আলো হয়ে যায়। চোখ দু'টো চকচক করতে থাকে। সে বলে, 'পাকা কথা তো হুজুর?'

ননী দারোগা গর্জে ওঠে, 'আমার কথার নড়চড় হয় না। ননী দারোগার বাত, হাতিকা দাঁত। তা হলে কাল থেকে তোমার কাজ শুরু করে দাও। আর আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করি।'

কানাই উত্তর দেয় না, চোখ কুঁচকে হাসতে থাকে।

কানাইকে ছেড়ে দিয়ে ননী দারোগা এবার অন্য লোকজনের দিকে তাকায়। বলে,

'কানাইয়ের সঙ্গে আমার কী কথা হল, আপনারা সব শুনলেন। কাল থেকে সাত রাত ঘুমোবেন না। প্রতিটি গ্রামে ডিফেন্স পার্টি তৈরি করে রাত্তিরে পাহারা দেবেন। থানা থেকে টর্চ দেবার ব্যবস্থা করছি। গ্রামের চারদিকে মশাল জ্বেলে রাখবেন। শুধু রাত্তিরে না, দিনের বেলাতেও সবাই হুঁশিয়ার থাকবেন। পুলিশরা প্রতিটি গ্রামে টহল দিয়ে বেড়াবে। তা ছাড়া, আমি নিজে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে ঘুরে নজর রাখব। দেখব, বাছাধন কী করে পরের জিনিস হাতায়।' বলে চোখের কোণ দিয়ে কানাইকে দেখতে থাকে।

কানাই ভক্তিতে নুয়ে পড়তে পড়তে বলে, 'হুজুর, যা সব বন্দোবস্ত করলেন তাতে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।'

ননী দারোগা গম্ভীর চালে বলে, 'কী হল, সব শুনে ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

'ভয় একটু আধটু হচ্ছে ঠিকই। তবে—' বলতে বলতে থেমে যায় কানাই।

ননী দারোগার কেমন যেন খটকা লাগে। হাঁকার দিয়ে বলে, 'তবেটা আবার কী?'

'আপনি যখন দয়া করে হাতের কাজ দেখাবার সুযোগ দিয়েছেন তখন কিছু কি আর করতে পারব না? মা তস্করেশ্বরীর নাম নিয়ে নেমে যাই। পারলে মেডেল, নইলে কপালে বাঁশ-ডলা তো আছেই। দিন, একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।' কানাই এগিয়ে গিয়ে ননী দারোগার বুট থেকে এক খাবলা ধুলো নিয়ে মাথায় আর জিভে ঠেকায়।

পরদিন থেকে একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড। প্রতিটি গ্রামে চারটে করে ডিফেন্স পার্টি তৈরি হয়ে গেল। এক একটা পার্টিকে দু'টো করে পাঁচ ব্যাটারির ঢাউস টর্চ দেওয়া হল থানা থেকে।

ছাব্বিশখানা গ্রামে বিশ-বাইশ হাজার লোকের খাওয়া নেই, ঘুম নেই। দিনরাত চোখ টান করে তারা পাহারা দিচ্ছে। বন্দুক কাঁধে ফেলে পুলিশরা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে হানা দিয়ে চলেছে। সবার ওপরে রয়েছে ননী দারোগা, দিনরাত ঘোড়া দাবড়ে বেড়াচ্ছে সে।

চারপাশে পাহারাদারির এমন কড়া ব্যবস্থা যে তার ভেতর লোকের চোখে ধুলো দিয়ে একটা ছুঁচ সরাবার উপায় নেই।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, এবার কানাই নির্ঘাত ফেল। ননী দারোগার কাছে তার কোনো জারিজুরি কি ওস্তাদি খাটবে না। সাত দিন পর থানায় বাঁশ-ডলা খেয়ে তার হাড়-মাংস কিমা হয়ে যাবে। ননী দারোগাকে চ্যালেঞ্জ কয়ার ফলটা হাতে হাতে পাবে সে।

সাতটা দিন তুমুল উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। তারপর বাজিতপুর হাইস্কুলের খেলার মাঠে আবার মিটিং ডাকে ননী দারোগা। দু'জন কনস্টেবল পাঠিয়ে কানাইকে 'স্পেশাল' নেমন্তন্ন করে আনে সে।

হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ননী দারোগা গোঁফে তা দিতে দিতে বলে,

'প্রিয় গ্রামবাসীরা, আপনারা বলুন কানাই কারুর টাকাপয়সা, সোনাদানা, ঘটিবাটি বা অন্য কিছু চুরি করতে পেরেছে কিনা?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, 'না হুজুর, আমাদের কিচ্ছু চুরি যায়নি।'

'ভাল করে ভেবেচিন্তে বলুন।'

'ভেবেচিন্তেই বলছি হুজুর।'

এবার ননী দারোগা কানাইকে তার কাছে ডেকে আনে। একটা ভুরু ওপরে তুলে, আরেকটা নামিয়ে ভারিক্কি চালে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'তারপর কানাই ওস্তাদ, নিজের কানেই শুনলে কারুর কিস্যু খোয়া যায়নি। অন্যের মাল হাতাতে না পারলে কী কী করা হবে, মনে আছে নিশ্চয়ই?'

হাজার হাজার লোক দমবন্ধ করে কানাই আর ননী দারোগার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখের পাতা পড়ছে না। ননী দারোগাকে চ্যালেঞ্জ করে হেরে গেছে কানাই। এখন তার হাল কী হবে সেটা ভাবতেই সবার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে।

কানাই কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি। দেখে মনে হয় না, তার প্রাণে ভয়ডর বলে কিছু আছে। হাতজোড় করে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে সে মাথাটা কাত করতে করতে বলে, 'মনে আছে হুজুর। কিচ্ছু ভুলিনি। ন্যাড়া করে দেওয়া, মুখে চুনকালি লাগানো, তারপর বাঁশ-ডলা—'

ননী দারোগা মেঘ-ডাকা গলায় বলে, 'আগে তাহলে বিষ্টু নাপিতকে দিয়ে মাথা চেঁছে

'তার আগে আমার একটা নিবেদন আছে হুজুর।'

চোখের তারা দু'টো বনবন করে ঘুরতে থাকে ননী দারোগার। বলে, 'কিসের নিবেদন?'

মাথাটা আরো অনেকখানি নুইয়ে কানাই বলে, 'আজ্ঞে হুজুর, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি চুরি করতে পেরেছি।'

কানাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই গোটা সভা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ যেন বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, গাছের পাতা নড়ছে না, এমনকি লোকজনের বুকের ধুকধুকুনি পর্যন্ত থেমে গেছে। কানাইয়ের কথা কানে শোনার পরও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না।

মিনিট পাঁচেক কানাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে ননী দারোগা। তারপর স্টিম ইঞ্জিনের মতো হুস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পেল্লায় গর্জন ছাড়ে, 'চুরি করেছ! বটে!'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'দেখি কী হাতিয়েছ?'

কানাই তার জামার পকেট থেকে একটা ভারী সোনার হার বার করে তুলে ধরে। সেটার লকেটে প্রকাণ্ড একটা হীরে জ্বলজ্বল করছে।

হার দেখে চোখ গোল হয়ে যায় ননী দারোগার। অনেকক্ষণ তার গলা দিয়ে

আওয়াজ বেরোয় না।

কানাই বলে, 'চিনতে পারছেন হুজুর?'

খাবি খেতে খেতে ননী দারোগা বলে, 'পারছি।'

'এটা মা জননীর হার।'

মা জননী মানে ননী দারোগার স্ত্রী মহামায়ার। হারটা দেখার পর ননীর হুঙ্কার নেই, গোঁফে তা দিতেও ভুলে গেছে। চিঁ চিঁ করে সে বলে, 'এটা তুমি পেলে কী করে?'

কানাই জানায়, সাত দিন ছাব্বিশখানা গ্রামের সব লোক দিনরাত পাহারা দিয়েছে। থানায় একজন পুলিশও ছিল না, এমনকি স্বয়ং ননী দারোগাও না। সবাই বন্দুক ঘাড়ে করে গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বেড়িয়েছে।

থানায় পাহারাদার নেই। সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে কানাই। কাল ভোরে জানালার শিক বেঁকিয়ে ননী দারোগার কোয়ার্টারে ঢুকে তার আলমারি থেকে হারটা সরিয়ে ফেলেছে। তার কাছে একটা চাবি আছে, সেটা দিয়ে দুনিয়ার সব তালা খোলা যায়। সেই চাবিটা দিয়েই ননী দারোগার আলমারি খুলেছে সে।

সমস্ত শোনার পর কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। পাক্কা আধঘণ্টা সবাই হাঁ হয়ে রইল।

ননী দারোগা কথা রেখেছিল। সেকালের মানুষজন ছিল অন্যরকম। তারা গুণীর সম্মান দিতে জানত।

পরের দিনই ফের মিটিং ডেকে হাজার হাজার লোকের সামনে ননী দারোগা কানাইয়ের গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছে। কানাইও অবশ্য মহামায়ার হারটা ফিরিয়ে দিয়েছিল।

নানারকম গল্প

ভূত নেই, ভূত আছে

বাজু একসঙ্গে মাথা আর হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'না দাদাই, ভূত-টুত বলে কিস্‌সু নেই। স্রেফ গাঁজা।'

বাজুর বন্ধু বিট্টুও ঠোঁট উলটে দিয়ে বলে, 'একদম বোগাস।'

ফি বছর বাজু পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি আসে। পুরো ছুটিটা কাটিয়ে একেবারে ভাইফোঁটার পর নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়।

বাজুর অবশ্য আপন মামা নেই। তবে মাসি আছে, দাদাই আছেন, দিদন আছেন। বেড়িয়ে, গল্প করে, মজার মজার বই পড়ে ছুটিটা তোফা কেটে যায়।

এ বছর বাজুর সঙ্গে এসেছে তার প্রাণের বন্ধু বিট্টু। দু'জনের গলায় গলায় ভাব। একই স্কুলে তারা ক্লাস ফোরে পড়ে। দু'জনেরই বয়স দশ।

দুই বন্ধুই লেখাপড়ায় দারুণ। হাফ ইয়ারলিতে বাজু ফার্স্ট হলে, অ্যানুয়েলে বিট্টু। দু'জনেরই দারুণ বুদ্ধি আর সাহস।

বাজু মামাবাড়িতে এলে সন্ধের পর রোজ ছাদে আলো নিভিয়ে শতরঞ্চিতে আরাম করে বসে গল্পের আসর জমানো হয়। গল্প বলেন অবশ্য তার দাদাই অর্থাৎ দাদামশাই। মামাবাড়িতে অজস্র বই, আট-দশটা আলমারি একেবারে বোঝাই। তবু প্রতি মাসেই দাদাই প্রচুর বই কেনেন। কত রকমের বই তার ঠিক নেই। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সায়েন্স ফিকশান, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ইত্যাদি। এইসব বইয়ের প্রতিটি পাতা দাদাইয়ের মুখস্থ। ছুটিতে বাজু মামাবাড়ি এলে তিনি তাকে এই বইগুলোর গল্প শোনান।

গল্পের আসরে শ্রোতা শুধু একা বাজুই নয়—মাসি, দিদন এবং মামাবাড়ির চারপাশে যারা থাকে যেমন বুম্বা, পাপাই, বুবলা—এরাও। বুম্বাদের সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বাজুর।

দিন তিনেক আগে এবার পুজোর ছুটি পড়েছে, আর আজই দুপুরে বাজু বিট্টুকে সঙ্গে করে মামাবাড়ি চলে এসেছে। বাজুর মা-ই তাদের পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

দিনের বেলাটা হই হই করে কাটিয়ে এখন এই সন্ধেবেলায় ছাদে গল্পের আসর বসিয়েছে বাজুরা। এতদিন যারা গল্প শুনে আসছিল, বিট্টু আসায় এবার তাদের সংখ্যাটি বেড়েছে।

এবার মামাবাড়িতে পা দিয়েই বাজু খবর পেয়েছে, ইদানীং কিছুদিন ধরে দাদাইকে ভূতে পেয়েছে। ইংরেজি আর বাংলায় ভূতপ্রেত নিয়ে যত বই বেরিয়েছে, সবই কিনে ফেলেছেন। এগুলো রাখার জন্য নতুন আলমারিও করাতে হয়েছে।

কাজেই দাদাইয়ের গল্পে ভূত যে এসে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী। বেশ জমিয়ে খাস বিলেতের এক ঢ্যাঙা সাহেব ভূতের কীর্তিকলাপ যখন তিনি বলতে শুরু করেছেন সেই সময় বাজু আর বিট্টু প্রবল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

তাদের দেখাদেখি শিয়ালের পালের মতো পাপাইরা কোরাসে বলে ওঠে, 'বাজে, বাজে, বাজে। আমরা ভূত বিশ্বাস করি না।'

দাদাই চোখ কুঁচকে সবাইকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন, 'কর না তো?'

'না, না, না।'

'কেন কর না?'

'আমরা কেউ ভূত দেখিনি, তাই।'

দাদাই কী একটু ভাবেন। তারপর বলেন, 'যদি তোমাদের ভূত দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে করবে?'

সবাই গলা মিলিয়ে বলে, 'করব, করব।'

এদের মধ্যে বাজু এবং বিট্টুর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তারা বলে, 'কবে দেখাবে? কখন দেখাবে?' তাদের আর তর সইছে না যেন।

দাদাই বলেন, 'দু-একদিনের ভেতর দেখতে পাবে।'

'দিনের বেলা, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে।'

'কোথায় দেখাবে?'

দাদাইদের বাড়ির পেছনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠটা ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি। তারপর রেল লাইন চলে গেছে। আর রেল লাইনের ধারে একটা প্রকাণ্ড পুরনো ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ি কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটায় লোকজন থাকে না, আলোটালো নেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ওটাকে ভুতুড়ে দেখায়। বাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দাদাই বলেন, 'ওই বাড়িটায় রাত বারোটার সময় পরশু যদি যাও, ভূত দেখতে পাবে।' তারপর খুদে শ্রোতাদের দিকে ফিরে পর পর সবাইকে দেখতে দেখতে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে যেতে চাও, বল।'

পাপাই, বুম্বা আর বুবলার মুখ চুপসে গেছে। তাদের বুকের ভেতরটা ভীষণ ঢিপ ঢিপ করছিল।

বুম্বা ঢোক গিলে বলে, 'আমাদের বাড়ির গেটে রাত দশটায় তালা লাগানো হয়। আমি যে বেরুতে পারব না।'

পাপাই বলে, 'কাল সকালে চন্দননগরে পিসির বাড়ি যাচ্ছি। ফিরব চারদিন বাদে। পরশু ভূত দেখতে যাব কী করে?'

দাদাই চোখ কুঁচকে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলেন, 'তোমাদের কেমন সাহস বুঝেছি। তা বাজু, বিট্টু তোমরা কী করতে চাও? তোমাদেরও কি পিসির বাড়ি টাড়ি যেতে হবে?'

দাদাই-এর কথায় একটু খোঁচা ছিল। বাজু আর বিট্টু নড়েচড়ে বসে। ভেবেছেন কী দাদাই—তারা ভীতুর ডিম? বাজু গম্ভীর গলায় বলে, 'আমরা পরশু ওই পোড়ো বাড়িতে যাব। ভূত আছে কিনা, না দেখে ছাড়ছি না।'

দাদাই বলেন, 'ভেরি গুড। এই না হলে বীরপুরুষ!'

কখন যেন দিদন ছাদে উঠে এসেছিলেন কেউ টের পায়নি। তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন, 'না না, পোড়ো বাড়িতে কাউকে যেতে হবে না। ভয় পেয়ে ছেলে দুটো একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসুক। তখন কে সামলাবে?' দাদাইকে বলেন, 'কেন ওদের নাচাচ্ছ?'

বাজু এবং বিট্টু দু'জনেই ভীষণ একগুঁয়ে। তারা বলে, 'আমরা যাবই। নিজের চোখে ভূত দেখার এমন একটা চান্স এসেছে, এ চান্স আমরা ছাড়ছি না।'

দিদন অনেক করে বোঝালেন কিন্তু বিট্টু আর বাজু একেবারে অটল হয়ে রইল।

একদিন পর রাত্তিরে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ, এয়ার গান আর মোটা একটা লাঠি নিয়ে বাজু এবং বিট্টু মাঠ পেরিয়ে পোড়ো বাড়ির সামনে চলে আসে।

কোথাও আলো টালো নেই। শুধুই ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশের ঝোপঝাড়ে একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। দূরে তালগাছের মাথায় কর্কশ গলায় পেঁচা চেঁচিয়ে ওঠে। কোথায় যেন একপাল কুকুর কোরাসে চিৎকার করে যাচ্ছে।

দাদাইয়ের সামনে তো দু'জনে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল, স্বচক্ষে ভূত দেখার সুযোগ তারা ছাড়বে না। কিন্তু এখন তাদের গা ছম ছম করতে থাকে।

বাজু আর বিট্টু একবার ভাবল, এখান থেকেই ফিরে যাবে। পরক্ষণে তাদের খেয়াল হয়, বাড়ির ভেতর না ঢুকে ফিরে গেলে দাদাই টিটকিরি দেবেন, কাওয়ার্ড টাওয়ার্ড বলবেন। শেষ পর্যন্ত তারা ঢুকেই পড়ে।

টর্চ জ্বেলে চারদিকে আলো ফেলতে ফেলতে আগে আগে চলেছে বাজু। তার পেছনে বিট্টু।

একতলাটা ভাঙাচোরা। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠে আসছে। এঘরে ওঘরে দু'জনে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। সব ঘরেরই প্লাস্টার খসে পড়েছে। মেঝেতে আধ হাত পুরু ধুলো। গোটা সিলিং জুড়ে মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা। বাজুরা ঢুকতেই ফর ফর করে অগুনতি চামচিকে উড়তে থাকে। মেঝের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর দৌড়ে কোথায় অদৃশ্য সব গর্তে যেন ঢুকে যায়।

একতলা থেকে একসময় ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে আসে বাজুরা। এখানেও সেই একই হাল। গোটা তিনেক ঘর দেখার পর ওরা দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিট্টু বলে, 'দাদাই গুল দিয়েছেন। ভূত ফুত কিচ্ছু নেই এখানে। এঘরে ঢুকবি, না ফিরে যাবি?'

বাজু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে খোনা গলায় কেউ বলে ওঠে, 'ঢুঁকবে বৈঁকি, অ্যাঁদ্দুর এঁসে নাঁ ঢুঁকে ফিঁরে গেঁলে কিঁ চঁলে? এঁস এঁস, তোঁমাদের সঙ্গে এঁকটু গঁপ্প টঁপ্প কঁরি।'

দুই বন্ধুর হৃৎপিণ্ড বলের মতো লাফিয়ে ওঠে। তারা কী করবে, ভেবে পায় না।

ঘর থেকে সেই গলাটা আবার ভেসে আসে, 'কী হঁল, দাঁড়িয়ে রঁইলে কেঁন? তোঁমাদের তোঁ দাঁরুণ সাঁহস। চঁলে এঁস। আঁমি দেঁখতে পাঁচ্ছি, তোঁমাদের সঁঙ্গে টঁর্চ, লাঁঠি আঁর এঁয়ার গাঁন রঁয়েছে। ওঁগুলো বাঁইরে রেঁখে এঁস।'

অন্ধকারে দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর 'দেখাই যাক না, কী হয়'—এমন একখানা ভাব করে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ে।

বাইরের থেকে ঘরের ভেতরটা অনেক বেশি অন্ধকার। একটা দেওয়ালের সামনে সেই অন্ধকার যেন আরো জমাট বেঁধে আছে। মনে হয়, লম্বা কালো কোট পরে বেজায় ঢ্যাঙা কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে। কম করে সে আট-ন' ফিট লম্বা তো হবেই, মাথা প্রায় সিলিংয়ে গিয়ে ঠেকেছে। সেটার বুকে দুটো জ্বলন্ত চোখ আটকানো। আর যা চোখে পড়ে তা হল দশ বারো ইঞ্চি মাপের বিরাট বিরাট ধবধবে ক'টা দাঁত।

দাঁত এবং চোখ দেখে দুই বন্ধুর দাঁতকপাটি লেগে যাবার অবস্থা। তাদের গলার ভেতর থেকে 'আঁক' করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

সেই গলাটা আবার শোনা যায়, 'কী নাঁম তোঁমাদের?'

ম্যালেরিয়া হলে যেমন হয়, ভয়ে তেমনি ঠকঠক করে কাঁপছিল বাজুরা। তারই মধ্যে কোনোরকমে দু'জনে নাম বলে।

'তোঁমরা কোঁথায় থাঁকো?'

বাজু বলে, 'সেলিমপুরে।' বিট্টু বলে, 'ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে।'

'এখাঁনে কোঁথায় এঁসেছিলে?'

কোথায় এসেছে, বাজুরা জানায়।

'ওঁ, মাঁমারবাঁড়িতে বেঁড়াতে এঁসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'রাঁত দুঁপুরে এঁই হাঁনাবাঁড়িতে ঢুঁকেছিলে কেঁন?'

'এই—মানে, মানে—'

'বুঁঝতে পেঁরেছি। ভুঁত দেঁখতে এঁসেছ। তোঁমাদের মঁত সাঁহসী ছেঁলে আঁর দেঁখিনি। আঁলাপ কঁরে ভাঁরি খুঁশি হঁলাম।'

কাঁপতে কাঁপতে বাজুরা বলে, 'আমরাও।'

সেই গলাটি শোনা যায়, 'তোঁমাদের সাঁহসের জঁন্যে কিঁছু উঁপহার দিঁচ্ছি। এঁই নাঁও।'

দুটো বেজায় লম্বা কালো হাত বাজু আর বিট্টুর দিকে এগিয়ে আসে। সেই হাতে কাজু বাদামের প্যাকেট, বড় চকোলেট বার ইত্যাদি রয়েছে।

বাজুরা নেবে কি নেবে না যখন ভাবছে, সেই সময় গলাটা ফের কানে আসে, 'নাঁও, নাঁও—'

কাঁপতে কাঁপতে বাজু আর বিট্টু কাজু বাদাম আর চকোলেট তুলে নিয়ে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'থ্যাঁঙ্কস তোঁ আঁমার দেঁবার কঁথা। আঁচ্ছা, এঁবার তোঁমরা বাঁড়ি যাঁও। নঁইলে দাঁদাই দিঁদন আঁর মাঁসি ভাঁববে।'

পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজুরা আবার সেই ফাঁকা নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে মামাবাড়িতে ফিরে আসে।

মাসি আর দিদন গেটের কাছের দুটো জোরাল আলো জ্বেলে বসে ছিলেন। বাজুদের দেখে দৌড়ে আসেন। দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বলেন, 'তোদের জন্যে ভেবে ভেবে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিছু হয়নি তো তোদের?'

বাজু এবং বিট্টু একসঙ্গে জানায়, 'কী আবার হবে?'

মাসি বলে, 'ভয়টয় পাসনি তো?'

ভয় যে যথেষ্টই পেয়েছে তা কি আর বাজুরা স্বীকার করে? তারা বলে, 'কিসের ভয়? ধুস—'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল মাসির। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখলি ওখানে?'

দিদন চান না পোড়ো বাড়ির ব্যাপারে আর কোনো কথা হয়। তিনি মাসিকে বলেন, 'যা শোনার কাল শুনিস। রাত দেড়টা বাজে। ওদের ঘুমনো দরকার। আয় বিট্টু, আয় বাজু—' দু'জনকে তাদের ঘরে নিয়ে যান তিনি।

ওরা যখন হাত-পা ধুয়ে জামা-প্যান্ট পালটে শুয়ে পড়েছে আর দিদন ওদের মশারি গুঁজে দিচ্ছেন সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে দাদাই এসে হাজির। তিনি বলেন, 'কি বাজুদাদা, বিট্টু দাদা—মোলাকাত হল?'

দুই বন্ধু বলে, 'তা হয়েছে। আমরা ভাল ভাল প্রেজেন্টেশনও পেয়েছি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কোনো খটকা লাগছে?'

'হুঁ।'

'কী?'

একটু চিন্তা করে বাজু বলে, 'কাল বলব।'

'ওকে, কালই শুনব। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

দাদাই দিদন আর মাসিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ভোরবেলা, তখনও রোদ ওঠেনি, আকাশটা আবছামতো, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বাজুর। রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোতে পারেনি সে। বার বার পোড়ো বাড়ির ঘটনাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। পোড়ো বাড়িতে তারা যা দেখেছে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। গোলমালটা কী ধরনের সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দুই বন্ধু একটা প্রকাণ্ড খাটে পাশাপাশি শুয়ে ছিল। আস্তে আস্তে বাজু বাঁদিকে কাত হতেই দেখতে পায় বিট্টু মশারির চালের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে। সে ডাকে, 'এই—'

বিট্টু সাড়া দেয়, 'কী বলছিস?'

তক্ষুণি উত্তর দেয় না বাজু। কী যেন ভেবে কিছুক্ষণ বাদে বলে, 'আচ্ছা, ভূতেরা তো শুনেছি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খালি ভয় দেখায়।'

'হুঁ।'

'কিন্তু কাল রাত্তিরে কী হল? আমাদের সঙ্গে ভাল ভাল কথা বলল, কাজু বাদাম, চকোলেট দিল। জানিস, আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই। রাত্তিরে আমারও ভাল ঘুম হয়নি, খালি এইসব কথা ভেবেছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিছু চিন্তা করে বাজু। তারপর বলে, 'এক কাজ করা যাক—'

বিট্টু বলে, 'কী রে?'

'কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি এখন একবার ওই পোড়ো বাড়িটায় যাই চল। আমার মনে হয় কোনো একটা ক্লু-টু পেয়ে যাব।'

দুই বন্ধু অজস্র ডিটেকটিভ গল্প পড়েছে। তাদের ধারণা, শার্লক হোমস, কিরীটী রায়, ফেলুদার মতো তারাও এক একটি দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা। পোড়ো বাড়ির ভূতটাকে মেনে নিতে তাদের আটকাচ্ছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো রহস্য আছে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম। চল, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি।' বিট্টু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।

মামাবাড়িতে এখনও কারুর ঘুম ভাঙেনি।

বিট্টু আর বাজু নিঃশব্দে গেট খুলে বেরিয়ে পড়ে। মাঠ পেরিয়ে পোড়ো বাড়ির দোতলায় সেই ঘরটিতে এসে দেখতে পায়, দেওয়ালের কাছে যেখানে কাল দুটো জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা দাঁত দেখেছিল সেখানে অনেকগুলো ইট থাকে থাকে সাজিয়ে উঁচু বেদির মতো করা হয়েছে। তার ওপর কালো কাপড়ের বিরাট এক আলখাল্লা পড়ে আছে। সেটা তুলে ধরতে দেখা যায় দু জায়গায় গোল করে কী যেন লাগানো রয়েছে। আবছা অন্ধকারে সে দুটো যেন জ্বলছে।

বাজু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলে, 'ফসফরাস। কাল রাত্তিরে এটা দেখে মনে হয়েছিল

ভূতের চোখ।'

এদিকে বিট্টু সাদা শোলার তৈরি দাঁতের পাটি আবিষ্কার করে ফেলে। বলে 'এই দ্যাখ ভূতের দাঁত। কাল এগুলো চোখের নিচে আটকে আমাদের ভয় দেখানো হয়েছিল।'

'হুঁ।' বাজু বলে, 'দ্যাখ তো আর কিছু ক্লু পাওয়া যায় কিনা।'

খোঁজাখুঁজি করতে করতে দুই বন্ধুর চোখে পড়ে ঘরের মেঝের ধুলোতে তাদের জুতোর ছাপ ছাড়াও বড় কেডসের দাগ পড়ে আছে।

দাগগুলোর পাশে বসে দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ঝুঁকে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ ব্যস্তভাবে বাজু বলে, 'তুই এখানে থাক, আমি একটু ঘুরে আসছি। দশ মিনিটের মধ্যে ফিরব।' বলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বেরিয়ে যায়।

দশ মিনিটও লাগে না, তার অনেক আগেই একজোড়া কেডস নিয়ে ফিরে আসে বাজু। তারপর পুরনো বড় দাগগুলোর পাশে কেডস রেখে চাপ দিতেই নতুন দাগ হয়ে যায়। আগের দাগ আর এই দাগ হুবহু এক। অর্থাৎ বাজু যে কেডস নিয়ে এসেছে সেটা পরে কাল কেউ এখানে এসেছিল।

বাজু দাগগুলো দেখিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছিস তো?'

বিট্টু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হুঁ।'

'চল, এবার ফেরা যাক।'

কালো আলখাল্লা, দাঁত, কেডস ইত্যাদি নিয়ে যখন বাজুরা মামাবাড়িতে ফিরে আসে, দাদাই আর দিদন সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। মাসিকে অবশ্য দেখা যায় না। সে একেবারে লেট লতিফ, সাড়ে আটটার আগে কোনোদিনই তার ঘুম ভাঙে না।

বাজুদের দেখে অবাক হয়ে যান দাদাই আর দিদন। দাদাই বলেন, 'এ কী, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

বিট্টু বলে, 'ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম ওই পোড়ো বাড়িটায় একবার ঘুরে আসি।'

দাদাই চমকে ওঠেন, 'গিয়েছিলে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। ভাবলাম দেখি যদি কালকের সেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'কী সর্বনাশ!'

বাজু বলে, 'দেখা হল না। তবে তার জার্সিটা নিয়ে এসেছি।' বলে সেই আলখাল্লাটা এবং দাঁতগুলো তুলে ধরে।

তারপর সেগুলো নামিয়ে রেখে সেই কেডস দুটো দেখিয়ে বলে, 'পোড়ো বাড়ির ওই ঘরটায় ধুলোর ওপর এগুলোর অনেক ছাপ রয়েছে।'

চোখের কোণ দিয়ে দাদাইকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এই কেডস দুটো তোমার। এ দুটো পরে তুমি বিকেলে সামনের পার্কে বেড়াতে যাও না?'

ঢোক গিলে দাদাই বলেন, 'হ্যাঁ, আমারই তো। কিন্তু—'

'আমরা কোত্থেকে নিয়ে এলাম, জানতে চাইছ কি?'

'হ্যাঁ।'

'পোড়ো বাড়ির মেঝেতে জুতোর যে ছাপ রয়েছে তার সঙ্গে মেলাবার জন্যে খানিকক্ষণ আগে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বাজু বলতে থাকে, 'দিস ইজ ব্যাড দাদাই। আমাদের বিশ্বাস করানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ভূত সাজতে হল!'

দিদন হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে দাদাইকে বলেন, 'ছি ছি, এ কী করেছ তুমি! যদি কিছু একটা হয়ে যেত! তোমার কি আক্কেল নেই?'

দাদাই কাঁচুমাচু মুখে বলেন, 'ওদের সাহস কতখানি সেটাই পরখ করছিলাম। ওখানে গিয়ে তো ক্ষতি হয়নি, কাজু বাদাম পেয়েছে, চকোলেট পেয়েছে।'

বাজু বলে, 'ভূত যে আছে, তা কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি দাদাই। আমাদের স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছ।'

দাদাই বলেন, 'তা হয়তো দিয়েছি। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও তো দাদারা—'

'কী?'

'কাল জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা দাঁত দেখে তোমরা ভয় পাওনি?'

বাজু, বিট্টু দু'জনেই হকচকিয়ে যায়। বলে, 'মিথ্যে কথা বলব না, সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।'

দাদাই এবার হেসে হেসে বলেন, 'ভূত-টুত নেই, আবার আছেও। কোথায় আছে জানো? আমাদের মনের ভেতর। ভয় পেলেই সে তোমাকে চেপে ধরবে, যেমন কাল ধরেছিল। ভয় না পেলে তোমাদের একশ মাইলের ভেতর সে ঘেঁষবে না।'

হীরের টুকরো

আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে পনেরটি ছেলেকে ফুটবল প্র্যাকটিস করাচ্ছিল অনুপম। কী করে ফ্রি কিক মারতে হয়, বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ওপর ম্যান-টু-ম্যান মার্কিং করতে হয় কিভাবে, কেমন করে বাড়াতে হয় থ্রু পাসের বল—এ সব ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে বল বসিয়ে গোল পোস্টে কিক নিতে বলছিল।

ছেলেদের বয়স বারো থেকে চোদ্দর ভেতর। অনুপম যেভাবে বলছিল হুবহু সেইভাবে তারা প্র্যাকটিস করছে।

আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব ফি বছর ফোর-টেনের অর্থাৎ চার ফিট দশ ইঞ্চি হাইটের খেলোয়াড়দের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর নাম 'আজিমপুর চ্যালেঞ্জ কাপ।' ফাইনালে জিতলে আড়াই ফিট উঁচু একটা দারুণ কাপ দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের সবাই পায় সোনার কাজ-করা মেডেল। ফাইনালে যে সব চেয়ে বেশি গোল দিতে পারে সে পায় আরো একটা বড় কাপ। এ ছাড়া নানারকম উপহার তো আছেই।

'আজিমপুর চ্যালেঞ্জ কাপ'-এর তাই দারুণ নাম-ডাক। আশেপাশের যত ছোট বড় শহর রয়েছে, সে সব জায়গা থেকে গণ্ডা গণ্ডা টিম তো আসেই, এমনকি দু'শ কিলোমিটার দূরের কলকাতা থেকেও কয়েকটা দল আসে। পনেরো বছর এই টুর্নামেন্ট চলছে। কিন্তু তিন বারের বেশি কাপ এখান থেকে বাইরে যায়নি। এই কাপটার সঙ্গে আজিমপুর শহরের মান-সম্মান জড়িয়ে আছে। ফাইনালে হেরে গেলে এখানকার মানুষদের মাথা একেবারে হেঁট হয়ে যায়। তাদের মনে হয়, সব গেল। তাই প্রতি বছর খুব যত্ন করে টিম করা হয়। এক একবার এক এক জন নাম-করা কোচকে আনা হয় কলকাতা থেকে। তারা খেলোয়াড়দের তালিম দিয়ে দুর্ধর্ষ করে তোলে। এবার আনা হয়েছে অনুপমকে। সারা দেশ জুড়ে ফুটবল কোচ হিসেবে তার দারুণ সুনাম।

তিন বার 'আজিমপুর চ্যালেঞ্জ কাপ' বাইরের যে টিমটা জিতে নিয়ে গেছে তার নাম 'ইলেভেন বুলেটস'। এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে বিশাল স্টিল ফ্যাক্টরি ঘিরে যে নতুন শহর গড়ে উঠেছে, 'ইলেভেন বুলেটস' ওখানকার ক্লাব। শহরটার নাম নবীগঞ্জ।

এই ফুটবল কমপিটিশন নিয়ে আজিমপুরের সঙ্গে নবীগঞ্জের মর্যাদার লড়াই চলে আসছে। তারাও প্রতি বছর ভাল টিম তো করেই, কলকাতা থেকে তারাও দামী কোচ নিয়ে আসে।

এ বছরের টুর্নামেন্টে একদিকে সেমি ফাইনালে উঠেছে 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব', অন্য

দিক থেকে 'ইলেভেন বুলেটস'। আশা করা যাচ্ছে, দু দুটো দলই শেষ পর্যন্ত ফাইনালে যাবে এবং অন্য সব বছরের মতো শেষ লড়াইটা তাদের মধ্যেই হবে।

কাল বিষ্ণুপুরের 'অগ্রদূত ক্লাব'-এর সঙ্গে সেমি ফাইনালের ম্যাচ। অগ্রদূত বেশ কড়া টিম। সেই জন্য আজ ভোর থেকে প্র্যাকটিস শুরু করিয়েছে অনুপম।

তালিম দিতে দিতে একটা ব্যাপার লক্ষ করছিল অনুপম। মাঠের ভেতর পনেরোটি খুদে খেলোয়াড়, যা বলা হচ্ছে মেশিনের মতো করে যাচ্ছে। কিন্তু মাঠের বাইরে, গোল পোস্টের পেছনে অন্য একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তেরো চোদ্দর মতো বয়স হবে। চাবুকের মতো চেহারা। পরনে তালি-মারা হাফ প্যান্ট আর একটা ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি। শুধু আজই না, আগেও ক'দিন প্র্যাকটিসের সময় তাকে ঠিক ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

বল বাইরে গেলেই কখনও হেড দিয়ে, কখনও বা নিখুঁত ভলি মেরে সে মাঠে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। তার পা থেকে বল যেন গোলার মতো বেরিয়ে আসে।

'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর সব খেলোয়াড়ই বেশ ভাল। কিন্তু আগের অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় স্ট্রাইকার তাপসের গোড়ালিতে চোট লেগেছিল। এখনও ব্যথাটা যে পুরোপুরি সারেনি সেটা তার দৌড়নো দেখলে টের পাওয়া যায়।

তাপসকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় আছে অনুপম। তার পা ঠিক থাকলে দুর্ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু অগ্রদূতের ডিফেন্স এক কথায় দুর্ভেদ্য। তাদের গোলে বল ঢোকানো সোজা ব্যাপার না। অগ্রদূতের পর ফাইনালে খেলতে হবে 'ইলেভেন বুলেটস'-এর সঙ্গে। দুর্দান্ত স্ট্রাইকার ছাড়া এই দুটো টিমের বিরুদ্ধে জেতা প্রায় অসম্ভব।

মাঠের বাইরের ওই ছেলেটার বল মারা, হেড করা, ইত্যাদি দেখে ক'দিন ধরেই একটা কথা অনুপমের মাথায় ঘুরছে। প্র্যাকটিস করালে বোঝা যাবে, ছেলেটাকে তাপসের জায়গায় খেলানো যায় কিনা।

একসময় তাকে ডেকে অনুপম জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা বলে, 'হারু।'

'তুমি কোন টিমে খেলো?'

'কোনো টিমেই না। আমাকে কেউ খেলতে নেয় না।'

অনুপম অবাক। বলে, 'কিন্তু তুমি এত ভাল কিক কর, হেড দাও। এ সব শিখলে কোথায়?'

হারু জানায়, নানা টিম যখন প্র্যাকটিস করে সে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের বল মারার কায়দা শিখে নেয়। বল তো অনবরত বাইরে আসেই, সে তখন শিখে নেওয়া কৌশলগুলো কাজে লাগায়।

অনুপমের বিস্ময় বাড়তে থাকে। সে বলে, 'তুমি তো খালি পায়ে বল মারছিলে। বুট পরে পারবে?'

হারু কিছুক্ষণ ভেবে বলে, 'কোনোদিন তো বুট পরিনি। পেলে চেষ্টা করব।'

'আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।'

মাঠের পাশেই 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর দোতলা বড় বাড়ি। অনুপম সোজা ক্লাব বিল্ডিংয়ে গিয়ে ক'জোড়া বুট নিয়ে আসে। বলে, 'দেখ তো কোনটা পায়ে লাগে।'

বেশির ভাগ বুটই কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। শেষ পর্যন্ত একজোড়া হারুর পায়ের মাপে মাপে হয়ে যায়।

অনুপম বলে, 'এবার সারা মাঠটা এক চক্কর দৌড়ে এস।'

হারু দৌড়ুতে থাকে। বুট পরার অভ্যাস নেই, তাই প্রথমটা ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিল না। এক পাকের পর দু পাক, তারপর তিন পাকে তাকে দৌড় করায় অনুপম। ক্রমশ হারুর বাধো বাধো ভাবটা কেটে যায়। সহজভাবে এবার ছুটতে পারছে সে।

হারুকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল অনুপম। তাই অন্য ছেলেদের দিকে নজর ছিল না। তারা হারুকে নিয়ে এই বাড়াবাড়িটা একেবারেই পছন্দ করছে না। প্র্যাকটিস বন্ধ করে দু'চোখ কুঁচকে তারা হারুকে দেখছিল।

অনুপম 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর গোলকিপার সমীরকে বলে, 'তুমি গোলে গিয়ে দাঁড়াও। হারুকে দিয়ে ফ্রি কিক করাব।'

তারপর ডিফেন্সর চারজন খেলোয়াড়—নীতীশ আনন্দ বিজন এবং শুভেন্দুকে বলে, 'তোমরা ফ্রি কিকের স্পট থেকে খানিকটা দূরে দেওয়াল তৈরি করে এমনভাবে দাঁড়াও যাতে হারু সোজা কিক না নিতে পারে।'

শমীকরা যে যার জায়গায় ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনুপম আবার বলে, 'যাও, যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে পজিশন নাও।'

কারো নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। আগের মতোই সকলে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনুপম এবার রেগে যায়। গলা চড়িয়ে বলে, 'কী হল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

শমীক প্রথমে মুখ খোলে, 'অনুপমদা, আমরা হারুর সঙ্গে প্র্যাকটিস করব না।'

বাকি সবাই শমীকের কথায় সায় দেয়।

অনুপম হকচকিয়ে যায়। বলে, 'কেন, ও কী দোষ করল?'

কেউ উত্তর দেয় না।

কড়া গলায় হঠাৎ ধমকে ওঠে অনুপম, 'যা বলছি তাই কর। কুইক—'

ভয়ে ভয়ে শমীকরা শেষ পর্যন্ত পজিশন নিয়ে দাঁড়ায়। আর হারু আনন্দরা যে দেওয়াল তৈরি করেছিল, তার পাশ দিয়ে পায়ের চেটোয় বল ইন-সুইং করিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেয়।

এরপর নানাভাবে নানা দিক থেকে তাকে গোলে বল মারতে বলে অনুপম। বিদ্যুৎ গতিতে হারুর পা থেকে বল বেশির ভাগ সময়ই জালে জড়িয়ে যায়। কষ্ট করে অবশ্য দু-একটা বাঁচিয়ে দেয় সমীর।

জয়ন্ত চমৎকার কর্নার কিক মারতে পারে। সবার মাথার ওপর অন্তত দশ ইঞ্চি বেশি লাফিয়ে তার পাঠানো বল হেড করে গোলে পাঠিয়ে দেয় হারু।

টানা ঘণ্টা দুই তালিম দেবার পর অনুপম হারুকে বলে, 'বিকেলে আসতে পারবে?'

বিকেলে প্র্যাকটিসের পর অনুপম বুঝতে পারে, সুযোগ পেলে হারু দু-চার বছরের ভেতরে দুর্দান্ত স্ট্রাইকার হয়ে উঠবে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলে সেমি ফাইনালে তাপসের জায়গায় হারুকে খেলাবে। তবে কিছু অসুবিধাও আছে এ ব্যাপারে। সকাল বিকেল দু বারই দেখা গেছে, হারুর সঙ্গে শমীকরা প্র্যাকটিস করতে চায় না।

বিকেলে প্র্যাকটিস হয়ে গেলে ছেলেরা যে যার বাড়ি চলে যায়। আর অনুপম সোজা চলে আসে ক্লাব প্রেসিডেন্ট অমরনাথ চ্যাটার্জির বাড়ি। অমরনাথ এই শহরের বাঘা উকিল। প্রচুর নাম-ডাক, অঢেল পয়সা। লোকটি হাসিখুশি, অমায়িক। আইন আদালত বাদ দিলে 'আজিমগঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব' তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

বিশাল তেতলা বাড়ি অমরনাথের। একতলায় তাঁর চেম্বারে বসে খুব মন দিয়ে মামলার কী সব নথিপত্র দেখছিলেন তিনি। পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে অনুপমকে দেখে খুশি হলেন। বললেন, 'আসুন, আসুন।'

তাঁর মুখোমুখি একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসে পড়ে অনুপম। বলে, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

খুব হাঁকডাক করে একটা চাকরকে দিয়ে প্রচুর লুচি মিষ্টি আর চা আনিয়ে অমরনাথ বলেন, 'আগে খান। তারপর কথা।'

চা-টা খাওয়া হলে অমরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার ছেলেদের প্র্যাকটিস কেমন চলছে? অগ্রদূত ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে যেতে হবে। তারপর আছে 'ইলেভেন বুলেটস'। কেমন বুঝছেন, মান ইজ্জত থাকবে তো?'

'সেই ব্যাপারেই তো কথা বলতে এসেছি।'

'খুঁটিয়ে অনুপমকে লক্ষ করতে করতে অমরনাথ বলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, বেশ চিন্তায় আছেন।'

অনুপম বলে, 'তা আছি।'

'সব খুলে বলুন।'

তাপসের চোটের কথা জানিয়ে অনুপম বলে, 'একটা দারুণ স্ট্রাইকার পেয়েছি। তাপসের জায়গায় তাকে খেলালে আমার মনে হয় রেজাল্ট খুব ভাল হবে।'

অমরনাথ বলেন, 'ছেলেটা কে?'

'হারু।'

অমরনাথের কপাল কুঁচকে যায়। খানিকক্ষণ ভাবেন তিনি। তারপর বলেন, 'এরকম কোনো প্লেয়ার আজিমপুরের আছে বলে তো শুনি নি। থাকলে তার খবর নিশ্চয়ই আমার কানে আসত।'

অনুপম জানে অমরনাথের এই পাড়াতেই শমীক থাকে, তাদের বাড়িও সে চেনে। বলে, 'আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর হারুর সব খবর নিয়ে আসছি।'

অমরনাথ অবাক হয়ে যান। বলেন, 'কার কাছ থেকে?'

শমীকের নাম করে অনুপম।

অমরনাথ বলেন, 'আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।'

বাড়ির একটা কাজের লোককে দিয়ে শমীককে ডাকিয়ে আনেন অমরনাথ। জিজ্ঞেস করেন, 'হারু কে রে?'

শমীক বলে, 'নিবারণের ছেলে।'

'চোর নিবারণ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, তুই বাড়ি যা।'

শমীক চলে গেলে অমরনাথ বলেন, 'নিবারণ এখানকার অতি বিখ্যাত চোর। বছরে আট মাসই সে জেলে থাকে। তার ছেলের সঙ্গে এখানকার কোনো ছেলে খেলতে চাইবে না অনুপমবাবু।'

'ওর বাবার জন্যে এরকম ভাল খেলোয়াড় সুযোগ পাবে না? হারু নিজে তো কোনো অন্যায় করেনি।'

'তা করে নি। কিন্তু—' বলতে বলতে থেমে যান অমরনাথ।

অনুপম তাঁর কথা বোধ হয় শুনতে পাচ্ছিল না। সে সমানে বলে যায়, 'জানেন, পনেরো বছর আমি ফুটবলে ট্রেনিং দিচ্ছি। হারুর মতো প্লেয়ার দু-চারটের বেশি পাই নি। সুযোগ দিলে ও একদিন ন্যাশনাল টিমে খেলবে।'

'সবই বুঝলাম অনুপমবাবু, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। তবে আপনার কথাটা কমিটি মেম্বারদের জানাতে পারি। তাঁরা রাজি হবেন বলে মনে হয় না। তারপর দেখা যাক।'

পরদিন গিয়ে অনুপম জানতে পারে, কমিটি মেম্বারদের কেউ রাজি হন নি। হারুকে টিমে ঢোকালে ক্লাব ভেঙে যাবে। মেম্বারদের ধারণা চোরের ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করলে অন্য ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি জোর করে হারুকে টিমে ঢোকানো হয়, অভিভাবকরা ক্লাব থেকে তাঁদের ছেলেদের নাম কাটিয়ে নিয়ে যাবেন।

প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অস্থিরভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় অনুপম। অনেকক্ষণ ঘোরার পর তার মনে হয়, হারুর জন্য কিছু একটা করতেই হবে। কী করবে, সেটা মনে মনে ঠিক করে ফেলে সে।

শমীকের কাছ থেকে হারুর ঠিকানা আগের রাত্তিরে জেনে নিয়েছিল অনুপম। আজ ভোরে উঠে হারুকে সঙ্গে করে সে কুড়ি কিলোমিটার দূরে নবীগঞ্জে চলে যায় এবং 'ইলেভেন বুলেটস' ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মনোরঞ্জন চৌধুরির বাংলোটা খুঁজে বার করে। মনোরঞ্জনবাবু এখানকার স্টিল ফ্যাক্টরির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। দারুণ ফুটবল-পাগল মানুষ, কম বয়সে কলকাতার বড় টিমে খেলেছেন, নাম-করা সেন্টার হাফ ছিলেন।

অনুপমের পরিচয় পেয়ে খুশি যতটা হলেন, অবাক হলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। কেননা অনুপম তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষের কোচ।

প্রচুর চা-মিষ্টি খাওয়ানোর পর মনোরঞ্জন বলেন, 'নিশ্চয়ই কোনো দরকারে আমার কাছে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' হারুকে দেখিয়ে অনুপম বলে যায়, 'এই ছেলেটা ফুটবলের জিনিয়াস। চান্স পেলে মাঠ কাঁপিয়ে দেবে।'

মনোরঞ্জন হেসে বলেন, 'তার আর অসুবিধা কোথায়? আপনি এত বড় কোচ, আপনার ক্লাবেই ওকে সুযোগ দিতে পারেন।'

'তার অসুবিধা আছে স্যার। সেই জন্যই আপনার কাছে নিয়ে এলাম। আপনার সময় নষ্ট করছি ঠিকই, তবু এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভেবে দয়া করে আপনাকে সব শুনতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি বলুন।'

হারুর সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব বলে যায় অনুপম। শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন মনোরঞ্জন। তারপর হাত দুটো উলটে দিয়ে বলেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড। বাপ কী করেছে, সেই জন্য ছেলের পানিশমেন্ট হবে এভাবে! বলুন, আমি কী করতে পারি।'

অনুপম বলে, 'দয়া করে হারুকে আপনার টিমে একটা চান্স দিন। শুনেছি, কাল আপনাদের সেমিফাইনাল গেম আছে। তাতে ওকে খেলান।'

'তা কী করে সম্ভব! আমাদের টিম সেট হয়ে গেছে। ওকে নিতে হলে আমাদের স্ট্রাইকারকে বসাতে হয়। সেটা পারা যাবে না।'

'চৌধুরি সাহেব, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'একটু আগে বলেছেন, আমার নাম আপনি আগে থেকেই জানেন। কোচ হিসেবে আমার সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

'ভেরি হাই।'

'তা হলে আমার কথায় ভরসা রাখতে পারেন। পুরো গেমটা হারুকে খেলাতে হবে না। পনেরো মিনিট খেলিয়ে দেখুন। যদি তেমন কিছু দেখাতে না পারে, মাঠ থেকে ওকে তুলে নেবেন।'

মনোরঞ্জন উত্তর দিলেন না, ঠোঁট টিপে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর মনের কথাটা যেন বুঝতে পারল অনুপম। বলল, 'আপনার হয়তো সন্দেহ হচ্ছে, একটা বাজে খেলোয়াড় ঢুকিয়ে আমি 'ইলেভেন বুলেটস'-এর ক্ষতি করতে চাইছি।'

মনোরঞ্জন ঠিক তাই ভাবছিলেন। হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'সন্দেহ হয় কিনা বলুন?'

'নিশ্চয়ই হয়। আমি বিরুদ্ধ পক্ষের কোচ। ঠিক আছে, আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি সেমি ফাইনালে খেলাতে নামানোর আগে ওকে প্র্যাকটিস করিয়ে দেখুন না।'

'এটা আপনি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। ঠিক আছে, আমি হারুকে তালিম দিয়ে দেখব। ও এখন আমার বাংলোতেই থেকে যাক।'

'অনেক ধন্যবাদ চৌধুরি সাহেব। আমার শুধু আরেকটা অনুরোধ আছে।'

'কী?'

'আমি যে হারুকে এখানে নিয়ে এসেছি এটা যেন কেউ জানতে না পারে।'

'না না, আমি কাউকে বলব না।'

অনুপম হারুকে অমরনাথের বাংলোয় রেখে আজিমগঞ্জে ফিরে আসে।

পরের দিনের বিকেল পর্যন্ত দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটে অনুপমের। হারুর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, তবু নতুন জায়গায় প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যদি ঘাবড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আর কোনো আশা নেই।

সেদিন বিকেলে অনুপম দেখতে পায়, দুটো টিম অর্থাৎ 'প্রগতি সঙ্ঘ' আর 'ইলেভেন বুলেটস' মাঠে এসে গেছে। ব্যাকুলভাবে অনুপম তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখ ঝকমকিয়ে ওঠে। 'ইলেভেন বুলেটস' যে পনেরো জন খেলোয়াড় নিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে লাল সাদা জার্সি পরা হারুও রয়েছে। টিমের সঙ্গে ওদের কোচ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা বাদেও এসেছেন মনোরঞ্জন চৌধুরি।

প্রথম এগারো জনের মধ্যে হারু নেই। সে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছে। তাকে শেষ পর্যন্ত খেলানো হবে কিনা, কে জানে!

অনুপম আশা করেছিল, হারুকে শুরুতেই নামানো হবে। তার মনটা দমে যায়।

খেলা শুরু হয়ে গেল।

প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে 'প্রগতি সঙ্ঘ' দুটো গোল করে বসে। দু দুটো গোল খেয়ে 'ইলেভেন বুলেটস' এমনই ঘাবড়ে যায় যে এলোমেলো খেলতে থাকে। 'প্রগতি সঙ্ঘ' এখন অনবরত আক্রমণ করছে আর 'ইলেভেন বুলেটস'-এর খেলোয়াড়রা নিচে নেমে সমানে তা ঠেকাতে চেষ্টা করছে। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে আরো গোল খেয়ে যাবে।

ঠিক এই সময় মনোরঞ্জন ওঁদের স্ট্রাইকারকে তুলে নিয়ে হারুকে নামিয়ে দিলেন। সে নামার সঙ্গে সঙ্গে খেলার চেহারা একেবারে বদলে গেল। গোড়ার দিকের ধাক্কা সামলে এখন 'ইলেভেন বুলেটস' আক্রমণে উঠে এসেছে। গোটা ফরোয়ার্ড লাইনটাকে এখন খেলাচ্ছে হারু। দরকারমতো নিচে নেমে ডিফেন্সও করছে।

খেলার ধরনটা এভাবে পালটে যাবে, 'প্রগতি সঙ্ঘ' বুঝতে পারে নি। তারা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর তারই সুযোগ নিয়ে হারু একটা গোল শোধ করে ফেলে।

এদিকে মাঠের বাইরে তখন দারুণ উত্তেজনা আর হইচই চলছে। নবীগঞ্জ থেকে 'ইলেভেন বুলেটস'-এর অনেক সাপোর্টার এসেছিল। তারা গলার শির ছিঁড়ে সমানে চিৎকার করে তাদের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। আর আজিমপুরের দর্শকেরা হারুকে দেখে একেবারে হাঁ। প্রথম দিকে তারা চমৎকার জার্সি-পরা হারুকে চিনতে পারে নি। পরে বলাবলি করতে লাগল, 'চোরের ছেলেটা একেবারে ভেলকি দেখিয়ে দিল!'

সব চেয়ে যে খুশি হয়েছে সে অনুপম। তার বুকের ভেতরটা আনন্দে উত্তেজনায় লাফাতে লাগল। খেলোয়াড় চিনতে তার ভুল হয়নি। কিন্তু মুখ ফুটে সে যে কিছু বলবে তার উপায় নেই। কেননা সে তো আজিমপুরের কোচ। অন্য টিমের প্লেয়ার ভাল খেললে তার চুপ করে থাকাই উচিত। তা ছাড়া বেশি উচ্ছ্বাস দেখালে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। 'আজিমপুর স্পোর্টিস ক্লাব'-এর কর্মকর্তারা সন্দেহ করতে পারেন, সে-ই হারুকে 'ইলেভেন বুলেটস'-এ খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

হাফ টাইমের পর হারু নিজে আরো একটা গোল দিল, তারই জন্য ফোর টু-টুতে জিতে ফাইনালে উঠে গেল 'ইলেভেন বুলেটস'।

পরের দিনের সেমি-ফাইনালে কোনোরকমে এক গোলে জিতে ফাইনালে গেল 'আজিমপুর স্পোর্টিস ক্লাব'।

মাঝখানে দু'দিন রেস্টের পর ফাইনাল। সেদিন দুপুর হতে না হতেই মাঠ ভরে গেল।

এলাহি ব্যাপার। বিকেলে একজন মন্ত্রী এসে বক্তৃতা দিয়ে খেলার উদ্বোধন করলেন। খেলা শুরু হবার আগে তাঁর সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

মাইকে ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলকাতার নাম-করা ধারা-ভাষ্যকারদের মতো তিনজন পালা করে খেলার আগে মাঠের পরিবেশ, মন্ত্রীদের বক্তৃতা, খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান, ইত্যাদি ব্যাপারে বিবরণ দিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, 'চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর সঙ্গে এবার 'ইলেভেন বুলেটস'-এর ফাইনাল শুরু হবে।'

মাঠের ভেতর লাইনের ধারে দুই দলের বেঞ্চ। সেখানে রিজার্ভ খেলোয়াড়, কর্মকর্তা এবং কোচেরা বসে আছে। দুই টিমের বাইশ জন প্লেয়ার এখন মাঠে। আজ হারুকে রিজার্ভের দলে বসতে হয় নি। শুরুতেই খেলতে নামানো হয়েছে।

রেফারির হুইসিল বেজে ওঠে। খেলা আরম্ভ হয়ে যায়।

মাঠে দু দলের প্রচুর সাপোর্টার। প্রথম থেকেই তারা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে পটকা ফাটছে।

কয়েক মিনিট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলল। বল এদের গোলে এল তো পরক্ষণে ওদের গোলে। দুই গোল-কিপারই ক'টা দুর্দান্ত সেভ করল।

সেমি-ফাইনালের মতো 'ইলেভেন বুলেটস'-এর পুরো টিমটাকে খেলাচ্ছে হারু। বাঘের মতো মাঠের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় বল নিয়ে দাপটে ছোটাছুটি করছে সে। নিখুঁত ড্রিবল করে তিন চারজনকে কাটিয়ে থ্রু কি ওয়াল পাশ কিংবা 'লব' করছে।

পনেরো মিনিট লড়ার পর 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব' ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। আর এই সুযোগে হাফ ভলিতে একটা গোল করে ফেলে হারু। কিকটায় এত জোর ছিল যে গোল-কিপার সমীর এক ইঞ্চি নড়তে পারে নি।

গোলটা খাওয়ার পর হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওঠে 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব' এবং তিন মিনিটের ভেতর শোধ করে দেয়। এক মিনিট কাটতে না কাটতে আবার হারুর গোল। এবার হেড দিয়ে।

হাফ টাইমে এক গোল এগিয়ে থাকে 'ইলেভেন বুলেটস'।

ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে আসার সময় অনুপমকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল হারু। সে তার দিকেই আসত। হয়তো এই কথাই বলতে, যে আজ তাকে নিয়ে যে মাতামাতি হচ্ছে সেটা অনুপমের জন্যই।

অনুপম চোখের ইশারায় হারুকে তাদের বেঞ্চের দিকে যেতে বলে। হারু চলে যায়।

এবার অনুপম তার খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে দেয়, হাফ টাইমের পর কোন কৌশলে তাদের খেলতে হবে। সব চেয়ে যেটা দরকার তা হল হারুকে ভাল করে মার্ক করা। হারুকে ঠেকাতে না পারলে এই ম্যাচ জেতা যাবে না।

ওধারে 'ইলেভেন বুলেটস'-এর কোচও তার খেলোয়াড়দের হাফ টাইমের পর কিভাবে খেলতে হবে, বুঝিয়ে দিচ্ছিল। যেমন করে হোক এক গোলের 'লীড'টা ধরে রাখতেই

হবে। আরো গোল করতে পারলে ভালই হয়, কিন্তু কোনোভাবেই গোল খাওয়া চলবে না।

হাফ টাইমের পর এক মিনিটের ভেতর গোল পেয়ে গেল 'ইলেভেন বুলেটস'। হারুর থ্রু পাশ থেকে ওদের লেফট উইংয়ের খেলোয়াড় কোনাকুনি গোলে বল ঢুকিয়ে দেয়।

দু গোলে পিছিয়ে থাকার কারণে মাথা গরম হয়ে যায় 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর ছেলেদের। তারা এলোপাথাড়ি ফাউল করতে থাকে।

একবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে ভাল খেলা আর সম্ভব হয় না। মাঠের বাইরে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শান্ত হতে বলছিল অনুপম। কিন্তু কে কার কথা শোনে! হতাশ হয়ে অনুপম দেখতে থাকে, ওর টিমের ভরাডুবি ঘটে যাচ্ছে।

এদিকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলছিল 'ইলেভেন বুলেটস'। তার ফলও তারা পেতে লাগল। রেফারির ফাইনাল হুইসিল বাজার আগে আরো দু'টি গোল দিল তারা। দুটো গোলই হারুর। ফোর-টু-ওয়ানে জিতে গেল 'ইলেভেন বুলেটস'।

'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর সাপোর্টাররা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু 'ইলেভেন বুলেটস'-এর সমর্থকরা চেঁচিয়ে, পটকা ফাটিয়ে বিউগিল বাজিয়ে চারদিক সরগরম করে তুলেছে।

অনুপমকে ঘিরে তার খেলোয়াড়রা এখন মাঠের ধারে মাথা নিচু করে বসে আছে। খানিকটা দূরে 'ইলেভেন বুলেটস'-এর খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে হারুকে নিয়ে তাদের ভীষণ হই চই চলছে। ওদের ভেতর মনোরঞ্জন চৌধুরিকেও দেখা গেল। তিনি বার বার অনুপমের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তবে উঠে এসে কোনো কথা বলেন নি। খুব বুদ্ধিমান লোক তো! তিনি অনুপমের সঙ্গে কথা বললে হারুর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার ভয় আছে।

নিজের টিম হেরে যাওয়ায় মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল অনুপমের। আবার হারুর জন্য চাপা গর্বও হচ্ছিল। প্লেয়ার চিনতে তার ভুল হয় নি।

সন্ধের আগে মন্ত্রীমশাই নিজের হাতে প্রাইজ দিলেন। দুই টিম উইনার্স আর রানার্স-আপের ট্রফি তো পেলই, খেলোয়াড়রা আলাদা আলাদা মেডেল এবং অন্যান্য উপহারও পেল। সব চেয়ে বেশি পুরস্কার পেরেছে হারু। বেস্ট প্লেয়ার, সর্বোচ্চ গোলদাতার কাপ, ইত্যাদি মিলিয়ে সাত আটটা প্রাইজ।

পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেলে 'আজিমপুর স্পোর্টস ক্লাব'-এর প্রেসিডেন্ট অমরনাথ অনুপমকে বলেন, 'আজ রাত্তিরে একবার আমাদের বাড়ি আসবেন। দরকারি কথা আছে।'

অমরনাথ কী কারণে ডেকেছেন, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে অনুপম। বলে 'যাব।'

রাতে অমরনাথের বাড়ি গেলে তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন, 'নিশ্চয়ই হারুকে আপনি 'ইলেভেন বুলেটস'-এ খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন?'

অনুপম এটাই ভেবেছিল। আর যাই হোক, অমরনাথের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয় নি। সে লুকোবার চেষ্টা করে না। স্পষ্ট গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

'আপনি আমাদের খুব ক্ষতি করেছেন।'

'আমি কিন্তু প্রথমে আপনার ক্লাবে হারুকে খেলাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। আপনি কিছুতেই রাজি হলেন না। কমিটি মেম্বাররা আপত্তি করলেন।'

'কেন ওকে নেওয়া সম্ভব হয় নি, আপনাকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি। আমরা নিতে পারি নি বলে ওকে আমাদের শত্রুপক্ষের দলে খেলাবার ব্যবস্থা করে দেবেন, এটা ভাবতে পারিনি। আপনার জন্যে আমরা এবার ট্রফিটা পেলাম না।'

'দেখুন, একটা দুর্দান্ত খেলোয়াড় অকারণে নষ্ট হয়ে যাবে, কল্পনা করা যায় না। তাই আমি ওকে মনোরঞ্জনবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

কড়া গলায় প্রায় ধমকের সুরে এবার অমরনাথ বলেন, 'আপনাকে ট্রফি জেতাবার জন্যে অনেক টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কিনা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ছি, ছি—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অনুপম। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'আপনি কী বলতে চান, বুঝতে পারছি। তার জন্য তৈরিও হয়ে এসেছি। পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে অমরনাথকে দিতে দিতে বলে, 'এটা আমার পদত্যাগ পত্র, কাল সকলেই আমি চলে যাব।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে নিজের সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নবীগঞ্জে সোজা মনোরঞ্জনের বাংলোয় চলে আসে অনুপম। বলে, 'আমি আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

মনোরঞ্জন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'ফিরবেন না মানে! এখনও তো অনেকগুলো টুর্নামেন্ট বাকি। আপনি চলে গেলে ওদের কোচ করাবে কে?'

অনুপম জানায়, সে পদত্যাগ করেছে।

মনোরঞ্জন চমকে ওঠেন, 'সে কী। কেন?'

অনুপম কারণটা জানিয়ে বলে, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।'

মনোরঞ্জন চুপ করে থাকেন।

অনুপম এবার বলে, 'আমি তো চলে যাচ্ছি। কিন্তু হারুর কী হবে, ভেবে পাচ্ছি না।'

মনোরঞ্জন বলে, 'ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। ও হীরের টুকরো ছেলে। হারুর দায়িত্ব আমার, মানে 'ইলেভেন বুলেটস' ক্লাবের।' একটু থেমে বলেন, 'কাল ম্যাচের পর আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করেই কথা বলি নি। এখন বলছি, হারুর মতো একজন খেলোয়াড়কে যে আমাদের দিয়েছেন, সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

হারুর জন্য দুর্ভাবনা কেটে যায় অনুপমের। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সে কলকাতায় যেতে পারবে।

হাতের কাজ

এখন যেটা বাংলাদেশ আটত্রিশ বছর আগে তাকে বলা হতো পূর্ব বাংলা। ভারতবর্ষ ভাগাভাগি হবার পর পূর্ব বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান। তারপর এই সেদিন অনেক লড়াই করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হল। এখন তার নাম বাংলাদেশ। এ-সব ইতিহাস সকলেরই জানা।

আমি যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটা এখনকার বাংলাদেশের নয়, আটত্রিশ বছর আগের পূর্ব বাংলার।

পূর্ব বাংলা জলের দেশ। চারদিকে বিরাট বিরাট সব নদী—পদ্মা, মেঘনা, কালাবদর, ধলেশ্বরী, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতী—এমনি কত যে, তার লেখাজোখা নেই। এ ছাড়া রয়েছে অগুনতি খাল, বিল। নৌকো, স্টিমার বা মোটর লঞ্চ ছাড়া কোথাও এক পা যাবার উপায় নেই।

সেবার আমাদের ছোট্ট শহর রাজদিয়া থেকে 'গয়নার নৌকো'য় উঠেছি। যাব তিনটে নদী পেরিয়ে অনেক দূরে নবাবগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। ওখানে আমার মামার বাড়ি।

আমার বয়স তখন দশ-এগারো, ক্লাস ফাইভে পড়ি।

'গয়নার নৌকো' ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ট্রেন যেমন নানা স্টেশনে থেমে কিছু প্যাসেঞ্জার তুলে, কিছু প্যাসেঞ্জার নামিয়ে চলতে থাকে, 'গয়নার নৌকো'ও অবিকল তা-ই। নদীর পাড়ে এক-একটা ঘাটে থামতে থামতে সেটা এগিয়ে যায়।

রাজদিয়া থেকে উঠেছিলাম সন্ধেবেলায়। সঙ্গে আমার মেজো কাকা। নবাবগঞ্জে পৌঁছতে পৌঁছতে পরের দিন দুপুর হয়ে যাবে। তার মানে সারাটা রাত আমাদের নৌকোতেই কাটাতে হবে।

আমরা যে 'গয়নার নৌকো'টায় উঠেছিলাম সেটা প্রকাণ্ড। মাঝিমাল্লা ছাড়া একশ' জন যাত্রীর তাতে জায়গা হয়ে যায়।

রাজদিয়ায় নৌকোটা ছাড়ার সময় খুব বেশি ভিড়-টিড় ছিল না। সব মিলিয়ে কুড়ি-বাইশ জন প্যাসেঞ্জার।

তখন অঘ্রাণ মাস। আর কিছুদিনের মধ্যেই শীত পড়ে যাবে। খোলা নদীর ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। 'গয়নার নৌকো'র এক কোণে গায়ে চাদর জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছি। মাথার ওপর ছইয়ের সঙ্গে অনেকগুলো বড় বড় হ্যারিকেন বাঁধা রয়েছে। ভেতরে প্রচুর আলো।

মেজো কাকা খুব গম্ভীর মানুষ, রাজদিয়া হাই-স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। বাঘের

মতো মেজাজ। তাঁর দাপটে গোটা স্কুল থরথর করে কাঁপতে থাকে। নৌকোয় উঠেই তিনি ব্যাগ খুলে একখানা মোটা বই খুলে বসেছিলেন। তার আগে শুধু একবার বলেছিলেন, 'কিরে, খিদে পেয়েছে?'

একটা গোটা রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত নৌকোয় থাকতে হবে। তাই বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার-দাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সন্ধেবেলায় রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল না। বললাম, 'না।'

'খিদে পেলে বলিস।'

'আচ্ছা।'

একসময় 'গয়নার নৌকো' ছেড়ে দিল। মাঝিরা তার আগেই পাল খাটিয়ে দিয়েছে। নৌকো নদীর ওপর দিয়ে বিশাল একটা জলপোকার মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে।

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। আকাশে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। কিন্তু সেই অঘ্রাণ মাসে চারপাশে প্রচুর কুয়াশা, তাই জ্যোৎস্নাটা কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে আমার একদম ভাল লাগছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল, বাইরে মাঝিদের কাছে গিয়ে চারপাশের দৃশ্য-টৃশ্য দেখব। ভয়ে ভয়ে সে কথা একবার মেজো কাকাকে বললামও, কিন্তু বই থেকে মুখ তুলে চোখ কুঁচকে এমনভাবে তাকালেন যে ভীষণ দমে গেলাম। মেজো কাকা কড়া গলায় বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবার ইচ্ছে?'

কাজেই ছইয়ের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে যেটুকু চোখে পড়ে, দেখে যাচ্ছিলাম। নদীটা খুব চওড়া। আমাদের নৌকো একটা পাড় ঘেঁষে যাচ্ছিল। এই পাড়ে মাঝে মাঝে ধানখেত আর গাছগাছালির ফাঁকে আবছা আবছা দু-একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্য পাড়টা এত দূরে যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকটা একেবারে ধু-ধু। তবে সারা গায়ে কুয়াশা আর চাঁদের আলো মেখে আমাদের নৌকোর ওপর দিয়ে অনেক রাতজাগা পাখি উড়ে যাচ্ছিল। নদীতে ভুস ভুস করে কত যে শুশুক ভেসে উঠেই তক্ষুণি আবার জলের তলায় অদৃশ্য হচ্ছিল!

আকাশ, নদী, শুশুক, চাঁদের আলো, কুয়াশা—সব মিলিয়ে দারুণ একখানা ছবি। সে সব দেখতে দেখতে চলেছি।

এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পর পর আমাদের 'গয়নার নৌকো' এক-একটা ঘাটে এসে থামছে। কিছু যাত্রী তুলে, কয়েক জনকে নামিয়ে আবার দৌড় লাগাচ্ছে।

দু'তিনটে ঘাট পেরিয়ে যাবার পর মেজো কাকা হাতের বইটা বন্ধ করে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার খেয়ে নেওয়া যাক—কি বলিস?'

এতক্ষণে বেশ খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার-দাবার সঙ্গে করে এনেছিলাম। লুচি, আলু-কপির তরকারি, বেগুনভাজা, ডিমের ডালনা আর চমচম।

আমরা একটা হোল্ড-অলে কম্বল বালিশ-টালিশ নিয়ে এসেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে মেজোকাকা বিছানা পাতছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করছি — এই সময় 'গয়নার

নৌকো'টা আরেকটা ঘাটে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বেশ কিছু লোকজন উঠে পড়ল। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এরা ভীষণ গরিব। পরনে তালিমারা ধুতি বা লুঙ্গি, আর বহুকালের ধুদ্ধুরে পুরনো নোংরা জামা। তার ওপর জ্যালজেলে পাতলা চাদর জড়ানো। কারো পায়েই জুতো-টুতো নেই। সবার গালেই খাপচা খাপচা দাড়ি, এলোমেলো চুল।

যে নৌকোয় একশ' জন ধরে সেখানে এখন প্রায় দেড়শ' লোক। মাঝিরা এবং অন্য যাত্রীরা তাদের অনেক করে বোঝালো, 'তোমরা কয়েকজন নেমে যাও, নইলে নৌকো ডুবে যাবে।'

কে কার কথা শোনে। খানিকক্ষণ হইচই চেঁচামেচি চলল, কিন্তু কাউকেই নামানো গেল না। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত মাঝিদের নৌকো ছেড়ে দিতে হল।

এদিকে আমরা যে তোফা একটা ঘুম লাগিয়ে নৌকোয় রাত কাটিয়ে দেব, তার আর উপায় রইল না। তাড়াতাড়ি বিছানা-টিছানা গুটিয়ে আবার হোল্ড-অলে পুরে ফেলা হল।

ঘুমোতে তো পারবই না, একটু আরাম করে যে বসে যাব, তেমন জায়গাও নেই। গাদাগাদি ভিড়ে কোনোরকমে হাত-পা বুকের ভেতর গুঁজে গুটিসুটি মেরে মেজো কাকা আর আমি বসে আছি। অন্য সবারও একই অবস্থা। কোথাও আর ইঞ্চি ফাঁক নেই।

নতুন যে লোকগুলো উঠেছে, তারা নিজেদের মধ্যে কী সব পরামর্শ করছিল। কথা শুনে মনে হল, ওরা সব চাষী, নিজেদের জমি-টমি নেই, অন্যের জমিতে মজুরি নিয়ে কাজ করে। এখন তারা ধান কাটতে যাচ্ছে নবাবগঞ্জে, অর্থাৎ কিনা আমার মামারবাড়ির দেশে।

কিছুক্ষণ পর আরেকটা ঘাট এসে গেল। নৌকোটা ভিড়তে না ভিড়তেই হুলস্থূল কাণ্ড। বোঝা যাচ্ছে, আরো নতুন লোক উঠছে।

'গয়নার নৌকো'টা আগাপাশতলা বোঝাই হয়ে আছে। এর ওপর একটা মাছি উঠলেও সবসুদ্ধ জলের তলায় চলে যেতে হবে।

কিন্তু যারা উঠল তাদের ঠেকানো যায় না। তারা হল একজন ছোট দারোগা, চারজন কনস্টেবল এবং একটি চোর।

ছোট দারোগার বিরাট মুখ, বিশাল গোঁফ আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। পরনে খাকি হাফ শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত খাকিরই হাফ প্যান্ট। তলার দিকে প্যান্টটার মস্ত ঘের, তার ফাঁক দিয়ে সরু সরু লিকলিকে দু'টো পা নেমে এসেছে। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট আর পায়ে জবরদস্ত বুট।

ছোট দারোগাকে দেখে মনে মনে ফিক করে হেসে ফেললাম। ওইরকম রোগা রোগা পায়ের লোকটা তিন মণ ওজনের একটা শরীর বয়ে বেড়ায় কী করে?

ছোট দারোগার মতো অত বড় মাপের না হলেও চার কনেস্টবলেরও ভুঁড়ি এবং গোঁফের বাহার আছে। তাদের সবার কাঁধেই রাইফেল বাঁধা এবং গলায় টোটার মালা।

এদের মধ্যে সব চাইতে দর্শনীয় হল চোরটা। রোগা টিন্‌টিনে ফড়িঙের মতো চেহারা! মাথায় খাড়া খাড়া চুল, গোল চোখ, চোখা থুতনি। লোকটার চোখ সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরছে।

চোরটার দু'হাতে লোহার হ্যান্ড-কাফ, কোমরটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই দড়ির একটা মাথা একজন কনস্টেবলের হাতে।

দারোগা-পুলিশ দেখে সবাই তটস্থ, কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। নৌকো ডুবে তলিয়ে যাক, তবু তাদের নেমে যেতে বলার সাহস কারো নেই।

ছোট দারোগা এদিক সেদিক তাকিয়ে পছন্দমতো একটু জায়গা খুঁজছিল, হঠাৎ মেজোকাকাকে দেখতে পেল সে। বেশ খুশি হয়েই বলল, 'মাস্টারমশাই যে—'

মেজোকাকা বললেন, 'আরে সমাদ্দার সাহেব, আপনি এখানে!'

'এসে বলছি।' বলেই যে সব চাষী টাষীরা দম আটকে বসে ছিল তাদের দিকে ফিরে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ল ছোট দারোগা বা সমাদ্দার সাহেব, 'অ্যাই, তোরা সরে সরে বস, যাবার জায়গা দে।'

চাষীরা নিজেদের শরীরগুলো কুঁকড়ে এই অত্তোটুকু রাস্তা বানিয়ে দিল। ছোট দারোগা চোর এবং কনস্টেবলদের নিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। তারপর সে নিজে বসল মেজো কাকার গা ঘেঁষে, চোর আর কনস্টেবলরা চাষীদের ভেতর জায়গা করে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে বসল। চোরের কোমরের দড়িটা সেই কনস্টেবলটার হাতেই থেকে গেল।

ছোট দারোগা বলল, 'আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। আপনার মতো পণ্ডিত লোকের দেখা পেয়ে বড় ভাল লাগছে। দিন রাত চোর-ছ্যাঁচড় ঘেঁটে ঘেঁটে মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। তা চললেন কোথায় মাস্টারমশাই?'

বুঝতে পারছিলাম ছোট দারোগার সঙ্গে মেজো কাকার জানাশোনা আছে। আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে নিয়ে নবাবগঞ্জে ওর মামার বাড়ি যাচ্ছি।'

'ছেলেটি কে?'

'আমার ভাই-পো।'

মামাবাড়ি কেন যাচ্ছি, এ নিয়ে ছোট দারোগা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মেজো কাকা এবার হেসে হেসে বললেন, 'এত রাত্তিরে এই বাহিনী নিয়ে চললেন কোথায়?'

'হবিবপুরে। যা একখানা চাকরি জুটেছে তাতে রাতবিরেত বলে কিছু নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি।' একটু থেমে ফের বলল, 'তিন বছর একটানা কাজ করছি। কাল ভেবেছিলাম মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কোথাও একটু বিশ্রাম করব, কিন্তু ওই ব্যাটার জন্যে সব প্ল্যানের বারোটা বেজে গেল।' বলে আঙুল বাড়িয়ে চোরটাকে দেখিয়ে দিল।

একটা চোর কীভাবে ছোট দারোগার ছুটি বানচাল করে দিল, বুঝতে না পেরে মেজো কাকা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেজো কাকার মনের কথাটা যেন ধরতে পারল ছোট দারোগা। বলল, 'ওই ব্যাটা বিখ্যাত চোর। ওর নাম যুধিষ্ঠির।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই হ্যান্ডকাফ-পরা হাত দুটো জোড় করে যুধিষ্ঠির বলল, 'চোর ছিলাম ছোট সাহেব। এখন তো একরকম সাধুই হয়ে গেছি।'

জবরজং মোটা গোঁফে চাড়া দিয়ে সস্নেহে চোরটাকে দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল ছোট দারোগা, 'তা বটে, তা বটে। ব্যাটা একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরই বনে গেছে। কিন্তু মাস্টারমশাই, ওর লাইফ হিস্ট্রি যদি শোনেন আপনার মাথার ভেতর বাঁই বাঁই করে দশখানা নাগরদোলা ঘুরতে থাকবে।'

মেজো কাকার মজাও লাগছিল, আবার কৌতূহলও হচ্ছিল ভীষণ। বললেন, 'কিরকম?'

ছোট দারোগা এর পর যা বলে গেল তা এইরকম। ভূ-ভারতে যুধিষ্ঠিরের মতো চোর নাকি আর একটাও জন্মায়নি। পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীতে যত স্টিমার, মোটর লঞ্চ আর 'গয়নার নৌকো' যায় তার যাত্রীদের রক্ষে নেই। যুধিষ্ঠির তাদের সব লোপাট করে দেয়।

কান খাড়া করে শুনে যাচ্ছিল যুধিষ্ঠির। সে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে, কাঁচুমাচু মুখ করে ছোট দারোগার একটা ভুল শুধরে দিল, 'ওসব তিন বছর আগের কথা ছোট সাহেব। এখন তো আমি সাধুই হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—' ঘাড়টা সামনে পেছনে নাচাতে নাচাতে ছোট দারোগা বলল, 'তিন বছর আগের কথাই এ সব। — তারপর শুনুন মাস্টারমশাই। যুধিষ্ঠির ব্যাটার হাতের কাজ ছিল দারুণ সূক্ষ্ম। আপনার সঙ্গে কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ একসময় দেখলেন ও সামনে নেই। সেই সঙ্গে আপনার বোতাম আর ঘড়ি লোপাট হয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে আমার চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল। মেজো কাকা সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'বলেন কি সমাদ্দার সাহেব!'

'ঠিকই বলি মাস্টারমশাই। ব্যাটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিসিয়ান। ওর কাণ্ডকারখানা লিখলে বাইশখানা মহাভারত হয়ে যাবে।'

চোখেমুখে গর্ব গর্ব একটা ভাব ফুটিয়ে যুধিষ্ঠির তাকিয়ে ছিল। এবার সে বলল, 'সেই বউটার কথা এঁদের বলুন ছোট সাহেব।'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করে ছোট দারোগা বলতে লাগল, 'ব্যাটার হাতের কাজ যে কতটা ফাইন এই ব্যাপারটা থেকে বুঝতে পারবেন। সেবারে মুন্সিগঞ্জের স্টিমারঘাটা থেকে গোয়ালন্দের স্টিমার ছাড়বে ছাড়বে করছে। প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই উঠে পড়েছে। শুধু একটি বউ বাকি। যে কাঠের পাটাতন দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা জেটি থেকে স্টিমারে ওঠে, বউটা ছুটতে ছুটতে তার ওপর দিয়ে আসছিল। দু'পা গেলেই সে উঠতে পারবে কিন্তু তার আগেই স্টিমার ছেড়ে দেবার ঘণ্টি বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জেটির খালাসিরা পাটাতন ধরে দিয়েছে টান। বউটি হুড়মুড় করে জলেই পড়ে যেত। স্টিমারের ভেতরে গেটের কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল যুধিষ্ঠির, হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে এক টানে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বউটি কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে, ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে দেখল তার আঙুলের দু'টো আংটি সুদ্ধু উধাও হয়ে গেছে যুধিষ্ঠির। তক্ষুণি যুধিষ্ঠিরের খোঁজে দলে দলে প্যাসেঞ্জাররা রে রে করে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা মিলল না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।

খুশিতে এবং গর্বে যুধিষ্ঠিরের চোখ চক চক করছিল। সে বলল, 'একবার নরসিংপুরের জমিদারের টাকার ব্যাগ কেমন করে হাত সাফাই করেছিলাম, সেটা বলুন ছোট সাহেব।'

ছোট দারোগা দু'হাত তুলে, শরীরটা বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর আঙুল ফোটাতে ফোটাতে হেসে হেসে বলল, 'আর পারি না রে ব্যাটা। তোর কীর্তিকলাপ বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।'

মেজো কাকা সেই কথাটা ভোলেননি। বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের হাত-সাফাইয়ের অনেক গল্পই তো করলেন। কিন্তু ও কীভাবে আপনাকে ছুটি নিতে দিল না সেটা কিন্তু বলেননি।'

ছোট দারোগা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে তাই তো, দাঁড়ান দাঁড়ান, বলছি। জানেন মাস্টারমশাই, যুধিষ্ঠির তো হাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার টিকি ছোঁবার যো নেই। বজ্জাতটা একেবারে ইন্দ্রজাল জানে মশাই। এই হয়তো তাকে দেখা গেল, এই নেই। এদিকে তার নামে থানায় রোজ গণ্ডা গণ্ডা ডাইরি যাচ্ছে। এস. পি থেকে পুলিশের বড় বড় কর্তারা ওকে অ্যারেস্ট করার জন্যে জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে ছাড়ছে। উল্লুকটার জন্যে মনে আর সুখ নেই।

'তারপর ব্যাটার কপাল। একদিন ধরা পড়ে মাধবগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট জেলে চলে গেল। পাক্কা তিন বছরের জেল। এ অঞ্চলের লোকের হাড় জুড়লো মশাই।' ছোট দারোগা বলতে লাগল, 'কাল যখন ছুটির দরখাস্ত দিতে যাব তখন ও. সি বললেন, যুধিষ্ঠিরের জেল খাটার মেয়াদ শেষ হয়েছে। ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ও.সি'র বাতের ব্যথাটা ভীষণ বেড়েছে। তাই আমাকে হাত ধরে বিশেষ করে রিকোয়েস্ট করলেন যাতে মাধবপুর থেকে যুধিষ্ঠিরকে হবিবপুরে নিয়ে যাই। ওখান থেকেই ওকে কিছু সই-টই করিয়ে মুক্তি দেওয়া হবে। ওকে ও. সি'র কাছে পৌঁছে দিলেই আমার কাজ শেষ। কাল থেকে আমি ছুটি পাব।'

এই সময় যুধিষ্ঠির বলে উঠল, 'তিন বছর আগের কথাই খালি বলে গেলেন ছোট সাহেব। মাঝখানের ব্যাপার-স্যাপার তো মাস্টারমশাইকে কিছুই জানালেন না।'

ছোট দারোগা নড়েচড়ে বসল। মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'আরে তাই তো, আসল কথাটাই বলা হয়নি। তিন বছর জেল খেটে ওই ঘাগী জাঁহাবাজ যুধিষ্ঠির পুরোপুরি বদলে গেছে। কি রে, বদলাসনি?'

মাথাটা ডান দিকে দু ফুট হেলিয়ে যুধিষ্ঠির বলল, 'তা আর বদলাইনি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে পালটে গেছি। আমার ভেতর একটা ভক্তি ভাব এসে গেছে, পাপ কাজে এখন বড্ড ঘেন্না লাগে।'

ছোট দারোগা বলল, 'মাধবপুর জেলের জেলারের কাছে শুনলাম, দিনরাত যুধিষ্ঠির নাকি আজকাল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বা 'মা কালী মা কালী' করছে। ব্যাটা সত্যিকারের ধম্মপুত্তুর বনে গেছে। আখের কলে যেমন রসটুকু বার করে ছিবড়েটা ফেলে দেয়, তেমনি তিন বছর ঘানি ঘুরিয়ে ওর বডি থেকে সব খারাপ জিনিস বেরিয়ে গেছে। —না কি বলিস রে ব্যাটা?' বলে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকালো।

যুধিষ্ঠির তক্ষুণি সায় দিল, 'ঠিক বলেছেন ছোট সাহেব। জেলে আমার সঙ্গে আর যে সব চোর ডাকাত খুনী ছ্যাঁচোড়রা ছিল তারা তো আমাকে মহাপুরুষ বলতে শুরু করেছিল।' বলতে বলতে বিনয়ে মাথা নুইয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'আমি অবিশ্যি অতটা এখনও হইনি। তবে আপনাদের আশীর্ব্বাদ পেলে —' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল।

ছোট দারোগা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আশীর্বাদ না হয় দেওয়া যাবে। এখন একটা কথা মন খুলে বল। জেল থেকে তো বেরিয়ে এলি, আবার আগের মতো হাতের কাজ শুরু করবি না কি?'

যুধিষ্ঠির শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, 'আপনিই বললেন আমি ধম্মপুত্তুর হয়ে গেছি, আবার এখন এ কী বলছেন! যে সাধুমহাত্মা হয়ে হিমালয়ে চলে যাবে তার এ সব শোনাও পাপ।' বলতে বলতে মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল যুধিষ্ঠিরের।

ছোট দারোগা হাত তুলে বলল, 'আহা, কাঁদিস না ব্যাটা, কাঁদিস না। ঠাট্টাও বুঝিস না?'

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে যুধিষ্ঠির বলল, 'কবে ওসব করেছি, এখন কি তার কায়দা-টায়দা মনে আছে? অভ্যেস না থাকলে সূক্ষ্ম হাতের কাজ করা যায়?'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করল ছোট দারোগা। এদিকে রাত আরো বেড়েছে। সবার চোখ বুজে আসছে; কথা বলতে বলতে ছোট দারোগার গলা জড়িয়ে এল। একসময় বসে বসেই ঢুলতে লাগল সে, সঙ্গে সঙ্গে নাকের ডাক শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকোর একটা লোকও আর জেগে রইল না। চার কনস্টেবল, যুধিষ্ঠির এবং অন্য যাত্রীরা—সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এ ওর ঘাড়ে পড়ছে।

ট্রেনে, স্টিমারে বা নৌকোয় উঠলে সহজে আমার ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পর আমার চোখও জুড়ে আসতে লাগল। তার মধ্যে আবছা আবছা দেখতে পেলাম, নৌকোয় যত লোক আছে তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি ঢুলছে যুধিষ্ঠির। ঢুলতে ঢুলতে তার চারপাশে যত চাষী-টাষী রয়েছে সবার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে সে। তাদের সঙ্গে ওর মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে।

ভোর রাত্তিরে, তখনও বেশ অন্ধকার আছে, যুধিষ্ঠির এবং কনস্টেবলদের নিয়ে হবিবপুরে নেমে গেল ছোট দারোগা। 'গয়নার নৌকো'র যাত্রীদের কারো ঘুম ভাঙেনি তখন পর্যন্ত। সবাই জড়াজড়ি করে ঢুলছে।

আরো দু'ঘণ্টা পর কুয়াশা আর অন্ধকার কেটে গেল। ঝলমলে সোনালি রোদে চারদিক ভেসে যেতে লাগল। এই সময় 'গয়নার নৌকো'টা পেয়ারাতলির ঘাটে এসে ভিড়ল। এরপর চার-পাঁচ ঘণ্টা কোথাও আর না থেমে দুপুরবেলা সোজা নবাবগঞ্জে গিয়ে ভিড়বে। তার মানে যাদের সঙ্গে খাবার-দাবার নেই, পেয়ারাতলি থেকে কিছু চিঁড়ে মুড়ি-টুড়ি কিনে না নিলে দুপুর পর্যন্ত তাদের উপোস দিয়ে থাকতে হবে।

আমাদের সঙ্গে লুচি মিষ্টি-টিষ্টি আছে। কিন্তু যে চাষীরা নবাবগঞ্জে ধান কাটতে যাচ্ছে তাদের কয়েকজন মুড়িটুড়ি কিনবার জন্যে জামার পকেট বা লুঙ্গির কষি থেকে পয়সা বার করতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপরই একসঙ্গে তারস্বরে মড়াকান্না জুড়ে দিল।

হঠাৎ কী হল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকগুলোকে থামানোও যাচ্ছে না। মেজো কাকা সমানে বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের, কী হয়েছে?'

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর চাষীরা জানালো, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রাস্তায় খরচের জন্য পাঁচ সাতটা করে টাকা সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু সেই টাকা পাওয়া যাচ্ছে না—সব চুরি হয়ে গেছে। এখন তারা কী করবে?

মেজো কাকা তাদের সবাইকে দু'টো করে টাকা দিয়ে বললেন, 'যাও, কিছু কিনে-টিনে আনো।'

এদিকে আমার মাথার ভেতর বন বন করে একটা চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। মনে পড়ছে, যাদের টাকা চুরি হয়েছে তাদের মধ্যেই কাল রাত্তিরে গাদাগাদি করে বসে ছিল যুধিষ্ঠির। ঘুমের ঘোরে আমার চোখে পড়ছিল, ঢুলতে ঢুলতে সে ওদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। তখন বুঝতে পারিনি, যুধিষ্ঠির কী করছে।

হাতে হ্যান্ড-কাফ, কোমরে দড়ি, চারপাশে দারোগা-পুলিশের-পাহারা, এর মধ্যেই যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে দিয়েছে সে কত বড় ম্যাজিসিয়ান। তিন বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে যখন তার ভেতর থেকে সব খারাপ জিনিস বেরিয়ে গেছে, যখন সে সাধু মহারাজ হতে যাচ্ছে, সেই সময় সূক্ষ্ম একটি হাতের কাজ দেখিয়ে আমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে যুধিষ্ঠির।

একটি থাপ্পড় এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা ছোট্ট ভূমিকা করে নেওয়া যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে গেছে। তোজোর ঝটিকা বাহিনী দশ দিগন্ত তোলপাড় করে ধেয়ে আসছে বার্মার দিকে। বার্মার পরের টার্গেট কলকাতা। মিত্রবাহিনী বেধড়ক পিটুনি খেতে খেতে ক্রমাগত পিছু হটছে। ওরা ভাঙে, তবু মচকায় না। খবরের কাগজ রোজ তাদের যে সামরিক বুলেটিন ছাপে তাতে লেখা থাকে 'সাকসেসফুল রিট্রিট' অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। অল ইন্ডিয়া রেডিও'তেও তারস্বরে একই প্রচার।

কলকাতা তখন ব্রিটিশ আর আমেরিকান টমিতে টমিতে ছয়লাপ। দিবারাত্রি মিলিটারি জিপ আর ট্রাক সারা শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেনাবাহিনীর জন্য রাতারাতি তৈরি হচ্ছে লম্বা লম্বা ব্যারাক, হাসপাতাল, নানা ধরনের অফিস।

শহরের বিশাল বিশাল বাড়িগুলোর সামনে উঁচু উঁচু ব্যাফল ওয়াল আর বালির বস্তার পাহাড়। প্রতিটি পার্ক খুঁড়ে কত যে ট্রেঞ্চ! মুহুর্মুহু বেজে ওঠে সাইরেন। এ আর পি'র দল ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় লোকজন দেখলে লাঠি উঁচিয়ে কাছাকাছি কোনও বাড়িতে কিংবা ট্রেঞ্চে ঢুকিয়ে দেয়।

দিনের বেলাতেই যা কিছু ব্যস্ততা। কর্মচাঞ্চল্য। রাত্তিরে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না। সন্ধের পর থেকেই ব্ল্যাক আউট। কর্পোরেশনের বাড়িগুলোতে হয় ঠুলি পরানো, নইলে নিচের দিকে একটুখানি ফাঁক রেখে বাকি অংশটায় পুরু করে আলকাতরা লেপা। ফলে যে আলোটুকু পাওয়া যায় তাতে কিছুই চোখে পড়ে না। প্রতিটি বাড়ি দোকান, রেস্তোরাঁয় এমনভাবে লাইট জ্বালতে হয় যাতে বাইরে থেকে অলো দেখা না যায়। মহাশূন্য থেকে জাপানি বোমারু বিমানগুলো যেন টের না পায় এখানেই রয়েছে কলকাতা নামের শহরটি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরের সেই সময় জড়সড়, ভুতুড়ে চেহারা।

জাপানি বোমার আতঙ্কে তখন কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক পড়ে গেছে। হাওড়া এবং শিয়ালদায় টিকেটের জন্য মাইলখানেক করে লম্বা হাইন। বিহার আর উত্তর ভারতের লোকেরা ট্রেনের আশায় বসে নেই। লরি, গরুর গাড়ি, মোটর গাড়ি, যে যা জোটাতে পেরেছে তার ওপর মালপত্রসুদ্ধু বউ বাচ্চাকাচ্চা চাপিয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেছে। চাচা, আগে প্রাণ বাঁচা।

ঠিক এমন এক অস্থির সময়ে ঢাকা জেলার নগণ্য এক শহর থেকে দূর সম্পর্কের এক মামার সঙ্গে কলকাতায় এলাম। আমার বয়স তখন নয় কি দশ। মামা আর আমি ছাড়া আরও একজন এসেছেন। তিনি মামার বাবা অর্থাৎ আমার দাদু। দাদু কী এক জটিল অসুখে ভুগছিলেন। আমাদের সেই ছোট শহরের ডাক্তার বদ্যিরা গাদা গাদা বড়ি আর মিক্সচার খাইয়ে, প্রচুর ইঞ্জেকশান দিয়ে হয়রান হয়ে গেছে কিন্তু রোগ যেমনকে তেমন। ভাল হবার লক্ষণ নেই। উদ্বিগ্ন মামার ইচ্ছা, ডাক্তার বিধান রায়কে দিয়ে একবার দাদুকে দেখানো। কলকাতায় চেনাজানা কাকে যেন চিঠি লিখেছিলেন। তিনি ভরসা দিয়েছেন, ডাক্তার রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবেন। সেই জন্যই কলকাতায় আসা। মামার উদ্দেশ্য দাদুর রোগ সারানো। আমার উদ্দেশ্য কলকাতা দর্শন।

আমরা উঠেছিলাম ভবানীপুরে, ইন্দ্র রায় রোডে, এক আত্মীয়র ভাড়া বাড়িতে। আত্মীয়টি নিঃসন্তান। এদিকে মামা তাঁর সেই পরিচিত ভদ্রলোকটিকে নিয়ে ডাক্তার রায়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করছেন। আত্মীয়র বাসায় সমবয়সী খেলার সঙ্গী না থাকায় আমার মনমরা হয়ে থাকার কথা। কিন্তু অচিরেই মনঃকষ্ট কেটে গেল। ওই বাড়িতেই আর এক ভাড়াটে ছিলেন। নাম রবিন দাস। তাঁর তিন ছেলেমেয়ে। মেয়েটি বড়, নাম মিনু। তারপর দুই যমজ ছেলে — গণেশ আর কার্তিক। এই জোড়া ভাই আমারই বয়সী। রবিন দাস এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ। তাঁরা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। আমি ওঁদের ছেলেমেয়ের ঝাঁকে মিশে গেলাম।

রবিন দাস ছিলেন দারুণ ফূর্তিবাজ, আমুদে। বয়স তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ। একহারা চেহারা, ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। কোঁচা পকেটে গোঁজা। পায়ে চপ্পল। যদুবাবুর বাজারের কাছে তাঁর কাপড়ের দোকান। ওঁদের আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। ক'বছর কলকাতায় আছেন কিন্তু তাঁর পরিবারের কেউ ঢাকাইয়া ডায়ালেক্ট ছাড়া কথা বলত না। সেই যুদ্ধের আমলে কলকাতা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু ওঁরা শহর ছেড়ে দেশে চলে যাননি।

আমরা কলকাতায় আসার দিন তিনেক পর সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই কানে এল রবিন দাসদের পরিবারে তুমুল হই চই চলছে।

রবিন দাস এবং তাঁর স্ত্রীকে কাকা-কাকিমা বলতাম। এক দৌড়ে ওঁদের ঘরে গিয়ে দেখি এই সাত সকালে রবিন কাকার স্নান হয়ে গেছে। পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবিও পরে নিয়েছেন। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে 'মা' 'মা' করে যাচ্ছেন। তাঁর তিন ছেলেমেয়েও বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মাতৃনাম জপ করছে। এই মা'টি যে কে, বুঝতে পারছি না।

কাকিমা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতজোড় করে চোখ বুজে তিনিও 'মা' 'মা' করে চলেছেন। তবে অনেক নিচু গলায়।

চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল। কাকা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর অদৃশ্য মায়ের নামে ডাক ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেলেন।

কাকিমা ততক্ষণে চোখ মেলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রবিন কাকা কই গেল?'

কাকিমা বললেন, 'কালীঘাটে। মায়ের মন্দিরে।'

'ক্যান?'

'পূজা দিতে। আইজ ইস্টবেঙ্গলের খেলা আছে না?'

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকল না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

ঘন্টাদেড়েক পর রবিন কাকা ফিরে এলেন। তাঁর কপালে সিঁদুরের মস্ত টিপ। হাতে বড় ডালায় প্রচুর প্যাঁড়া, জবাফুল আর একটা শালপাতায় অনেকখানি গোলা সিঁদুর। বাড়ির সবাইকে, এমনকি আমার সেই আত্মীয়দেরও কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম শোনছস?'

আমি ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকালাম। শুনিনি।

কী যে তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল রবিন কাকার চোখেমুখে, বলে বোঝানো যায় না। ধিক্কারের সুরে বললেন, 'কুলাঙ্গার! অকালকুষ্মান্ড। ঢাকার পোলা হইয়া বাঙ্গালগো নাম ডুবালি।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম না-শোনাটা যে কত বড় মহাপাতক, হাত-পা ঝাঁকিয়ে সেটা সবিস্তার বুঝিয়ে দিলেন। উগরে দিতে লাগলেন প্রচন্ড ক্ষোভ আর ক্রোধ।

আমি আর কী করতে পারি, অপরিসীম গ্লানি কাঁধে চাপিয়ে হেঁটমুন্ডে বসে থাকি।

এবার রবিন কাকার হয়তো করুণাই হয়। বুঝতে পারেন, খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে নরম সুরে বলেন, 'পোলাপান মানুষ তুই। রাগের মাথায় বকাবকিটা ইট্টু বেশিই কইরা ফালাইছি। মন খারাপ করিস না।' একটু ভেবে ফের বললেন, 'ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে কার্তিক-গণেশারে মাঠে লইয়া যাই। আইজ তরেও নিমু। নিজের চোখে দেখলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মর্মখান বুঝতে পারবি।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর রবিন কাকা তাঁর দুই ছেলে এবং আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তখন কলকাতায় এত লোকজনের ভিড় ছিল না। তা ছাড়া জাপানিদের ভয়ে শহর আধাআধি খালি হয়ে গেছে। প্রায় ফাঁকা ট্রামে আমরা ধর্মতলায় পৌঁছে গেলাম। তারপর বিশার গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। এত বড় ময়দান আগে আর কখনও দেখিনি। আমার চোখ বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে গেল।

হাঁটছি তো হাঁটছিই। মিনিট পনেরো চলার পর কাঠের উঁচু উঁচু তক্তা দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে এলেন রবিন কাকা। সেটার গায়ে সারি সারি টিকেট কাউন্টার। প্রতিটি কাউন্টারের সামনে লাইন। ঘোড় সওয়ার পুলিশরা ঘোড়া দাবড়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে করতে লাইনের ওপর নজর রাখছে।

রবিন কাকা জানালেন, ওই ঘেরা জায়গাটায় খেলা হবে। টিকেট মাথাপিছু চার আনা, এখনকার হিসেবে পঁচিশ পয়সা। তাঁর হাতে ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরনো ঢাউস একটা রিস্ট ওয়াচ। সেটা দেখে বললেন, 'হপায় (সবে) পৌনে তিনটা। খেলা আরম্ভ হইতে দেরি আছে। এতখানি হাটাইয়া আনছি। আগে কিছু খাইয়া ল (নে)।' তিনি আমাদের মশলামুড়ি, ফুচকা আর আইসক্রিম খাওয়ালেন। তারপর লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কেটে ঘেরা জায়গাটার ভেতরে নিয়ে গেলেন। চারপাশ দেখে আমার তাক লেগে গেল।

মাঝখানে সবুজ মখমলের মতো প্রকান্ড মাঠ। তিন দিক ঘিরে সারি সারি গ্যালারি, ওপর থেকে ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে। একটা দিকে গ্যালারি নেই। সেখানে বুক সমান হাইটের পুরু, মজবুত তক্তা পুঁতে তার ওপর তারকাঁটার বেড়া।

আমাদের ঢাকা জেলার সেই ছোট্ট শহরে হাই স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা এবড়ো খেবড়ো মাঠে ফুটবল পিটত। মাঝে মাঝে অন্য শহরের কোনও স্কুল টিম এসে তাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলে যেত। আমরা ছোটরা ফুটবলের ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পেতাম না। ফুটবলের বদলে কাঁচা জম্বুরা (বাতাবি লেবু) পিটিয়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতাম।

কলকাতার এই চমৎকার মাঠ, গ্যালারি ভর্তি দর্শক, টিকেট কেটে খেলা দেখা—সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো।

পাঁচটা বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। দুই দল মাঠে নেমে পড়ল। একদিকে লাল হলুদ জার্সি পরা দশ জন আর গোলকিপারটির গায়ে ফুল হাতা স্পোর্টস গেঞ্জি। রবিন কাকা বললেন, 'এই হইল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।' অন্য দলটির পরিচয়ও দিলেন — ভবানীপুর। ভবানীপুর সে সময় ছিল দুর্ধর্ষ টিম। তাদের জার্সির রং এতকাল পর আর মনে নেই।

পাঁচটা নাগাদ খেলা শুরু হল। একবার ভাবানীপুর এগিয়ে যায়। পরক্ষণে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল যখন ভবানীপুরের ডিফেন্স ভেদ করে গোলে হানা দেয়, সারা মাঠে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। তখন তুমুল উত্তেজনা। কয়েক হাজার মানুষের চিৎকারে আকাশ চৌচির হয়ে যেতে থাকে।

এইভাবেই খেলা চলছিল। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। তিনচারটে ভাল চান্স নষ্ট করার পর আচমকা লাল হলুদ বাহিনী একটা গোল খেয়ে গেল। লহমায় সারা মাঠ জুড়ে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসে। বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশ খান খান হয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে।

গোল হলে হাততালি দিতে হয়, এটাই এতদিন জেনে এসেছি। আমিও তালি বাজাতে লাগলাম। হঠাৎ গালে বিরাশি সিক্কার একখানা থাপ্পড় এসে পড়ল। গ্যালারির মাথা থেকে উড়ে পাঁচ ধাপ নিচে গিয়ে পড়লাম। মাথা দাঁত চোয়াল, সব ঝনঝন করছে। চোখের সামনে সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে।

চড়টা কষিয়েছেন রবিন কাকা। তিনিও লাফাতে লাফাতে আমার কাছে নেমে এসেছেন। একেবারে অগ্নিমূর্তি। রাগে ফুঁসছেন।

স্নেহশীল মানুষটা পলকে এতটা বদলে যেতে পারেন, ভাবতে পারিনি। ভয়ে আমি একেবারে কুঁকড়ে গেছি।

রবিন কাকা আরও একটা চড় মারার জন্য হাত তুলেছিলেন। মুখের কাছে হাত এনে ত্রস্ত সুর বললাম, 'মারেন ক্যান?'

রবিন কাকার রোষ কমেনি। মুখ ভেংচে বললেন, 'মারুম না? হারামজাদা বান্দর, ভবানীপুর গোল দেয় আর তুমি হাততালি মার!'

'তয় (তা হলে) কারা গোল দিলে তালি দিমু?'

'উই লাল হলুদ।'

সেদিন ইস্টবেঙ্গল খুব সম্ভব ২-১ গোলে জিতেছিল। প্রিয় ক্লাবের জয়ে খুশি হয়েছিলেন রবিন কাকা। ফেরার পথে আমাকে খুব আদর করলেন। আগের রাগ আর ছিল না। গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'গালে খুনি লাগছে?'

জোরে জোরে ঘাড় নাড়লাম, 'হ।'

'তহন আমার মাথায় খুন চাইপা গেছিল। সোনা মানিক, কাকার উপুর রাগ কইরা থাকিস না। তরে একদিন অনাদি ক্যাবিনে নিয়া মুগলাই পরটা আর মাংস খাওয়াইয়া আনুম। ভিক্টোরিয়া ম্যামোরিয়াল, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা দেখামু।'

আমার আর দুঃখ রইল না।

রবিন কাকা বলতে লাগলেন, 'একখান কথা মনে রাখিস। লাল হলুদ যহন গোল দিব, দশখান হাততালি দিবি। আর হ, মুহন বাগানের নাম শোনছস?'

'না।'

'হেগো (তাদের) জার্সির রং সবুজ আর ম্যারুন। ইস্টবেঙ্গল যদিন সবুজ ম্যারুনরে গোল দেয়, দশখানের জাগায় (জায়গায়) বিশখান তালি বাজাবি।'

এর কয়েক দিন বাদে দাদুকে ডাক্তার বিধান রায়কে দেখানো হলে আমরা দেশে ফিরে গিয়েছিলাম। রবিন কাকার সঙ্গে পরে আর কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু সেদিন তাঁর একটি চাপটাঘাতে আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হয়ে গেলাম। বাকি জীবন তাই থাকব। সারা ভারতের ফুটবল মাঠগুলোতে লাল হলুদ ছাড়া অন্য কোনও রং রাজত্ব করুক, আমি তা ভাবতেই পারি না। তবে অন্য দল, বিশেষ করে বাংলার টিমগুলো ভাল খেললে তাদেরও যথেষ্ট তারিফ করি।

বাবুন ও ডাকাতের দল

তিন দিন হল পুজোর ছুটি পড়েছে। অথচ এখনও নতুন জামা প্যান্ট জুতো টুতো, কিছুই কেনা হয় নি বাবুনের। তার ভালো নাম সায়ন্তন বসু। কলকাতার একটা সেরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। গেল এপ্রিলে বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিয়েছে।

লেখাপড়ায় বেশ ভালো। ফার্স্ট টার্মিনাল, হাফ ইয়ার্লি কি অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে দেখা যায়, প্রথম পাঁচ জনের ভিতর বাবুনের নামটাও আছে। শুধু পড়ার বইয়ের মধ্যেই দিনরাত মুখ গুঁজে পড়ে থাকে না সে। চমৎকার ক্যারাটে জানে। ডিবেটে ইন্টার-স্কুল চ্যাম্পিয়ন। তার আরেকটা বড় গুণও আছে। সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। একটা নাম-করা আঁকার স্কুলে সে প্রতি রবিবার বিকেলে ক্লাস করতে যায়। তার আঁকার টিচারের ধারণা, ছবি আঁকাটা যদি বাবুন না ছাড়ে, একদিন বিখ্যাত আর্টিস্ট হবে।

বাবুনরা থাকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে রুস্তমজি স্ট্রিটে। ওর কোনও ভাইবোন নেই। মা-বাবার সে একমাত্র সন্তান।

ওর বাবা দেবব্রত বসু একটা বিরাট কোম্পানির মস্ত অফিসার। অফিসের কাজে সারা বছরই দিল্লি মুম্বাই বাঙ্গালোর করে বেড়াতে হয়। দু-এক বছর পরপর সিঙ্গাপুর হংকং কুয়ালালামপুর, এমনকি নিউ ইয়র্ক লন্ডনেও তাঁকে যেতে হয়। কদিন আর তিনি কলকাতায় থাকতে পারেন!

বাবুনের মা চিররুগ্ণ হার্টের কী একটা অসুখে মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বাড়ি থেকে তাঁর বেরোনো একরকম বন্ধ।

বাবুনের বন্ধুদের সবারই জামাপ্যান্ট কেনা হয়ে গেছে। কোন কোম্পানির জিনসের ট্রাউজার্স, কোন কোম্পানির শার্ট, কী রঙের পাঠান স্যুট কিনবে, সব বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ঠিক করে রেখেছিল সে। কিন্তু দোকানেই যাওয়া হয়নি। তার কারণ বাবা। বাবা অর্থাৎ দেবব্রত বসু অফিসের কাজে মুম্বাই গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর দশ দিন থাকার কথা। কিন্তু কাজটা শেষ না হওয়ায় আরও ক'দিন বেশি থাকতে হয়েছে।

মা কোনও দিনই কেনাকাটা করেন না। তা ছাড়া পুজোর আগে-আগে জামাকাপড়ের দোকানগুলোতে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড ভিড় লেগে থাকে। সেখানে গেলে মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বাবাই বাড়ির সবার পোশাক টোশাক কেনেন।

পুজোর নতুন জামাপ্যান্ট পেতে দেরি হচ্ছে, তাই মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল বাবুনের। কিন্তু কাল রাতে বাবা মুম্বাই থেকে ফিরে এসেছেন।

আজ সকালে সাড়ে দশটার মধ্যে স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে একটা ছোট চামড়ার অ্যাটাচিতে চেক বই নিয়ে দেবব্রত বাবুনকে বললেন,'আমার সঙ্গে চল—।'

বাবুন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় বাবা?'

'ব্যাঙ্কে। টাকা তুলে তোর যা-যা চাই সব আজই কিনে দেব।'

বাবুন এক পায়ে খাড়া। তক্ষুনি পোশাক পালটে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

ব্যাঙ্কটা ওদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটও লাগে না। এত কাছে, তাই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করলেন না দেবব্রত। ছেলেকে সঙ্গে করে হেঁটেই চলে এলেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মল্লিনাথ বসাক দেবব্রতকে খুবই খাতির করেন। কারণ এই ব্যাঙ্কে তাঁর লক্ষ-লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। তাছাড়া, তাঁদের অফিসেরও বহু টাকা এখানে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই দেবব্রত এলে একেবারে তটস্থ হয়ে থাকেন মল্লিনাথ।

অন্যদের মতো দেবব্রতকে বাইরে লাইন দিয়ে চেক জমা দিতে বা টাকা তুলতে হয় না। সোজা তিনি ম্যানেজারের চেম্বারে চলে যান। মল্লিনাথ ছোটাছুটি করে নিজের হাতে তাঁর সব কাজ করে দেন।

পুজোর আগে-আগে এই সময়টা ব্যাঙ্ক গমগম করতে থাকে। সবসময় থিকথিকে ভিড়। লোকের এখন টাকার দরকার। ব্যাঙ্কের কর্মীরা নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পায় না।

ব্যাঙ্কে এসে দেবব্রত ভিড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে রাস্তা করে ম্যানেজারের চেম্বারের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বাবুন।

হঠাৎ একসঙ্গে সাত-আটটা ফায়ারিংয়ের শব্দ হল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু বোমা ফাটানোর আওয়াজ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল, ব্যাঙ্কের দারোয়ান মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। সমানে কাতরাচ্ছিল লোকটা। তার হাতেও একটা বন্দুক ছিল। অস্ত্রটা অনেকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে। ওটা কাজে লাগাবার আগেই তার গায়ে গুলি লেগেছে।

গেটের পর চওড়া প্যাসেজ একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে গেছে। নানা কাজে যারা আসে, সেখানে তাদের বসার জন্য অনেকগুলো সোফা, নিচু-নিচু টেবল। প্যাসেজের পর কাচের পার্টিশান দিয়ে ঘেরা পরপর অনেকগুলো কাউন্টার। সেগুলোর কোনওটার মাথায় লেখা 'ক্যাশ', কোনওটার মাথায় 'চেক জমা দিন' ইত্যাদি।

কাউন্টারগুলোর পেছনে চলে এসেছিল বাবুনরা। ভীষণ হকচকিয়ে গেছে তারা। এধারে ওধারে তাকাতেই চোখে পড়ল, হুড়মুড় করে ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকে পড়েছে সাত-আটটা লোক। তাদের মুখে কালো কাপড় বাঁধা। সবার হাতেই রাইফেল কী পিস্তল। এরা কী উদ্দেশ্যে এখানে হানা দিয়েছে, মুহূর্তে টের পেয়ে গেল বাবুন।

চকিতে ডাকাতের দলটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দু'জন গেটের মুখে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারের বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, দু'জন তাদের দিকে পিস্তল তাক করে বলল,'সব একধারে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। কেউ টুঁ শব্দ করলে কিংবা পালাবার চেষ্টা করলে খুন করে ফেলব।'

হুমকি শোনার পর সবাই দেওয়াল ঘেঁষে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এরপর কী ঘটতে পারে, লহমায় আন্দাজ করে নিয়েছিলো দেবব্রত। বাবুনের হাত ধরে এক টানে তাকে লোহার আলমারিগুলির আড়ালে নিয়ে গেলেন। তারপর দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবুন প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এ-ধরনের লোমখাড়া-করা ঘটনা ডিকেটিভ বইতে শুধু পাওয়া যায় কিংবা হিন্দি আর ইংরেজি সিনেমায়। চোখের সামনে এই প্রথম এমন দৃশ্য দেখল সে। আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কৌতূহলও হচ্ছিল তার। পাশাপাশি দুই আলমারির ফাঁকে চোখ রেখে সে তাকিয়ে থাকে।

এদিকে বাকি চার-পাঁচটা বন্দুকবাজ ভেতরের ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। কাউন্টারে বসে যে-ব্যাঙ্ককর্মীরা কাজ করছিল, তিনজন তাদের দিকে রাইফেল তুলে হুঁশিয়ারি দিল, 'কেউ নড়বেন না। যে যেভাবে বসে আছেন, সেইভাবে থাকুন। চালাকি করার চেষ্টা করলে লাশ বানিয়ে দেব।'

অন্য বন্দুকবাজরা পটাপট টেলিফোনের তার ছিঁড়ে সোজা ম্যানেজারের ঘরে চড়াও হল। সেখানে কী হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না। তবে নতুন করে গুলি টুলি যে চলে নি, সেটা অনুমান করা গেল। গুলি চললে ফায়ারিংয়ের আওয়াজ পাওয়া যেত।

আলমারির ফাঁকে চোখ ঠেকিয়ে বন্দুকবাজগুলোকে দেখতে চেষ্টা করছিল বাবুন। মুখ আধাআধি ঢাকা থাকলেও অন্য অংশগুলো চোখে পড়ছিল। কারও চুল কোঁকড়া, কারও চোখ কটা, কারও মাথায় খুব অল্প চুল, একজনের কপালে লম্বা কাটা দাগ, একজনের থুতনিতে ঝোপের মতো দাড়ি, আরেকজনের দাড়ি ছুঁচলো। মস্তিষ্কের কোনও অদৃশ্য ক্যামেরায় লোকগুলোর ছবি চটপট তুলে নিচ্ছিল বাবুন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ম্যানেজার মাঝবয়সি মল্লিনাথ বসাককে টানতে টানতে ফাঁকা জায়গায় বার করে এনে, সোজা দাঁড় করিয়ে একজন তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রাখল। আর দু'জন বিরাট চাবির গোছা নিয়ে গেল 'ক্যাশ' কাউন্টারের পেছন দিকে। নিশ্চয়ই চাবিগুলো ম্যানেজারকে ভয় দেখিয়ে আদায় করেছে ওরা।

অনেক বার বাবার সঙ্গে এই ব্যাঙ্কে এসেছে বাবুন। সে জানে, ক্যাশ কাউন্টারের ওপাশে একটা বড় চেম্বারে বড়-বড় সিন্দুকে ব্যাঙ্কের টাকা থাকে। দরকারমতো সেই টাকা বার করা হয়। ওই চেম্বারটার পাশে ব্যাঙ্কের ভল্ট। ছোট-ছোট বাক্সের মতো লোহার খোপে কাস্টমারদের গয়না ও অন্য সব দামি জিনিসপত্র থাকে।

আগে লক্ষ করেনি বাবুন। এবার তার চোখে পড়ল, যে বন্দুকবাজ দু'টো ভল্ট আর টাকা রাখার চেম্বারের দিকে গেছে, তাদের কাঁধে রয়েছে ক'টা বড় কাপড়ের ব্যাগ।

দশ মিনিটও লাগল না, ব্যাগগুলো বোঝাই করে টাকা এবং সোনা নিয়ে পুরো গ্যাংটা গুলি এবং বোমা ছুড়তে ছুড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রকাশ্য দিবালোকে, বেলা এগারোটা নাগাদ, গড়িয়াহাটের মতো জায়গায় যখন হাজার-হাজার মানুষের ভিড়, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়ে গেল। অথচ কারও কিছু করার ছিল না। বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে খালি হাতে কী-ই বা করা যায়!

বন্দুকবাজরা লুটপাট সেরে চলে যাবার পর চারদিকের লোকজন ব্যাঙ্কের সামনে দৌড়ে এল। কীভাবে ডাকাতিটা হল, কত টাকা লুট হয়েছে, ডাকাতদের গুলিতে কতজন মারা

গেছে, এসব তারা জানতে চায়। সকলে একসঙ্গে কথা বলছে। সকলেই উত্তেজিত। ফলে তুমুল হুলস্থূল বেধে গেছে।

এর মধ্যে থানায় খবর পৌঁছে গিয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড কালো পুলিশ ভ্যান এসে হাজির হল। সেটা থেকে নামলেন একজন ইন্সপেক্টর এবং আট দশজন আর্মড পুলিশ। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

পুলিশ বাহিনী ব্যাঙ্কের সামনে থেকে প্রথমেই ভিড় সরিয়ে দিল। ইন্সপেক্টর চারজন আর্মড কনস্টেবলকে গেটের মুখে দাঁড় করিয়ে বাকি কজনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ব্যাঙ্কের যে দারোয়ানটা ডাকাতদের গুলি খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় গোঙাচ্ছিল তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হল।

যারা চেক ভাঙাতে বা জমা দিতে এসেছিল তাদের চোখেমুখে এখনও আতঙ্ক লেগে আছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর আলাদা-আলাদা করে প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘটনা এবং ডাকাতদের চেহারার বর্ণনা শুনে নিলেন। তাঁর এ'কজন সহকারী একটা বড় নোটবুকে টুকে নিতে লাগলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম-ঠিকানাও লিখে নিচ্ছেন তিনি।

সবার শেষে এল বাবুনদের পালা। দেবব্রতর সঙ্গে কথা বলার পর ইন্সপেক্টর বাবুনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'সায়ন্তন বসু। ডাক নাম বাবুন।'

সে কোন স্কুলে, কোন ক্লাসে পড়ে, ইত্যাদি জেনে নিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ডাকাতরা ব্যাঙ্কের ভেতর ঢোকার পর তুমি কী করলে?'

বাবুন সেই আলমারিগুলো দেখিয়ে বলল, 'বাবা আমাকে নিয়ে ওগুলোর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। আমরা ওখানেই লুকিয়ে ছিলাম।'

'তাহলে তো তুমি কিছুই দেখতে পাওনি?'

'পেয়েছি।'

একটু অবাক হলেন ইন্সপেক্টর, 'আলমারির পেছন থেকে কীভাবে দেখলে?'

বাবুন বুঝিয়ে দিল দুই আলমারির মাঝখানে পাঁচ-ছ ইঞ্চি করে ফাঁক আছে। সেখানে চোখ লাগিয়ে সে দেখেছে।

'কী দেখেছ, এবার বল।'

খুঁটিনাটি সব বিবরণ দিতে লাগল বাবুন। একজনের চোখের তারা কটা, একজনের থুতনিতে ঝোপের মতো দাড়ি, একজনের থুতনিতে ছুঁচলো দাড়ি। মুখে কাপড় বাঁধা থাকলেও দু'জনের গালভর্তি দাড়ি রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইন্সপেক্টর খুশি হলেন। বাবুনের কাঁধে হাত রেখে তারিফের সুরে বললেন, 'বাঃ, তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি তো দারুণ।'

পর্যবেক্ষণ শক্তি কথাটার মানে জানে বাবুন। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার ক্ষমতা। প্রশংসায় সে একটু লজ্জা পেল।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আর কিছু মনে পড়ছে?'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল বাবুন। তারপর বলল, 'না স্যার।'

'যদি মনে পড়ে বাবাকে নিয়ে থানায় আমার সঙ্গে দেখা করো। আমার নাম পরমেশ মণ্ডল। ইন্সপেক্টর মণ্ডল বললেই আমার চেম্বারটা দেখিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে।'

বাবুনরা ছাড়া পেল দেড়টা নাগাদ। পুলিশ বাহিনী কিন্তু থেকে গেল। ইন্সপেক্টর মণ্ডল এবার ব্যাঙ্কের কর্মী এবং ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবেন। ডাকাতরা কত টাকা আর দামি-দামি কী কী জিনিস লুট করে নিয়ে গেছে তার খোঁজখবর নিয়ে সে-সবের তালিকা তৈরি করবেন।

ব্যাঙ্কের বাইরে এসে দেবব্রত ছেলেকে বললেন, 'টাকা তোলা গেল না। তোর জামাপ্যান্টও কেনা হল না।' কাছাকাছি অন্য একটা ব্যাঙ্কেও অ্যাকাউন্ট আছে তাঁর। সেটার নাম করে জানালেন, 'কাল ওখান থেকে টাকা তুলে কিনে দেব।'

বাড়ি ফিরে কোনওরকমে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বাবুন। দিনের বেলা তার ঘুমনোর অভ্যেস নেই। এমনকি কোনও দিন শোয় না পর্যন্ত। আজ চোখের সামনে যা ঘটে গেছে তার আতঙ্কের রেশ এখনও যেন পুরোপুরি কাটে নি। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে।

ভয় ভয় ভাবটা একসময় কাটিয়ে উঠল বাবুন। তার মাথায় কিন্তু সারাক্ষণ বন্দুকবাজগুলোর মুখ ভেসে উঠছিল।

ওরা এত টাকা, এত জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেল, অথচ কিছুই করা গেল না, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সে।

সময় যত কাটছে, বাবুনের মনে হতে লাগল, কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করবে সে? সশস্ত্র লুটেরারা কোথায় উধাও হয়েছে, কে জানে। পুলিশ কি তাদের সন্ধান পাবে? অতগুলো টাকা, নিশ্চয়ই কয়েক লাখ হবে, ভল্টের গয়নাগাটি হীরেমুক্তো কি উদ্ধার করা যাবে?

ভাবতে ভাবতে আচমকা বাবুনের মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। সে জানে, ভালো শিল্পীরা অপরাধীদের চেহারার বর্ণনা শুনে ছবি এঁকে দেন। সেই ছবি দেখে অনেক পুলিশ খুনি এবং ডাকাতকে ধরেছে।

বর্ণনা শুনে যদি ছবি আঁকা যায়, তা হলে সে নিজের চোখে ব্যাঙ্ক ডাকাতগুলোকে দেখে আঁকতে পারবে না? অবশ্য বন্দুকবাজগুলোর মুখের অর্ধেকটা কালো কাপড়ে ঢাকা থাকায় দেখা যায়নি। অদৃশ্য অংশটা কল্পনা করে নিতে হবে।

বিছানা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বাবুন। তার ঘরেই এক সঙ্গে পড়ার টেবল। ড্রইং খাতা আর স্কেচ পেন নিয়ে বসে পড়ল সে। ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় চারজনের ছবি মোটামুটি এঁকে ফেলল। এদের একজনের কপালে কাটা দাগ, একজনের কটা চোখ, বাকি দু'জনের থুতনিতে দু-রকমের দাড়ি।

অন্য ডাকাতগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার সময় পাওয়া যায় নি। তাদের ছবি আঁকতে গিয়ে বার বার গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে, ছবিগুলো ঠিক হচ্ছে না। বাবুন আর আঁকার চেষ্টা করল না। ওই চারখানা ছবি একটা বড় খামে ভরে পড়ার টেবলের ড্রয়ারে রেখে দিল।

এখন প্রায় ছ'টা বাজে। খানিক পরেই সন্ধে নেমে যাবে। বাবুন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা মা-বাবার ঘরে চলে এল। মা আর বাবার আলাদা আলাদা খাট। তাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন।

ট্যুর থেকে ফেরার পরদিন দেবব্রত অফিসে যান না। সেদিক থেকে আজ তাঁর ছুটির দিন। বাবুনের মতো তাঁরও দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। কিন্তু আজ ব্যাঙ্কের সেই মারাত্মক ঘটনাটার পর বাড়ি ফিরে আর বসে থাকতে পারছিলেন না। শরীর যেন ভেঙে আসছিল। কোনওরকমে খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম।

বাবুন দেবব্রতর খাটের কাছে এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে লাগল। চাপা গলায় ডাকল,'বাবা-বাবা—'

এভাবে ডাকার কারণ, মায়ের ঘুম যাতে ভেঙে না যায়। অসুস্থ মানুষ। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে শরীর আরও খারাপ হবে।

তা ছাড়া যে জন্য বাবুন বাবাকে জাগাতে চাইছে সেটা জানতে পারলে মা চেঁচামেচি জুড়ে দেবেন। মা ভীষণ ভিতু। বাবুন যা ভেবেছে, সবটাই ভেস্তে যাবে।

দু-চার বার ডাকাডাকির পর দেবব্রত চোখ মেলে তাকালেন। ছেলেকে খাটের পাশে দেখে খুব অবাক হয়েছেন। বললেন, 'কি রে, কী হয়েছে?

আঙুল দিয়ে মাকে দেখিয়ে, গলার স্বর অনেক নামিয়ে বাবুন বলল,'বাইরে এস। এখানে কথা বললে মা জেগে যাবে।'

কী ভেবে ছেলের সঙ্গে বাইরের টানা বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলবি?'

'তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চেঞ্জ করে নাও।'

'কেন রে?'

'থানায় যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন দেবব্রত। তারপর বলেন, 'থানায় যাব কেন?'

'সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতগুলোকে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে না?'

বিস্ময়টা শতগুণ বেড়ে যায় দেবব্রতর। বলেন, 'তুই কী ব্যবস্থা করবি?'

'আমি যা বলছি, করো না। জামাকাপড় বদলে নাও। আমিও চেঞ্জ করে আসছি। মায়ের ঘুম ভাঙলে বেরোনো হবে না। থানায় যেতে যেতে সব বলব।'

থানা বেশি দূরে নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাবুনরা সেখানে পৌঁছে গেল। কিন্তু তক্ষুনি ইন্সপেক্টর মন্ডলের সঙ্গে দেখা হল না।

একজন কনস্টেবল জানালো, ইন্সপেক্টর সাহেব অন্য অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। থানারই একটা ঘরে সে বাবুনদের বসার ব্যবস্থা করে দিল।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে ইন্সপেক্টর মণ্ডলের চেম্বারে ডাক পড়ল বাবুনদের। সেই কনস্টেবলটাই তাদের ডেকে নিয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর মণ্ডল বাবুন আর দেবব্রতকে দেখে বেশ অবাক হলেন। তাঁদের বসতে বলে, হঠাৎ থানায় আসার কারণটা জানতে চাইলেন।

দেবব্রত বললেন, 'আমার ছেলে সকালের ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে আপনাকে কিছু দেখাতে চায়।'

ইন্সপেক্টর মণ্ডল বাবুনের দিকে তাকিয়ে উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখাবে?'

ছবির সেই প্যাকেটটা সঙ্গে করে এনেছিল বাবুন। ইন্সপেক্টর মণ্ডলকে সেটা দিয়ে বলল, 'এর ভেতর ক'টা ছবি আছে। কাইন্ডলি বার করে দেখুন।'

প্যাকেট খুলতেই চারখানা ছবি বেরিয়ে পড়ল। খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর মণ্ডল, 'এগুলো তুমি কোথায় পেলে?'

'আমি এঁকেছি।'

'তুমি! কীভাবে?'

বাবুন জানালো, সে নিয়মিত আঁকার ক্লাসে যায়। ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের মুখে কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকলেও কল্পনা করে করে এঁকে ফেলেছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'দারুণ কাণ্ড করেছ বাবুন। এই যে কপালে কাটা দাগ, এর নাম আবদুল। আর ছুঁচলো দাড়িওলাটা নেলো। দু'টোই মার্কামারা খুনি। ওদের এগেনস্টে কত কেস যে রয়েছে তার ঠিক নেই। বাকি দু'টোকে চিনতে পারলাম না। খুব সম্ভব এ লাইনে নতুন আমদানি। সে যাক, আবদুল ও নেলো দু-একদিনের ভেতর ধরা পড়বে। পালের গোদাদের অ্যারেস্ট করতে পারলে বাকি ক'টাকে ছেঁকে তুলতে কতক্ষণ আর লাগবে! অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। কী উপকার যে তুমি করলে, বলে বোঝাতে পারব না। হাত মিলাও ইয়াং ফ্রেন্ড।'

দু'জনের হাত মেলানো শেষ হলে ইন্সপেক্টর মণ্ডল বললেন, 'আজ বাবার সঙ্গে বাড়ি যাও। পরে কী হয় তোমাদের জানিয়ে দেব।'

এরপর পাঁচ দিন পার হল। বাবুন স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে, ক্যারাটের ট্রেনিং নিচ্ছে, গান শিখছে—সবই ঠিক। তবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। থানা থেকে এর ভেতর কোনও খবর আসে নি।

ছ'দিনের দিন বিকেলবেলা স্কুল থেকে সবে বাবুন বাড়ি ফিরেছে, ইন্সপেক্টর মণ্ডলের ফোন এল। তিনি বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে ব্যাঙ্ক ডাকাতদের পুরো দলটাই ধরা পড়েছে। এমনকি যে কয়েক লাখ টাকা, সোনার গয়না, হিরে-মুক্তো আর অন্য সব দামি জিনিস লুট হয়েছিল তার প্রায় সবটাই উদ্ধার করা গেছে। এ সবই সম্ভব হল তোমার জন্যে। কনগ্র্যাচুলেশনস বাবুন।' একটু থেমে ফের বললেন, 'একটা সুখবর আছে।'

বাবুনের ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী সুখবর?'

ইন্সপেক্টর মণ্ডল জানালেন, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর ব্যাঙ্ক থেকে খুব শিগগিরই ডাকাত ধরতে সাহায্য করার জন্য বাবুনকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

চোর এবং সন্ন্যাসী

কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এই শহরটার নাম নবীপুর। তার এক দিকে নদী, আরেক দিকে রেল স্টেশন।

একসময় বেশ নিরিবিলি ছিল। লোকজন বেড়ে যাওয়ায় এখন আর তা বলা যাবে না। চারদিকে ভিড় আর ভিড়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা তুলেছে নতুন নতুন সব বাড়ি।

নবীপুরের একধারে মহেশ্বর চাকলাদারের দোতলা বাড়ি। এই এলাকাটা এখনও ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে নি। মোটামুটি শান্ত, ফাঁকা ফাঁকা।

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হয়ে এল। বেলা কম হয়নি, দশটা প্রায় বাজতে চলল। ঝলমলে রোদে চারদিক ভেসে গেলেও বাতাসে শীতের একটু আমেজ থেকে গেছে।

মহেশ্বর চাকলাদার ছিলেন দুঁদে দারোগা। তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। চোর জোচ্চোর ডাকাতেরা সারাক্ষণ থরহরি কাঁপত। অনেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

বহুদিন হল রিটায়ার করেছেন কিন্তু শহরের মানুষজন এখনও বলে মহেশ দারোগাই বসে। তাঁর বাড়িটা নিচু বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। রাস্তার দিকে ছোট গেট।

এই মুহূর্তে মহেশ্বর গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে একতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ষাট পেরিয়েছে, কিন্তু এই বয়সেও শরীর বেশ মজবুত। চৌকোমতো মুখ। শক্ত চোয়াল। মাথার তিন ভাগ জুড়ে টাক। যে ক'টা চুল রয়েছে সেগুলো ধবধবে সাদা। নাকের ডগায় গোলাকার চশমা।

কারও গলা কানে এল, 'নমস্কার—'

চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে তাকালেন মহেশ্বর। বারান্দার পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর গেট। চোখে পড়ল গেটের বাইরে একটি অল্পবয়সী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে। কত হবে বয়স? বড় জোর তিরিশ। মাঝারি হাইট। চুল কাঁধ ছাপিয়ে গেছে। মুখে পাতলা দাড়ি। বড় বড় চোখ। পরনে লাল রংয়ে ছোপানো ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবির ওপর লাল চাদর। পায়ে লাল কেডস। কপালে একটাকা সাইজের সিঁদুরের টিপ। কাঁধ থেকে একটা ঢাউস কাপড়ের থলে ঝুলছে। সারা জীবন চোর-ডাকাত ঘেঁটে ঘেঁটে কারওকেই সহজে বিশ্বাস করেন না মহেশ্বর। সাধু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচু নয়। তিনি মনে করেন এরা সব ধূর্ত, ধড়িবাজ, বুজরুক।

ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল মহেশ্বরের। হাঁকিয়েই দিতেন, কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীর পবিত্র পবিত্র

চেহারা দেখে হয়তো ভালো লাগল। ভুরু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল। নরম গলায় বললেন, 'কাকে চাই?'

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে বলে, 'আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

মহেশ্বর কয়েক লহমা অবাক তাকিয়ে থাকেন। বয়স তাঁর অর্ধেকও হবে না, তবু সাধু তো। তুমি বলাটা খারাপ দেখাবে। তাই বললেন, 'ভেতরে আসুন—'

গেট পেরিয়ে বারান্দায় চলে আসে সাধুটি। এধারে ওধারে কয়েকটা বেতের চেয়ার আর মোড়া পড়ে আছে। সেগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে মহেশ্বর বললেন, 'বসুন—'

কাঁধের থলে মেঝেতে বসিয়ে রেখে আলগোছে একটা মোড়ায় বসে পড়ল সন্ন্যাসী। বলল, 'আপনার খোঁজে নবীপুর থানায় গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম আপনি রিটায়ার করে এপাড়ায় বাড়ি করেছেন। ঠিকানাটা জেনে নিয়ে চলে এলাম।'

মহেশ্বর লক্ষ করলেন, সন্ন্যাসীটি নির্ভুল বাংলা বলছে, তবে উচ্চারণে হিন্দির টান আছে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের লোকেরা বাংলা বললে যেমন শোনায়, অনেকটা সেইরকম।

মহেশ্বর সন্ন্যাসীর মুখ থেকে চোখ সরান নি। তাকে বাজিয়ে নেবার জন্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনার নামটা জানা হয় নি—'

'স্বামী রামনাথ।'

'কোত্থেকে আসছেন?'

'বারাণসী থেকে—'

'মানে কাশী?'

'আজ্ঞা হ্যাঁ—'

মহেশ্বর বললেন, 'সাধু সন্ন্যাসীরা লোকের বাড়ি বাড়ি টাকাপয়সার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করে। স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু একটা ঘষা পয়সাও দেব না।'

কথাগুলো শোনামাত্র শিউরে উঠে, জিভ কেটে সন্ন্যাসী অর্থাৎ স্বামী রামনাথ বলে ওঠে, 'না না, আমরা যে ধরনের সাধু, তারা কেউ অন্যের টাকা ছোঁয় না।'

মহেশ্বরের চোখে দু'টো সার্কেলের মতো পুরো গোল হয়ে গেল। 'তা হলে আপনাদের চলে কী করে?'

'আমাদের আশ্রমের অনেক জমিজমা আর টাকাকড়ি আছে। তাতেই চলে যায়।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মহেশ্বর বললেন, 'আমরা কেউ কারওকে আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। জানা নেই, চেনা নেই, তা দুম করে সেই কাশী থেকে আমার কাছে আসতে গেলেন কেন?'

হাসি হাসি মুখ করে স্বামী রামনাথ বলে, 'কী বলছেন আপনি। আমাদের কতবার যে দেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।'

মহেশ্বর এবার একটু রেগেই গেলেন, 'আমার মেমোরি খারাপ নয়। দেখা হলে ঠিক মনে থাকত।' কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিগ্যেস করলেন, 'কবে দেখা হয়েছে?'

'বত্রিশ বছর আগে?'

'বত্রিশ বছর! আপনার বয়েস কত?'

'তিরিশ।'

অঙ্কটা গোলমাল হয়ে গেল। হতভম্বের মতো মহেশ্বর বললেন, 'তিরিশ বছর বয়েস। আর বলছেন কিনা বত্রিশ বছর আগে আমাদের বহু বার দেখা হয়েছে!'

স্বামী রামনাথের হাসিটা মুখময় ছড়িয়ে পড়ে। মাথাটা আস্তে হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক তাই। এতদিন বাদে আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। মাথাভর্তি তখন কুচকুচে কালো চুল ছিল, টাক পড়েনি। শরীর খানিকটা টসকে গেলেও বেশ শক্তপোক্তই আছে। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, কারণ আমি আর আগের চেহারায় নেই। তবে তখন আমার যে নাম ছিল সেটা বললে ঠিক মনে পড়ে যাবে।'

'কী নাম ছিল?'

'টানু।'

মহেশ্বর তাঁর ইজি চেয়ারে চিড়িক মেরে উঠে বসেন, 'সেই হারামজাদা টানু চোর! বজ্জাতের ধাড়ি—'

'আজ্ঞা। ভাবুন তো আপনার সঙ্গে কত টক্কর দিয়েছি—'

টানু নামটা শুনেই রক্ত মাথায় চড়ে গিয়েছিল মহশ্বেরের। খেপে উঠতে গিয়ে হঠাৎ মিইয়ে গেলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'টানু তো বত্রিশ বছর আগে মরে গেছে।'

'ঠিক।'

মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যেতে লাগল মহেশ্বরের। তিনি তখন নবীপুরের বড় দারোগা। চোর ডাকাতের যম। সবাইকে টিট করে ছেড়েছিলেন। শুধু টানুর সঙ্গেই পেরে ওঠেন নি। লোকটার হাতে ভেলকি খেলত। রোজ শহরের কোনও না কোনও বাড়ি থেকে টাকাপয়সা, সোনাদানা, দামি দামি জিনিস লোপাট করে দিত। কত পাহারা বসিয়েছেন মহেশ্বর, কত ফাঁদ পেতেছেন, কিন্তু টানুকে ধরে কার সাধ্য! অসহ্য রাগে গা রি রি করত। কিন্তু প্রমাণ না পেলে টানুকে গারদে পুরবেন কী করে? মাঝে মাঝে তাকে থানায় ডাকিয়ে এনে শাসাতেন, 'যেদিন বাগে পাব, চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।' কিংবা 'হাড় মাংস আলাদা করে ফেলব।' টানু-টার হাড়ে হাড়ে শয়তানি। মিচকি হেসে বলত, 'আগে সাক্ষী টাক্ষী জোগাড় করে আমাকে তো ধরুন। তারপর যা প্রাণ চায় তাই করবেন।' যখনই দেখা হত, সূক্ষ্মভাবে বজ্জাতটা যেন তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিত। জীবনে আচ্ছা আচ্ছা বদমাশদের শায়েস্তা করেছেন, কিন্তু টানুর বেলায় ডাহা ফেল।

সেই টানু সাতদিনের জ্বরে হুট করে মরে গেল। নবীপুরের বাসিন্দাদের হাড় জুড়লো। টানু কখন হানা দেয় সেই ভয়ে আগে তারা রাত জেগে বসে থাকত। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল।

মহেশ্বরের দারোগাগিরিতে একটাই কালো দাগ। সেটা হল টানু। চোরটাকে যে জেলের ঘানিতে জুড়ে দিতে পারেন নি, সেই আক্ষেপটা তাঁর থেকেই গেছে।

এতদিন বাদে স্বামী রামনাথ এসে বলছে সে-ই নাকি টানু। সমস্ত ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এই যুবক সন্ন্যাসীর কোনও বদ মতলব আছে কিনা কে জানে।

কিন্তু তিনিও মহেশ দারোগা। তাঁকে ধোঁকা দেওয়া এত সোজা নয়। এতক্ষণ আপনি টাপনি করে বলছিলেন। এবার একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তুই যে টানু তার প্রমাণ কী? পীরের কাছে মামাদোবাজি। রিটায়ার করেছে বলে মহেশ দারোগা বাঘ থেকে ইঁদুর হয়ে গেছে, ভাবিস নি।'

হাতজোড় করে স্বামী রামনাথ বলে, 'না না, সে কি কথা। আপনার কত ক্ষমতা, তা কি আর আমি জানি না?'

'আমাকে এবার বুঝিয়ে দে, যে টানু মরে ফৌত হয়ে গেছে বত্রিশ বছর আগে, সে তিরিশ বছরের স্বামী রামনাথ হয়ে উদয় হল কী করে?'

আগে মহেশ্বরকে বড়বাবু বলত টানু। এবার তাই শুরু করল স্বামী রামনাথ, 'বলছি বড়বাবু, বলছি—শুনুন—'

টানুর মৃত্যুর পর তার জন্ম হয় কাশীর এক ব্রাহ্মণের ঘরে। তাঁর নাম ব্রিজবাসী চতুর্বেদী। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত একজন সৎ মানুষ। এতটুকু লোভ নেই। বেনারসের এক চতুষ্পাঠীতে পড়াতেন। টানুকে তিনি ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কিন্তু তার এ জন্মের বাবা-মা কেউ বেশিদিন বাঁচেন নি। ভাইবোনও কেউ নেই। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গিয়েছিল। বাড়িঘর ছেড়ে টানু চলে গিয়েছিল আশ্রমে। তখন থেকে সেখানেই আছে। সন্ন্যাসীজীবনে তার নাম হল স্বামী রামনাথ।

কাশীতে জন্মাবার পর যখন একটু বড় হল তখন নবীপুরের রাস্তাঘাট, মানুষজন, বাড়িঘর আবছা আবছা তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। কিন্তু জায়গাটা যে ঠিক কোথায়, বুঝে উঠতে পারত না। আরেকটা ব্যাপার কাশীর অনেকের নজরে পড়েছিল। তার এ-জন্মের মাতৃভাষা হিন্দি, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বাংলা বলতে পারত। সমস্ত দেখেশুনে ব্রিজবাসী চতুর্বেদী বলেছেন—জাতিস্মর। পরে যখন আশ্রমে চলে যায় সেখানকার বড় মহারাজও একই কথা বলেছেন। শব্দটার মানেও টানু জেনে গিয়েছিল। যে পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারে তাকে জাতিস্মর বলা হয়।

আগের জন্মের স্মৃতি টানুকে পেয়ে বসেছিল। যে শহরে সে থাকত সেখানকার টুকরো টুকরো ঝাপসা ছবি, এবং নানা মানুষের মুখ সে দেখতে পেত। সেখানে যাবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কীভাবে যাবে, ভেবে পেত না।

মাত্র দিনকয়েক আগে নবীপুরের কথা পুরোপুরি মনে পড়ে যায় টানুর। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার টিকেট কেটে ফেলে। আজ ভোরে সে হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছে। সেখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরে নবীপুর।

মহেশ দারোগা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'বানিয়ে বানিয়ে বেড়ে একখানা গপ্পো ফেঁদেছিস তো।' তারপর হুমকে ওঠেন, 'মতলব কী তোর?'

হাতজোড় করে টানু কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আমি থাকি কাশীতে। এই জন্মে কোনও দিন নবীপুরে আসি নি। বড়বাবু বিবেচনা করে দেখুন, গপ্পোটা ফাঁদব কী করে?'

'তুই কাশীতে থাকিস. না কামাসকাটকায়—জানব কিভাবে? বললি এ জন্মে এ শহরে আসিস নি। তোর মুখের কথা বিশ্বাস করে ফেলব, এমন গাড়ল পেয়েছিস আমাকে?'

মহেশ দারোগা বলতে লাগলেন, 'নির্ঘাত টানুর কথা কারও কাছে শুনেছিস। আর সেটা দিয়ে—'

মহেশ দারোগার কথার মাঝখানেই হাই মাই করে ওঠে টানু, 'আগের জন্মে অনেক অন্যায় করেছি কিন্তু এ জন্মে কোনও খারাপ কাজ করি না, মিথ্যে বলি না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় কাশীতে আমাদের আশ্রমের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি। ফোন করলে এক্ষুনি সব জেনে নিতে পারবেন।'

মহেশ দারোগা থমকে গেলেন। একটু খুশিও হলেন। ঝানু চোরই হোক আর সাধু মহারাজই হোক, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গড় গড় করে মিথ্যে বলবে, এত বড় বুকের পাটা কারও নেই। খানিকক্ষণ কী চিন্তা করে বললেন, 'ঠিক আছে, ধরেই নিলাম তোর মুখ দিয়ে সত্যি ছাড়া কিছু বেরোয় না। একেবারে পাক্কা মহাপুরুষ বনে গেছিস। তা বাপু, নবীপুরে হাজার হাজার মানুষ থাকতে আমার কাছে হাজির হলে কেন?'

টানু বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার সম্বন্ধে আপনার এখনও একটু সন্দেহ রয়েছে। আমি যে সত্যি সত্যি আগের জন্মের টানু চোর, হাতে নাতে তার প্রমাণ দেব। তারপর অন্য একটা কাজ আছে। সে জন্যেই আপনার কাছে আসা।'

মহেশ দারোগা সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী প্রমাণ দিবি?'

'আপনার বাড়ি আসার আগে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। সেখানে পুরনো সেই বটগাছটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে কষ্ট করে আপনাকে একবার সেই গাছটার তলায় যেতে হবে।'

'ওখানে কেন?'

'প্রমাণ তো ওখানেই রয়েছে।'

ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল মহেশ দারোগার। ইজি চেয়ার থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'চল—'

টানু বলল, 'বড়বাবু, আমার একটা শাবল লাগবে।'

'শাবল দিয়ে কী হবে?'

'একটু ধৈর্য ধরুন। সব নিজের চোখে দেখতে পাবেন।'

মহেশ দারোগা বাড়ির ভেতর থেকে শাবল নিয়ে এলেন। বারান্দায় মেঝে থেকে তার থলেটা তুলে নিয়ে মহেশকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল টানু।

নদী খুব দূরে নয়। মহেশ দারোগার বাড়ি থেকে মিনিট পনেরো হেঁটে সেখানে পৌঁছে গেল দু'জনে।

যে বটগাছের কথা টানু বলেছে সেটা বিশাল। নদীর পাড়ে একটা নির্জন জায়গায় বিরাট এলাকা জুড়ে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার বয়স একশো বছরেরও বেশি। প্রকাণ্ড গুঁড়ি। মোটা মোটা ডাল থেকে কত যে ঝুরি নেমেছে তার লেখাজোখা নেই।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে বটের গুঁড়ির এক পাশে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে মস্ত একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল টানু। তারপর ভেতর থেকে দু'টো ভারী স্টিলের বাক্স বার করে আনল।

দুই বাক্সেরই গায়ে তালা লাগানো। বোঝা যায়, অনেকদিন মাটির তলায় থাকার জন্য তালায় জং ধরে গেছে। শাবল দিয়ে চাড় দিতেই সে দু'টো ভেঙে গেল।

বাক্স খুলতেই চোখের তারা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মহেশ দারোগার। একটা বাক্সে সুতো দিয়ে বাঁধা বাণ্ডিল বাণ্ডিল একশো টাকাব নোট ছাড়াও অজস্র সোনার গিনি আর রুপোর টাকা। অন্যটায় গয়নার স্তূপ। চুড়ি, কঙ্কণ, জড়োয়া নেকলেস, আংটি, ঝুমকো, ইত্যাদি।

টানু বলল, 'গত জন্মে নবীপুরের গেরস্তদের বাড়ি থেকে এই সব গয়নাগাটি টাকাপয়সা চুরি করে বটগাছের তলায় পুঁতে রেখেছিলাম। আপনি কত খোঁজাখুঁজি করেছেন কিন্তু হদিস পান নি। ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়েসে তো কাজকর্ম করতে পারব না, এগুলো জমিয়ে রাখি। পরে বসে বসে খেতে পারব। কিন্তু হুট করে মরে গেলাম।'

মহেশ দারোগা থ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না। একেবারে বোবা।

টানু মহেশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। 'কী বড়বাবু, আমি যে সেই হারামজাদা টানু চোর, প্রমাণ হল তো?'

আচমকা এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে, ভাবতে পারেন নি মহেশ। তিনি রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। আস্তে মাথা নাড়লেন।—'হ্যাঁ।'

টানু বলল, 'যে জন্যে নবীপুরে এসেছি, এবার সেই কাজের কথাটা বলি—'

'কী কাজ?'

'প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

বুঝতে না পেরে মহেশ দারোগা জিগ্যেস করেন, 'মানে?'

টানু বলতে লাগল, 'এক জন্মে ছিলাম চোর, পরের জন্মে হলাম সন্ন্যাসী। কেমন কপাল দেখুন, আগের জন্মের সব কথা মনে পড়ে গেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্তটা না করতে পারলে শান্তি পাচ্ছি না।'

'কী করতে চাস তুই?'

একটা বাক্স থেকে মোটা একখানা খাতা বার করে মহেশকে দিতে দিতে টানু বলল, 'কার কার বাড়ি থেকে কী কী জিনিস, কোন কোন তারিখে সরিয়ে ছিলাম, সব এতে লেখা আছে। গয়না, টাকাপয়সা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আমি জানি আপনি সৎ মানুষ, জীবনে ঘুষ খান নি। দয়া করে যার যার জিনিস তাদের দিয়ে দেবেন। বলবেন, আমি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। আচ্ছা চলি—' মহেশকে প্রণাম করে, নিজের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন মহেশ দারোগা। এই মুহূর্তে যা ঘটে গেল তা কি সত্যি? কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

অলৌকিক গল্প
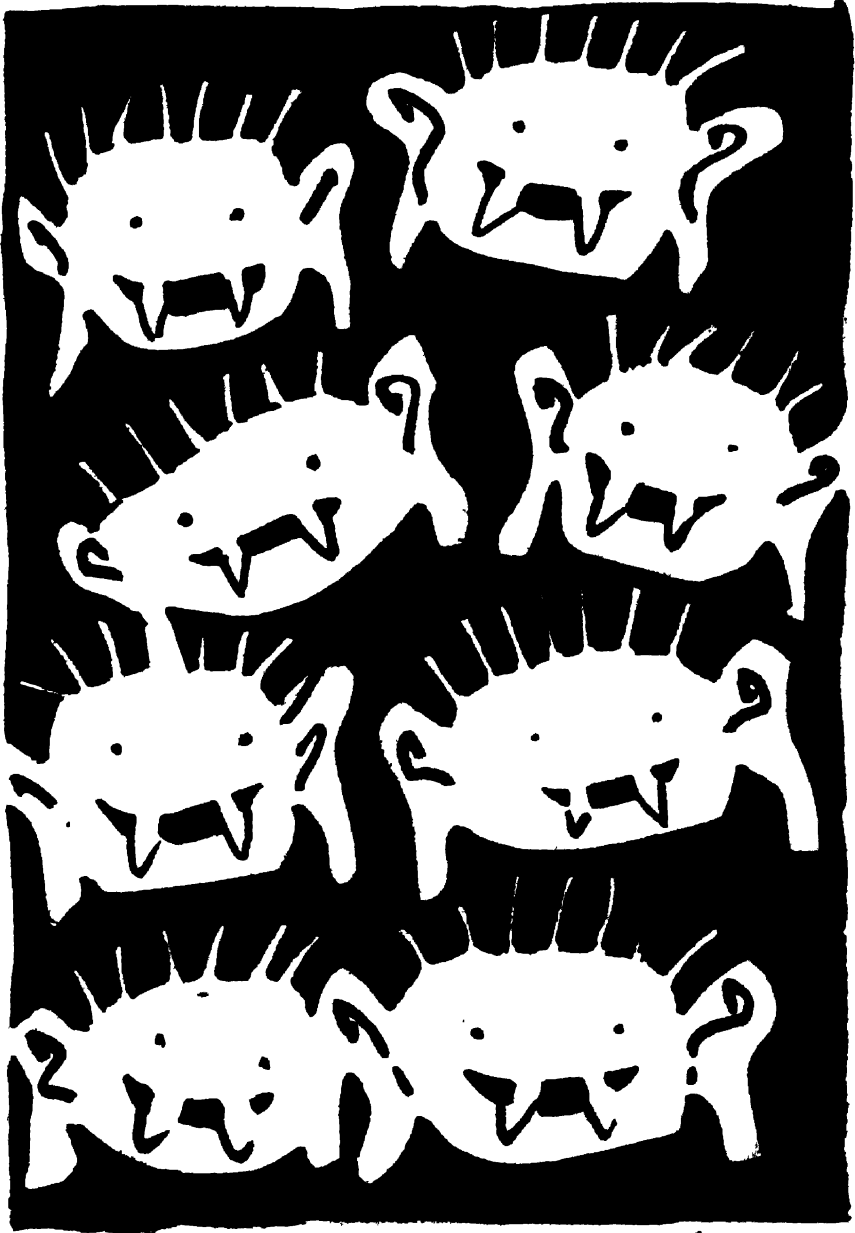
তিন মূর্তির কীর্তি

কাবুল টাবুলকে মনে আছে কি ? ওরা আমার সেই দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ দু ভাগনে।

কাবুলরা থাকে কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটা কারখানা শহরে। ওদের বাবা, মানে আমার জামাইবাবু ওখানকার ফ্যাক্টরির বিরাট অফিসার। দিদি বারোমাস অসুখে ভোগে আর দিনরাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিলের মতো চেঁচায়। ওদের বাড়িতে কাজের লোক তিনজন—সীয়াশরণ, ঝিকমিকিয়া এবং যুধিষ্ঠির।

আজ কাবুলরা স্কুলে যাবে না। জামাইবাবুও অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন। ওরা সবাই যাবে কলকাতায়। ঝিকমিকিয়াকেও সঙ্গে নেওয়া হবে। বাড়ি পাহারা দেবার জন্য অবশ্য যুধিষ্ঠির আর সীয়াশরণ এখানেই থেকে যাবে।

জামাইবাবুর ভাই মানে কাবুল-টাবুলের কাকা অবনীশ লেকের ধারে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। আজ সেখানে গৃহপ্রবেশ। অবনীশ খুব বেশি লোককে নেমন্তন্ন করেন নি। কাবুলরা ছাড়া আর যাঁদের যাবার কথা তারা হলেন ওদের দুই পিসি, পিসে আর পিসতুতো ভাইবোনেরা। অবনীশের দু-একজন বন্ধু আসতে পারেন।

সারাদিন কাকার ফ্ল্যাটে থেকে, হইচই এবং আনন্দ টানন্দ করে রাত্তিরে কাবুলরা ফিরে আসবে।

জামাইবাবু ভীষণ ছাটফটে, ব্যস্তবাগীশ মানুষ। ভোর হতে না হতেই তাড়া দিয়ে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। তারপর রোদ উঠতে না উঠতে একটা ঝকমকে নতুন গাড়িতে তুলে ফেললেন। কোম্পানি থেকে গাড়িটা জামাইবাবুকে দেওয়া হয়েছে।

পেছনের সিটে বসেছে দিদি আর ঝিকমিকিয়া। সামনের সিটে কাবুল টাবুল জামাইবাবু। ড্রাইভারকে আসতে বারণ করা হয়েছে, জামাইবাবু নিজেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

সকালবেলা রাস্তা বেশ ফাঁকা পাওয়া গেল। জামাইবাবু ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন।

ছ'টা পঞ্চাশে কাবুলরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। একঘন্টা পনেরো মিনিটের মাথায় ওরা সাদার্ন অ্যাভেনিউতে একটা প্রকাণ্ড সতেরো তলা বাড়ির সামনে এসে থামল।

আগে আর এখানে আসেনি কাবুলরা। তবে বাড়িটা তৈরি হবার সময় জামাইবাবুকে তাঁর ভাই দু-তিন বার দেখাতে এনেছিলেন।

কাবুলদের নামিয়ে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়িটা রাখলেন জামাইবাবু। তারপর চাবিটাবি লাগিয়ে সবাইকে সঙ্গে করে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। গাড়িটা রাস্তায় রাখতে হল, তার কারণ বাইরের লোকের গাড়ি ভেতরে নেওয়া বারণ।

বাড়িটা দারুণ জায়গায়। সামনে সাদার্ন অ্যাভেনিউ। দু-ধারে ঝকঝকে পীচ রাস্তার মাঝখানে দ্বীপের মতো উঁচু জায়গায় বাগান। রাস্তার ওধারে স্টেডিয়াম, স্টেডিয়াম ছাড়ালে লেক। এপাশে ওপাশে উঁচু উঁচু আকাশছোঁয়া অনেক বাড়ি উঠলেও সামনের দিকটা একবারে ফাঁকা। আর আছে সবুজ গাছপালা, ঝাঁক ঝাঁক পাখি।

পুজোর ছুটির আর বেশি দেরি নেই। বড় জোর এক সপ্তাহ। নীল আকাশে তুলোর মতো সাদা ধবধবে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু, বাড়িটায় ঢুকতেই একটা পুলিশ-ভ্যান চোখে পড়ল। রাইফেল কাঁধে ক'টা কনস্টেবলও এধারে-ওধারে ঘোরাঘুরি করছে। দারোয়ান, কেয়ারটেকার এবং নানা ধরনের কিছু পাঁচমিশেলি লোকজন চাপা গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করছে। তাদের চোখেমুখে ভয়, দুশ্চিন্তা।

জামাইবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। কী ব্যাপার? একটা পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে এখানে?'

কনস্টেবলটা বলল, 'খুন হুয়া।'

জামাইবাবু বললেন, 'এলাম একটু আনন্দ করতে। তার মধ্যে খুন! মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল।' বলে আর দাঁড়ালেন না। কাবুলদের নিয়ে লিফটের দিকে চলে গেলেন।

পাশাপশি দুটো লিফট। তারপর চওড়া দেয়ালে অগুনতি লেটার বক্স। প্রতিটি চিঠির বাক্সের মাথায় নাম লেখা রয়েছে। মিস্টার ডি. ধমীজা, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বি. বিলিমোরিয়া, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এ. ডি-সিলভা, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আর. তালাপাত্র, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এন. সোন্ধি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পি. এন, পারেখ, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জি. পুনেকার। পার্শি, সিন্ধি, গুজরাটি, মারাঠি—ভারতবর্ষের সব জায়গায় লোক এখানে ফ্ল্যাট কিনেছে।

একটা লিফটও নিচে নেই। দেওয়ালের গায়ে সাইন দেখে বোঝা গেল, একটা রয়েছে থারটিনথ ফ্লোরে, একটা ফোরটিনথ ফ্লোরে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। প্রায় একই সঙ্গে লিফট দুটো নিচে নেমে এল। লিফটম্যান দরজা খুলে দিলে একটা লিফটে কাবুলরা ঢুকে পড়ল। জামাইবাবু বললেন, 'টেনথ ফ্লোর'। টেনথ ফ্লোর বাংলার এগারো তলা। অবনীশের ফ্ল্যাটটা সেখানেই।

ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করতে করতে লিফটটা ওপরে উঠতে লাগল।

জামাইবাবু লিফটম্যানকে বললেন, 'শুনলাম তোমাদের এখানে নাকি একটা খুন হয়েছে।'

লোকটা ঘাড় কাত করল, 'জি সাহাব—'

'কোথায়?'

'টেন ফোলোরমে—'

অর্থাৎ টেনথ ফ্লোরে। আরে, সেখানেই তো অবনীশের ফ্ল্যাট। জামাইবাবু এবং দিদিরা চমকে উঠল। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করার সময় পাওয়া গেল না। লিফট টেনথ ফ্লোরে পৌঁছে গেল।

প্রতিটি ফ্লোরেই লিফটের সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর ওপরে এবং নিচে যাবার সিঁড়ি। লিফটের বাঁ দিকে দুটো, ডান দিকে দুটো, মোট চারটি ফ্ল্যাট। সব ফ্লোরেই এই ব্যবস্থা।

লিফট থেকে বেরুতেই দেখা গেল, প্রচুর লোকজন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়িতেও বেশ ভিড়। দু'ধারের চারটে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। প্রতিটি দরজার কাছেই অনেক মুখ। কেউ কথা বলছে না। চারদিক থমথমে। একটা পিন পড়লে আওয়াজ পাওয়া যাবে।

সবার চোখ লিফটের ডান ধারে একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটটার দিকে। সেখানে দরজার মুখে দুটো কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

ফ্ল্যাটটার গায়ে দরজার ঠিক পাশের দেওয়ালে নেমপ্লেট। এস. শিবদাসানি। কার কাছে যেন কাবুলরা শুনেছিল, সারনেম বা পদবির পেছনে 'আনি' থাকলে ধরে নিতে হবে লোকটা সিন্ধি। যেমন দাসানি, রমানি, তাহিলরমানি, পরদাসানি, সামতানি, গিদোয়ানি ইত্যাদি। দূর থেকে কাবুলরা উঁকি মারল। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের যেটুকু চোখ পড়ে, সেখানে কেউ নেই। খুব সম্ভব ওই ফ্ল্যাটের লোকেরা ঘরের মধ্যে রয়েছে। ভেতর থেকে অনেকের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বোঝা গেল খুনটা এখানেই হয়েছে।

হঠাৎ অবনীশের গলা শোনা গেল, 'দাদা বৌদি এস। আয় রে কাবুল টাবুল। এই যে এদিকে—'

মুখ ফেরাতেই কাবুলরা দেখতে পেল, বাঁ পাশে বেয়াল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অবনীশ। তাঁর পেছনে কাকিমা আর পাঁচ বছরের গগাই। গগাই কাবুলদের খুড়তুতো ভাই।

বেয়াল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটটার গায়ে নেমপ্লেটে লেখা আছে : এ. দত্ত।

অবনীশ জামাইবাবুর চাইতে আট বছরের ছোট। বেশ লম্বা, টান টান চেহারা। চওড়া কপাল, চুল পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। তাঁর পরনে ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি। হাতে দামি ঘড়ি। কাবুলদের কাকিমা মাধুরীকে দেখতে ভারি সুন্দর। বড় বড় চোখ, পাতলা নাক, টকটকে গায়ের রং, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি। গগাইর চেহারাটা গোলগাল, তুলতুলে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। বোঝা যায়, এই সকাল বেলাতেই তিনজনে স্নান করে নিয়েছে।

অবনীশ একটা বড় কোম্পানিতে বিরাট চাকরি করেন। ভালো মাইনে পান। এমনিতে দারুণ আমুদে আর হাসিখুশি, হই-হুল্লোড় ভালবাসেন। কাকিমাও তাই। কিন্তু এখন তাঁরা ভীষণ চুপচাপ আর চিন্তিত। মনে হল, ভয়ও পেয়েছেন। এমন কি গগাইও কাবুলটাবুল

বা জেঠাজেঠিকে দেখে একটা কথা বলল না। চোখ গোল করে একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটটা দেখতে লাগল।

কাবুলরা কাকার ফ্ল্যাটটার দিকে পা বাড়াতে যাবে, আচমকা পেছন থেকে একটা গলা কানে এল, 'সুরজিৎ না?'

জামাইবাবুর নাম সুরজিৎ—সুরজিৎ দত্ত। জামাইবাবুর সঙ্গে কাবুলরাও ঘুরে দাঁড়াল। দেখা গেল, একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটটা থেকে লম্বা চওড়া, সুপুরুষ চেহারার একজন পুলিশ অফিসার বেরিয়ে আসছেন। এক পলক তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন জামাইবাবু। তার পরেই চিনতে পেরে দারুণ খুশি হয়ে বললেন, 'আরে ব্যানার্জি না!'

ব্যানার্জি ততক্ষণে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ঠিক তাই।'

'উঃ, কতদিন পর তোমাকে দেখলাম।'

'হ্যাঁ। প্রেসিডেন্সি কলেজের পর এই বোধহয় প্রথম দেখা হল, তাই না?'

'রাইট। তারপর কী করছ আজকাল?'

জামাইবাবু কোথায় কাজ করেন, জানালেন। তারপর বললেন, 'তুমি কী করছ, সেটা তোমার ইউনিফর্মই বলে দিচ্ছে।'

ব্যানার্জি বললেন, 'ঠিক বলেছ। বি. এস.সি পাশ করার পর পরীক্ষা দিয়ে আই.পি.এস হয়ে গেলাম। এখন ক্যালকাটা পুলিশে আছি, লালবাজারে বসি।'

'এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবি নি।'

'আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম!'

'কী ব্যাপার বল তো। ওই ফ্ল্যাটটায় নাকি একটা খুন হয়েছে—'

'খুনটুন না হলে কি আমাকে দেখতে পেতে?'

'কে খুন হল?'

'বলছি। তার আগে বল, তুমি হঠাৎ এখানে—'

কী কারণে সকালবেলাতেই হীরাপুর থেকে এতদূর আসতে হয়েছে, জামাইবাবু জানালেন। তারপর অবনীশ, মাধুরী আর গগাইর সঙ্গে ব্যানার্জির আলাপ করিয়ে দিলেন। সব শেষে কাবুল টাবুলদের দেখিয়ে বললেন, 'আর এই দুটো হল আমার ছেলে। এই যে মানিকজোড় দেখছ, পৃথিবীতে এরকম বিচ্ছু বজ্জাত আর একটিও তুমি বার করতে পারবে না।'

জোরে জোরে হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে গেলেন ব্যানার্জি। তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। একদৃষ্টে কাবুলদের খানিকক্ষণ দেখে বললেন, 'এদের কোথায় যেন দেখেছি! খুব চেনা মুখ—'

জামাইবাবু মজা করে বললেন, 'দেখে থাকতে পার। খুন-ডাকাতি রাহাজানি—যা খুশি এরা করতে পারে।'

'উঁহু উঁহু—' কপাল কুঁচকে ব্যানার্জি ভাবতে লাগলেন। আচমকা একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মনে পড়েছে। খবরের কাগজে এদের ছবি দেখেছিলাম। অমিতাভ দত্ত, অরুণাভ দত্ত—তাই না?'

জামাইবাবু ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে ব্যানার্জি আবার বললেন, 'পুরিতে একটা মার্ডার কেসে ওরা খুনিকে ধরে পুরস্কার পেয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। লালকমল জোয়ারদারের খুনের ব্যাপার ছিল সেটা। কিন্তু সে তো এক বছর আগের ঘটনা। তোমার মনে আছে?'

' না থাকলে বলতে পারছি কী করে? তোমার ছেলেরা তো দেশের গৌরব। বড় ভাল লাগল ওদের দেখে।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল ব্যানার্জির। কাবুলদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাস্টার অমিতাভ অ্যান্ড অরুণাভ, এখানে যে খুনটা হয়েছে সে ব্যাপারে একটু মাথা ঘামাবে নাকি?'

দিদির চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ছেলেরা এমনিতে দুর্দান্ত বিচ্ছু। তার ওপর এই সব খুনখারাপির সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়ুক, দিদি তা একেবারেই চায় না।

জামাইবাবু বলে উঠলেন, 'কিন্তু কে খুন হল, সেটাই তো বললে না।'

ব্যানার্জি একধারে দিদি-জামাইবাবুদের ডেকে নিয়ে অল্প কথায় নিচু গলায় যা বললেন তা এইরকম।

উল্টোদিকে একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটে যে শিবদাসানিরা থাকেন তাঁরা বেজায় বড়লোক। বড়বাজারে ওঁদের হীরেমুক্তোর ব্যবসা।

সবসুদ্ধ ওদের ফ্যামিলিতে তিনজন লোক। শঙ্করলাল শিরদাসানি, ভারতী শিবদাসানি আর তাঁদের আট বছরের ছেলে সুনীল। পার্কসার্কাসে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ত সুনীল। এঁরা ছাড়া বাড়ির কাজকর্মের জন্য আছে চার-পাঁচটা লোক।

শিবদাসানিরা বহুকাল কলকাতায় আছেন। বাংলা ভাষাটা জলের মতো বলতে পারেন। ওঁদের কিছু আত্মীয়স্বজন আশেপাশেই থাকেন। তাঁরা মাঝে মাঝে এ বাড়িতে বেড়াতে আসেন।

মোটামুটি ভালই ছিলেন শিবদাসানিরা। মাস দুয়েক আগে হঠাৎ তিনি একটা বেনামী চিঠি পেলেন। সাতদিনের মধ্যে এক লাখ টাকা চাই। টাকাটা লেক গার্ডেনস স্টেশনের গায়ে যে লেভেল ক্রশিংটা রয়েছে তার পাশের বড় রেনট্রিটার গোড়ায় ইট চাপা দিয়ে রাখতে হবে। পুলিশে খবর দিলে ভীষণ বিপদ। হুঁশিয়ার।

শঙ্করলাল শিবদাসানি ব্যাপারটা গ্রাহ্য করেন নি। ভেবেছিলেন এটা কোনো বাজে লোকের কাজ, ভয় দেখিয়ে মজা পাচ্ছে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেন তিনি।

সাতদিন বাদে আবার হুমকি দিয়ে চিঠি এল। টাকার অঙ্কটা বেড়ে ডবল হয়েছে। পুরো দু'লাখ। এবারও চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন শিবদাসানি।

এভাবে একমাসে চার বার চিঠি এল। ফি বারই টাকার পরিমাণটা ডবল হয়ে যাচ্ছে।

একমাস পর ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটল। শিবদাসানিদের ছেলে সুনীল স্কুলে গিয়ে আর ফিরে এল না। রোজই বাড়ির গাড়ি তাকে স্কুলে পৌঁছে দেয়, ছুটির সময় নিয়ে আসে। কিন্তু সেদিন আনতে গিয়ে ড্রাইভার সুনীলকে কোথাও খুঁজে পেল না। সে ছুটে গেল প্রিন্সিপ্যালের কাছে। তিনি পুলিশকে আর শঙ্করলালকে ফোন করলেন।

তারপর পুরো একটা সপ্তাহ পুলিশ সুনীলের জন্য গোটা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলল কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। এদিকে সুনীলের মা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কেঁদে কেঁদে শঙ্করলালের চোখ ফুলে গেল। পাগলের মতো ছুটে ছুটে তিনি লালবাজারে যেতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

সুনীল নিখোঁজ হবার দিন দশেক বাদে আবার একটা চিঠি পেলেন শঙ্করলাল। তাতে লেখা আছে : বার বার জানানো সত্ত্বেও টাকা দাও নি। সে জন্য তোমার ছেলেকে কায়দা করে স্কুল থেকে নিয়ে গেলাম। আমাদের হেফাজতেই আছে। আর পনেরো দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে লেভেল ক্রশিংয়ের কাছে গাছতলায় একটা বড় সুটকেসে পনেরো লাখ টাকা না রাখলে ফলাফল কী হতে পারে, সেটা ঠাণ্ডা মাথায় নিজেই চিন্তা করে দেখ। টাকাটা দিলে তোমার ছেলেকে জ্যান্ত অবস্থায় ফেরত পাবে। মনে রেখো, এই আমাদের শেষ চিঠি।

শঙ্করলাল কী করবেন, ভেবে পেলেন না। একবার ঠিক করলেন, দেবেন। তারপরই মনে হল, টাকাটা দিলেই যে ছেলেকে ফেরত পাবেন, তার ঠিক নেই। হয়ত তখন আরো টাকার জন্য চাপ আসবে। শঙ্করলাল সোজা লালবাজার চলে গিয়েছিলেন। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু যে এই চিঠি লিখেছে তাকে বা সুনীলকে খুঁজে বার করতে পারেনি।

আজ ভোরে, তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি, একটা কালো রঙের গাড়ি এসে এ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িতে লোক ছিল চারজন। লোকগুলো একটা লম্বা বাক্স নামিয়ে এনে দারোয়ানকে বলেছিল, একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটের শঙ্করলাল শিবদাসানিকে পৌঁছে দিতে। দারোয়ান প্রথমে রাজি হয়নি। লোকগুলো বলেছিল, তাদের হাতে একেবারেই সময় নেই, জরুরি কাজে এক্ষুনি দমদম এয়ারপোর্টে চলে যেতে হবে, দারোয়ানজি যেন একটু কষ্ট করে বাক্সটা দিয়ে দেয়। নগদ কুড়িটা টাকা এ জন্য তাকে বকশিশও দিয়েছিল লোকগুলো।

দারোয়ান শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেনি। বকশিশ নিয়ে বাক্সটা শিবদাসানিদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর বাক্স খুলেই চিৎকার করে উঠেন শঙ্করলাল। তাঁর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে যান। বাক্সের ভেতর সুনীলের ডেড বডি বা মৃতদেহ রয়েছে।

ওঁদের চিৎকারে চারপাশের ফ্ল্যাট থেকে লোকজন দৌড়ে আসে। পুলিশ এবং শিবদাসানিদের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া হয়।

সব জানিয়ে ব্যানার্জি বললেন, 'মাস্টার অমিতাভ, মাস্টার অরুণাভ, তোমরা তো এই বয়েসে দারুণ কাণ্ড করে বসে আছ। এই খুনটার ব্যাপারে সব তো শুনলে। ইন্টারেস্ট লাগছে?'

দিদি বলল, 'না-না ব্যানার্জিবাবু, কাবুল টাবুল ছেলেমানুষ। এসব ভীষণ বিপদের কাজ। এর ভেতর দয়া করে ওদের টানবেন না।'

'কোনো ভয় নেই। ওরা শুধু শিবদাসানির ফ্ল্যাটে এসে ডেড বডিটা দেখে যাক। তারপর যদি ইচ্ছে হয়, কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাবে। আর যদি না হয়, আমি কিছু মনে করব না।'

দিদি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। ব্যানার্জি ফের শুরু করলেন, 'ওদের মতো বুদ্ধিমান ছেলেরা এসব নিয়ে যদি একটু ভাবে খুনিরা জব্দ হবে। তাতে দেশের উপকার।'

জামাইবাবু বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরা তোমার সঙ্গে যাবে। আমিও যাচ্ছি। দেখি বজ্জাত দুটো কত বড় শার্লক হোমস আর ব্যোমকেশ বক্সী হয়েছে। চল—' দিদিদের অবনীশের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে কাবুল টাবুলকে নিয়ে ব্যানার্জির সঙ্গে শিবদাসানিদের ফ্ল্যাটে গেলেন জামাইবাবু।

সামনের বড় ড্রইং রুমটায় অনেক পুরুষ আর মহিলাকে দেখা গেল। তাদের কেউ কেউ কাঁদছিল। অন্য সবাই নিচু গলায় কী সব বলছে। খুব সম্ভব এই খুনের ব্যাপারেই আলোচনা করছে।

বসবার ঘরটা বাঁয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন ব্যানার্জিরা। মাঝখানের প্রকাণ্ড ঘরটায় একটা খাটে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সমানে কেঁদে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। তাঁর পাশে মোটা সোটা বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরের মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

ব্যানার্জি ফিসফিসিয়ে বললেন, এঁরা হলেন শঙ্করলাল আর তাঁর স্ত্রী।

শঙ্করলালদের ঘিরে রয়েছেন কয়কজন বয়স্ক পুরুষ আর মহিলা। নিশ্চয়ই ওঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ওঁরা তাঁদের বোঝাচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এই আত্মীয়দের ভেতর একজনকে খুব বেশি করে চোখে পড়ছে। তাঁর বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, দারুণ ভালো দেখতে। পরনে দামি পোশাক। একবার শঙ্করলালের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, একবার তাঁর স্ত্রীর পাশে। খুব নরম গলায় কী বলছেন।

সিন্ধিতেই কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক। যদিও ওই ভাষাটা একেবারেই বোঝে না কাবুলরা, তবু মনে হল 'কেঁদো না, কোঁদো না, এত ভেঙে পড়ো না' জাতীয় কিছু বলছেন।

শঙ্করলাল ব্যানার্জিকে দেখতে পেয়েছিলেন। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'অফিসার স্যার, আমার ছেলেকে তো ফেরত পাব না। কিন্তু খুনিকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাকে ফাঁসিতে না ঝোলানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

সেই মাঝবয়সী সুন্দর চেহারার আত্মীয়টিও জোর দিয়ে বললেন, 'আমারও সেই কথা ব্যানার্জি সাহেব। খুনিকে চাই-ই। এর জন্যে যত টাকা লাগে আমরা খরচ করব।'

ব্যানার্জি বললেন, 'খুনিকে ধরতে না পারলে আমাদেরই বদনাম। প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব মিস্টার সামতানি। তা ছাড়া—'

বোঝা গেল, ওই সামতানি লোকটাকে ব্যানার্জি চেনেন। সামতানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ছাড়া কী?'

কাবুল টাবুলকে দেখিয়ে ব্যানার্জি বললেন, 'এদেরও নিয়ে এলাম। পুরিতে দুর্ধর্ষ একটা খুনিকে ধরে খুব নাম করেছে। সুনীলের এই কেসটায় আমাকে সাহায্য করতে পারে।'

'বেশ তো, বেশ তো—' বললেও মনে হল, সামতানি কাবুল টাবুলের ওপর একটুও ভরসা করতে পারেননি।

ব্যানার্জি বললেন, 'আমরা যাই, ও দিকটা একবার দেখে আসি।' কাবুল টাবুলদের নিয়ে তিনি ফ্ল্যাটের ভেতরের ঘরগুলোর দিকে চলে গেলেন।

ভেতরে আরো তিনটে ঘর আছে। তা ছাড়া রান্নাঘর, বাথরুম, জিনিসপত্র রাখার জন্য স্টোর, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যানার্জি একেবারে শেষ ঘরখানায় কাবুল টাবুল এবং জামাইবাবুকে নিয়ে এলেন। ঘরটা ফাঁকা, শুধু রাইফেল কাঁধে নিয়ে একটা কনস্টেবল দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

এখানে আসবাব টাসবাব বিশেষ কিছু নেই। টেবল চেয়ার, ডিভান, বইয়ের ছোট আলমারি—এইরকম কিছু কিছু জিনিস চোখে পড়ছে। আর মেঝেতে রয়েছে লম্বাটে একটা বাক্স।

কাবুল আচমকা বলে উঠল, 'এই বাক্সেই কি সুনীলের ডেড বডি এসেছে?'

ব্যানার্জি খুব খুশি হলেন। তারিফের সুরে বললেন, 'ঠিক ধরেছ? ভেরি ইনটেলিজেন্ট বয়।' বলে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললেন। ভেতরে একটি ছোট ছেলে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমোচ্ছে। গলা পর্যন্ত চাদের ঢাকা। শুধু মুখটা খোলা।

ব্যানার্জি বললেন, 'সুনীলের সারা গায়ে খুনী ছোরা চালিয়েছে। দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। তাই চাদরটা আর সরাচ্ছি না। ভালো করে মুখটা দেখে নাও। এখুনি পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠাতে হবে।'

গাদা গাদা ডিটেকটিভ বই পড়ে পোস্ট মর্টেম ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে কাবুলরা।

কেউ যদি খুন হয় বা কেউ যদি অস্বাভাবিক ভাবে মরে পুলিশের ডাক্তাররা তাদের শরীর পরীক্ষা করে মৃত্যুর কারণটা বুঝতে চেষ্টা করেন। এতে খুনিকে ধরতে সুবিধে হয়।

মৃতদেহ দেখা হয়ে গেলে বাক্সটা বন্ধ করে দিলেন ব্যানার্জি। তারপর বললেন, 'আনন্দ করতে কলকাতায় এসেছিলে। আমি তোমাদের খুনখারাপির ভেতর টেনে আনলাম। নিশ্চয়ই তোমাদের মা, কাকা আর কাকিমা আমার ওপর রাগ করেছেন।'

জামাইবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এ নিয়ে তুমি ভেবো না।'

ব্যানার্জি কাবুল টাবুলকে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা দিচ্ছি। যদি মনে কর, এই খুন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবে, আমাকে জানিয়ে দিও। পুলিশ তোমাদের সবরকম সাহায্য করবে। শিবদাসানিদের বলে দিচ্ছি, এই ফ্ল্যাটে যখন ইচ্ছে আসতে পারবে। মানে যে বাড়ির লোক খুন হয়, সেখানে বার বার যাওয়া দরকার। সেখানকার মানুষজনকে দিনের পর দিন জেরা করে এমন কিছু হয়ত বেরুবে যাতে খুনিকে ধরা যেতে পারে।'

বাইরে এসে ব্যানার্জি বললেন, 'তোমরা কাকার ফ্ল্যাটে যাও। পরে আবার দেখা হবে।'

জামাইবাবু বললেন, 'তুমিও চল—'

'না ভাই, আজ আর হবে না। এখানে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। ডেড বডি পোস্টমর্টেমের জন্যে তো পাঠাতেই হবে। শিবদাসানিদের আত্মীয়স্বজন, চাকরবাকরদের জেরা করতে হবে। ভাইকে বলে দিও, আরেকদিন এসে অনেকক্ষণ কাটিয়ে করে যাব।'

অবনীশের ফ্ল্যাটে আসতেই দেখা গেল, দুই পিসি, দুই পিসে এবং পাঁচ পিসতুতো ভাইবোন এসে গেছে। আর এসেছে পুরুত। বাইরের ঘরে কী সব পুজোটুজো হচ্ছে। সবাই সেখানে বসে চুপচাপ পুজো দেখছে।

গৃহপ্রবেশের আগেই ফ্ল্যাটটা সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলেছিলেন অবনীশ। হাতের ইশারায় দিদি কাবুল টাবুলদের একটা সোফায় শান্ত হয়ে বসতে বলল।

পুজো হয়ে গেলে শান্তিজলটল মাথায় নিয়ে প্রসাদ খাওয়া শুরু হল।

পিসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বড় পিসির মেয়ে একমাত্র ঝুমলাই কাবুল-টাবুলদের চাইতে বড়। লরেটোতে ক্লাশ টেনে পড়ে। গেল বছর পুরিতে লালকমলের খুনিকে ধরবার পর থেকেই কাবুল-টাবুলকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে সে। ভীষণ সমীহ করে ওদের সঙ্গে কথা বলে। আর যারা বয়সে ছোট, যেমন বড়পিসির ছেলে নোটন আর টোকন, ছোট পিসির দুই মেয়ে দোলন আর ঝুলন, তারা সবাই কাবুল-টাবুলের সঙ্গে দেখা হলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ক্লাসের বন্ধুদের কাছে ওদের সম্বন্ধে কত গল্প করে।

প্রসাদ খেতে খেতে ঝুমলা কাবুলদের কাছে এসে বসল। বলল, 'শুনলাম এখানে যে ছেলেটা খুন হয়েছে, তোরা নাকি তার খুনিকে ধরবি?'

কাবুল বলল, 'কার কাছে শুনলে?'

'বড় মামি আর ছোটমামা বলছিলেন।'

তার মানে দিদি আর অবনীশের কাছে শুনেছে ঝুমলারা। কাবুল বলল, 'এখনও ঠিক করিনি। বাবার বন্ধু ব্যানার্জিকাকু খুব বড় পুলিশ অফিসার। তিনি আমাদের ধরে নিয়ে গেলেন, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

'খুনিটাকে ধর না। ধরতে পারলে কী দারুণ ব্যাপার হবে। খবরের কাগজে তোদের ছবি বেরুবে। কত প্রাইজ পাবি।'

বড় পিসি ধমকে উঠল, 'ওদের আর নাচিও না। এসব খুনিটুনিরা ডেঞ্জারাস ধরনের লোক। কখন কী বিপদ ঘটে যাবে!'

বড় পিসে একটা কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ান। ছোট পিসে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার। তাঁরাও একই কথা বললেন। এরকম ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কাবুল-টাবুলের জড়িয়ে পড়া উচিত না।

দিদি বলল, 'এই কথাটা আপনাদের দাদাকে বোঝান। যেই মিস্টার ব্যানার্জি ডাকলেন অমনি ছেলেদুটোকে নিয়ে তক্ষুনি তাঁর পেছন পেছন ডেড বডি দেখতে চলে গেল। আমি

কী যে করব। ইচ্ছে করছে মরে যাই। নিজের ছেলেদের কেউ এমন করে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়!'

মুখে যাই বলুন, নলকমলের খুনিদের ধরার পর থেকে কাবুল-টাবুলদের ব্যাপারে মনে মনে জামাইবাবুর ভীষণ গর্ব। তিনি বললেন, 'আ রে রাবা, খুনি ধরাটা হল একটা শক্ত অঙ্ক কষে রাইট ফল বার করার মতো। যদি সুনীলের মার্ডারারকে ওরা ধরতে পারে কিরকম নাম হবে বল তো? তাছাড়া কোনো ভয় নেই। পুলিশ ওদের পেছনে আছে।' একটু থেমে বললেন, 'আমি তো নিজের ছেলেদের চিনি। পৃথিবীতে এমন কোনো শয়তান বদমাস জন্মায়নি যে ওদের কিছু করতে পারে।'

অবনীশ বললেন, 'কিন্তু এসব দিকে মাথা দিলে পড়াশোনার যে ক্ষতি হবে।'

'পড়ায় ফাঁকি দিতে পারবে না। ধুরন্ধর মাস্টার আছে না। লেখাপড়ার ফাঁকে যদি সময় করে খুনি ধরতে পারে তো ধরবে। নইলে নয়।'

কাবুল-টাবুলের কাকিমা বললেন, 'খুনখারাপির কথা এখন থাক দাদা। ভেবেছিলাম ফুল আর আলপনা দিয়ে ফ্ল্যাটটা সাজাব। আপনারা এলে বিকেলে গানের আসর বসাব। কিন্তু ওধারের ফ্ল্যাটে এমন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। কিছু করতেই ইচ্ছা হচ্ছে না। ভীষণ খারাপ লাগছে।'

কাবুলের কাকিমা চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন। তা ছাড়া ছোট পিসি ও বড় পিসির গানের গলাও মিষ্টি। ছোট পিসি গান গজল ঠুংরি, বড় পিসি ক্লাসিক্যাল। ছোট পিসে ভাল সারোদ বাজান।

বড় পিসি বললেন, 'হ্যাঁ। এইরকম অবস্থায় কী আনন্দ করা যায়। শিবদাসানিরা ভাববেই বা কী!'

অবনীশ বললেন, 'চল, ফ্ল্যাটটা তোমাদের ভাল করে দেখাই।'

ফ্ল্যাটটা অবিকল শিবদাসানিদের মতোই। সেটা দেখানো হলে বড়রা ড্রইং রুমে গিয়ে গল্প করতে বসলেন। কাবুল টাবুল ঝুমলা নোটন টোকনরা একবার যেতে লাগল রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে, একবার কিচেনে, একবার শোবার ঘরগুলোতে।

দুপুরে প্রচুর খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেছেন অবনীশ। বাড়িতে কিছুই রান্না হয়নি। সব কিনে আনা হয়েছে দামি একটা রেস্তোরাঁ থেকে। পোলাও, মুরগির মাংস, চিংড়ির কাটলেট, ভেটকির ফ্রাই, চাটনি আর পেস্তা মেশানো আইসক্রিম।

খাওয়াদাওয়ার পর খানিকক্ষণ জিরিয়ে টিরিয়ে একে একে সবাই চলে যেতে লাগল। প্রথমে গেলেন ছোট পিসিরা, তারপর বড় পিসিরা, একেবারে শেষে কাবুলরা।

সন্ধের পর হীরাপুরে ফিরতে ফিরতে কাবুলের কানের কাছে মুখ এনে টাবুল ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা কী করবি? সুনীলের কেসটা নিবি?'

'একটু ভেবে দেখি।'

অনেকক্ষণ পর গাড়িটা যখন হীরাপুরের ব্রিজের মাথায় উঠেছে সেই সময় নিচে সেই পোড়ো বাড়িটা দেখে কাবুল বলে উঠল, 'টাবুল, সকালে একবার ভন্টিদার কাছে আসতে হবে।'

টাবুল কিছু না বলে দাদার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাবুল এবার বলল, 'ভন্টিদাকে সব বলতে হবে। সে যদি হেল্প করে, কেসটা নেব।'

পরের দিন ভোর হতে না হতেই রেল লাইনের ধারে ভাঙা পোড়ো বাড়িতে ভন্টিদার কাছে চলে এল কাবুলরা। এখনও ঘুম ভাঙেনি তার। মশারির ভেতর যদিও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তবু কাবুলরা জানে ওখানে ভন্টিদা শুয়ে আছে। ডাকাডাকি করতে খানিকটা বাতাস জমাট বেঁধে গোলগাল মাঝারি সাইজের একটা লোক হয়ে গেল।

ভন্টিদা, মানে লালকমলের কথা মনে আছে তো? সে এখন আর বেঁচে নেই। মরার পর মানুষ যা হয় সে তা-ই হয়ে গেছে।

বেঁচে থাকতে ভন্টিদার যা যা অভ্যাস ছিল এখনও সে সবই আছে। সে ভীষণ আলসে, ঘুমকাতুরে এবং একটু ভিতুও।

হাই তুলতে তুলতে তুড়ি দিল ভন্টিদা। তারপর বলল, 'কি রে, এত সকালে কী মনে করে?'

কাবুল বলল, 'ঝামেলা হয়ে গেছে।'

'কী ঝামেলা?'

সুনীলের খুনের ব্যাপারটা বলে কাবুল জিজ্ঞস করল, 'এই কেসটা কি আমরা নেব?'

ভন্টিদা খানিকক্ষণ ভেবে খুব উৎসাহ দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই নিবি। খুনিটাকে ধরতে পারলে, কিরকম নাম হবে বল তো?'

কাবুল বলল, 'কিন্তু ধরব কী করে? তবে—'

'কী?'

'তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাক, খুনিটাকে ধরতে চেষ্টা করব।'

ভন্টিদার উৎসাহ ঝপ করে কমে গেল। সে বলল, 'আবার আমাকে এর ভেতর টানছিস কেন? জানিসই তো বেশি নড়াচাড়া করতে আমার ভালো লাগে না। মনে হয়, সব সময় শুয়ে থাকি। শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে।'

কাবুল বলল, 'তুমি-না থাকলে এ কেসে নেব না। পুরিতে আমাদের হেল্প করেছিলে বলেই না তোমার খুনিকে ধরতে পেরেছিলাম।'

'ভারি মুশকিলে ফেলে দিলি। আচ্ছা একটু ভেবে দেখি।'

'বেশি ভাবতে হবে না।'

বেজার মুখ করে ভন্টিদা বলল, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছিস, তোদের সঙ্গে থাকব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কাবুল বলল, 'কিভাবে কাজটা শুরু হবে?'

'চিন্তা করতে দে।' বলে চোখ বুজে ঠোঁট কামড়াতে লাগল ভন্টিদা। গম্ভীরভাবে ভাববার সময় অনবরত ঠোঁট কামড়ায় সে।

কাবুলরা চুপচাপ বসে রইল।

পুরো দশ মিনিট বাদে ঠোঁট কামড়ানো বন্ধ হল। চোখ মেলে ভন্টিদা বলল, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এখন দুটো কথার ঠিক ঠিক উত্তর দে—'

'বল।'

'সুনীল কবে খুন হয়েছে?'

'মনে হয় পরশু। কাল ভোরে খুনিরা ওর ডেডবডি দিয়ে গেছে।'

'খুনের স্পটটা কোথায়?'

'বলতে পারব না।'

'এই তো গোলমাল। কোথায় খুন হয়েছে জানতে পারলে ভাল হতো। আচ্ছা, সুনীলদের বাড়ির ঠিকানাটা কী?'

কাবুল ঠিকানা বলল। বিড় বিড় করে ক'বার আউড়ে মুখস্থ করে ফেলল ভন্টিদা। তারপর বলল, 'দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একবার কলকাতায় যাব। চারদিকে খোঁজখবর নিতে হবে। তোরা রাত্তিরে আসতে পারবি?'

'মাস্টারমশাই পড়িয়ে যাবার পর পারব।'

'তাই আসিস। কলকাতায় কী করলাম, জানিয়ে দেব। বাড়িতে সারিডন, আর পেট ব্যথার ওষুধ আছে?'

'আছে। কী হবে?'

'নিয়ে আসিস। ক'দিন ধরে বিকেলের দিকে মাথাটা ভীষণ ধরছে আর পেটটাও কনকন করছে।'

টাবুল বলল, 'তুমি বড্ড ভোগো ভন্টিদা।'

মুখটা কাঁচমাচু করে ভন্টিদা বলল, 'কী করব বল। মরার আগে আমার যেসব অসুখ হতো, এখনও তাই হয় যে।'

রাত্তিরে ধুরন্ধর মাস্টার পড়িয়ে যাবার পর কাবুল টাবুল দশটা সারিডন বড়ি আর এক শিশি যোয়ানের আরক নিয়ে আবার পোড়ো বাড়িতে এল। ভন্টিদা সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে গলায় পাউডার দিয়ে বিছানায় বসে আছে। কাবুলদের দেখে বলল, 'আয় আয়—'

কাবুলরা কাছাকাছি বসে পড়ল। বলল, 'কলকাতায় গিয়েছিলে?'

'বা রে, তোরা এত করে বলে গেলি। যাব না?'

কখন ফিরলে?'

'মিনিট কুড়ি আগে। এসে গা ধুয়ে জামাকাপড় বদলে সবে বসেছি, তোরা এলি।'

'কলকাতার খবর বল।'

ভন্টিদা যা বলল তা এইরকম। সুনীলদের ঠিকানা নিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউর দিকে গিয়েছিল। গোটা সাদার্ন অ্যাভেনিউ আর লেকের ধারে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করে আটটা ভূতকে সে বার করে। এদের চারজন পুরনো ভূত, চারজন নতুন। নতুনদের মধ্যে কারো বয়েসই পঁচিশের কম না। সুনীল বলে কাউকে ওরা চেনে না। মনে হয়, সুনীলকে ওখানে খুন করা হয়নি। করা হলে মরার পর সে ওখানেই থেকে যেত।

তবে লেকের এলাকায় ভূতেরা খবর দিল, টালিগঞ্জ চেতলা বেহালা পার্কসার্কাস—কলকাতায় নানা জায়গায় অনেক ভূত আছে। রোজ মানুষ মরে নতুন নতুন ভূত জন্মাচ্ছেও।

লেকের এলাকায় ভূতেদের ভেতর বলাই বলে একটা ছেলে আছে। সে পরের উপকার করতে ভীষণ ভালবাসে। বলাই ভন্টিদাকে চেতলা আর টালিগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল। ওই দুটো জায়গাতেও সুনীলকে পাওয়া যায়নি। বলাই বলেছে, কাল কসবা পার্কসার্কসের দিকে নিয়ে যাবে। সেখানেও যদি পাওয়া না যায় সারা কলকাতা চষে যেমন করে হোক সুনীলকে সে বার করবেই।

কাবুল বলল, 'কালও তা হলে কলকাতায় যাচ্ছ?'

ভন্টিদা বলল, 'কেসটা যখন নিয়েছি, যেতেই হবে। ভালো কথা, সুনীলের একটা ফোটো জোগাড় করে দিতে পারিস?'

'পারব মনে হয়।'

'কাল দুপুরে কলকাতা যাচ্ছি। তার আগে পেলে ভাল হয়।'

'দেখি। এক্ষুনি গিয়ে ব্যানার্জিকাকুকে ফোন করব, যদি ফটোর ব্যবস্থা করতে পারেন—'

'বাংলোয় ফিরে লালবাজারে ফোন করল কাবুল। ব্যানার্জিকে পাওয়া গেল না। তিনি বাড়ি চলে গেছেন। অগত্যা বাড়ির নম্বর জেনে নিয়ে ফোন করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওধারে থেকে ব্যানার্জির গলা ভেসে এল, 'হ্যালো, কে?'

কাবুল বলল, 'হীরাপুর থেকে বলছি। আমি কাবুল—ভাল নাম অমিতাভ—'

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যানার্জি 'বল বল, কী খবর?'

'সুনীলের একটা ফটো চাই কাকু। কাল ন'টার ভেতর যদি কাউকে দিয়ে পাঠাতে পারেন—'

'কেসটা তোমরা তা হলে নিয়েছে। গুড, ভেরি গুড। ফটো কালই পেয়ে যাবে। আটটার ভেতরেই।'

'আচ্ছা—'

'তদন্তটা কিভাবে শুরু করলে?'

কাবুল বিপদে পড়ে গেল। আসলে এখন পর্যন্ত সে তো কিছুই করেনি। যা করার ভন্টিদাই করেছে। কাবুল বলল, 'এখন বলব না। পরে শুনবেন।'

ব্যানার্জি বললেন, 'ঠিক আছে। পরেই বোলো। তোমরা কি সাদার্ন অ্যাভেনিউতে শিবদাসানিদের ফ্ল্যাটে এর মধ্যে যাচ্ছ?'

'এক্ষুনি বলতে পারছি না। হীরাপুরে থেকেই এখন কাজটা করে যাব ভাবছি।' আসলে ভন্টিদার সঙ্গে পরামর্শ না করে এর বেশি কিছু বলা এই মুহূর্তে কাবুলের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ব্যানার্জি বললেন, 'ও কে, ও কে, তোমাদের যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবেই এগিয়ে যাও।'

'আপনারা খুনির খোঁজ-টোঁজ পেলেন?'

'না।'

পরদিন সকালে আটটার আগেই জিপে করে একজন পুলিশ অফিসার সুনীলের এক গোছা ফোটো দিয়ে গেলেন। সেগুলো নিয়ে তক্ষুনি ভন্টিদার কাছে ছুটল কাবুলরা।

ফোটোগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারকয়েক দেখে প্যাকেটে পুরতে পুরতে ভন্টিদা বলল, 'ভেরি গুড। রাত্তিরে আবার আসিস।

রাত্রে ধুরন্ধর মাস্টার যাবার পর ফের পোড়ো বাড়িতে চলে এল কাবুলরা। ভন্টিদা তখনও ফেরেনি। মিনিট পাঁচেক বসতে না বসতেই এসে পড়ল। দারুণ হাঁপাচ্ছে সে। এই রাত্রিবেলাতেও সে বেশ ঘেমে গেছে।

বিছানায় বাবু হয়ে বসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে ভন্টিদা বলল, 'আজ ভীষণ খাটুনি গেছে রে। তবে পরিশ্রমটা কাজে লেগেছে।'

'কি রকম?' কাবুলরা শিরদাঁড়া সোজা করে বসল।

'অপারেশন সাকসেসফুল।'

'সুনীলের খোঁজ পেয়েছ?'

'নিশ্চয়ই। বলাই খুব হেল্প করেছে।' বলে আরো কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে ভন্টিদা শুরু করল, 'আমাকে গোটা কলকাতা ছুটিয়ে বেড়িয়েছে বলাই। কসবা ঢাকুরিয়া যাদবপুর গড়িয়া। শেষে পার্কসার্কাস স্টেশনের ওধারে একটা পুরনো পোড়ো গুমটি ঘরে সুনীলকে পাওয়া গেল। প্রথমে তাকে দেখা যাচ্ছিল না; শরীরটাকে বাতাসে ভ্যানিশ করে রেখেছিল। হাতড়ে হাতড়ে তাকে বার করে মানুষের চেহারা নিতে বললাম। চেহারাটা ফুটে উঠলে পকেট থেকে সুনীলের ফোটো বার করে মিলিয়ে নিলাম। একটুও তফাত নেই। তখন নাম, ঠিকানা, বাবার নাম, এই সব জিজ্ঞেস করলাম। জানতে চাইলাম, স্কুল থেকে সে কিভাবে নিখোঁজ হল? কেউ কি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে? সুনীল জানিয়েছে তার বাবার নাম করে কে যেন প্রিন্সিপ্যালের কাছে ফোন করে বলেছিল, গাড়ি এবং লোক পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লোকটার নাম রামদেও প্রসাদ। সুনীলকে যেন তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে জরুরি দরকার আছে। তখন স্কুল ছুটি হয়নি, ক্লাস চলছিল। প্রিন্সিপ্যাল বেয়ারা পাঠিয়ে ক্লাস থেকে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা তালগাছের মতো লম্বা লোক—মাথায় খুব অল্প চুল, মুখে বসন্তের দাগ—সেখানে বসেছিল। প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন, 'এর সঙ্গে বাড়ি যাও। তোমার বাবা একে পাঠিয়েছেন।'

সুনীল তার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি রামদেওপ্রসাদকে আগে কখনও দেখেছ?' সুনীল বলেছে, 'না'। তার সঙ্গে এই পর্যন্ত কথাবার্তা বলে আমি চলে এসেছি।'

কাবুল বলল, 'সে কী! চলে এলে কেন? কিভাবে খুন হয়েছে, কারা খুন করেছে— এসব জেনে নিলে না কেন?'

'কী করব বল। চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে সুনীলকে খুঁজে বার করতেই তো সন্ধে হয়ে গেল। বেশি রাত করলে তোদের সঙ্গে দেখা হতো না। তোরা ততক্ষণ এখানে বসে থাকতিস না। তাই সব খোঁজ না নিয়েই চলে আসতে হল।'

'বাকি খবর টবর কিভাবে নেওয়া যাবে?'

'আবার সুনীলের কাছে গেলেই হয়। কালই চল না—'

'কখন যেতে চাও?'

'দুপুরে।'

'তা হলে স্কুল কামাই করতে হয়।'

'হ্যাঁ।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করে কাল সকালে বলে যাব!'

'ঠিক আছে।'

বাড়ি ফিরে জামাইবাবুকে বলতে একদিনের জন্য স্কুল কামাইয়ের হুকুম পাওয়া গেল।

পর দিন সকালে কাবুলরা এসে ভন্টিদাকে বলল, 'অর্ডার পাওয়া গেছে। এখন বল কখন যাব?'

ভন্টিদা বলল, 'একটা দশের ট্রেনটা ধরিস। আমি তোদের খুঁজে নেব'খন।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল কাবুলরা। কামরাটা বেশ ফাঁকাই ছিল. মুখোমুখি দুটো জানালার ধারে তারা বসেছে।

হঠাৎ হাওয়ার ভেতর থেকে একটা চাপা গলা শোনা গেল, 'ভাবিস না, আমি তোদের সঙ্গেই আছি।'

পার্কসার্কাস স্টেশনে আসতেই ভন্টিদা বলল, 'নেমে পড়।' ওরা নামলে রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে ভন্টিদা সেই ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত গুমটি ঘরটায় নিয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে মানুষের চেহারা নিয়ে ডাকল, 'সুনীল, সুনীল—'

এক কোণ থেকে সাড়া পাওয়া গেল, 'বলুন—'

'আমার দুই বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। হাওয়ায় ভ্যানিস হয়ে থেকো না। নিজের চেহারাটা একটু দেখাও।'

হাওয়া জমাট বেঁধে একটা বছর আটেকের ভারি সুন্দর ছেলে হয়ে গেল। কাবুলদের সঙ্গে তার আলাপটালাপ করিয়ে দিয়ে ভন্টিদা বলল, 'কাল তোমার সঙ্গে কথা শেষ না করেই চলে যেতে হল। তাই আজ আবার এলাম।'

সুনীল কিছু না বলে তাকিয়ে রইল।

ভন্টিদা বলতে লাগল, 'তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি। এই যে কাবুল টাবুলকে দেখছ, এরা তোমার খুনিকে ধরার কাজ নিয়েছে। পুরিতে আমার খুনিকে ধরে ওরা অনেক প্রাইজট্রাইজ পেয়েছিল।

সুনীল অবাক হয়ে কাবুল টাবুলকে দেখতে লাগল।

ভন্টিদা বললে, 'তুমি ওদের সাহায্য কর, তোমার খুনিকে ধরে ফেলবে। নিশ্চয়ই তুমি চাও, তোমাকে যে মার্ডার করেছে, সে ফাঁসিতে ঝুলুক?'

সুনীল মাথা নাড়ল, 'নিশ্চয়ই। কী সাহায্য চাই বলুন।'

কাবুল বলল, 'রামদেওপ্রসাদ তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?'

সুনীল বলল, 'তা বলতে পারব না। তবে গাড়িতে উঠেই একটা রিভলবার দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলেছিল। তারপর রুমাল বার করে আমার নাকে চেপে ধরেছিল। কেমন একটা কড়া গন্ধ ছিল রুমালটায়। আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'জ্ঞান যখন ফিরল দেখি অন্ধকার ঘরে নোংরা বিছানায় শুয়ে আছি। দরজা জানালা বাইরে থেকে বন্ধ। ঘুলঘুলি দিয়ে শুধু একটু আলো আসছে। অনেকক্ষণ পর একটা লোক দরজা খুলে খাবার দিয়ে গেল। ক'টা বাসি রুটি, একটু গুড়, ছোলাসেদ্ধ। ভীষণ খিদে পেয়েছিল, তাই খেয়ে ফেললাম।'

কাবুল জিজ্ঞেস করল, 'যে লোকটা তোমার জন্যে খাবার এনেছিল সে কি রামদেওপ্রসাদ?'

সুনীল বলল, 'না, অন্য লোক।'

'তারপর কী হল, বল—'

'ওই অন্ধকার বাজে ঘরটায় আমাকে কয়েকদিন আটকে রাখা হয়েছিল। যে লোকটা খাবার নিয়ে আসত, একদিন সন্ধেবেলা সে এসে আমার চোখে টাইট করে কাপড় বেঁধে বলেছিল, 'চল ছোকরা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাব?' লোকটা বলল 'গেলেই বুঝতে পারবি।' ঘর থেকে বেরুতেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আরো কয়েকজন রয়েছে। ওরা আমাকে একটা গাড়িতে তুলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। যাতে চেঁচাতে না পারি সে জন্যে মুখে কাপড় গুঁজে ওরা আমাকে খুন করে।'

ভন্টিদা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় খুন হয়েছ বলতে পার?'

সুনীল বলল, 'না। চোখ বাঁধা ছিল, জায়গাটা দেখতে পাইনি। তবে কাছে রেললাইন ছিল। মনে হয়, জায়গাটা এই গুমটিটার কাছেই।'

কাবুল বলল, 'কী করে বুঝলে?'

আমাকে যখন ওরা খুন করল তখন পাশ দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছিল। আর সবে তো মরেছি। মরার পর কেউ মৃত্যুর জায়গা থেকে বেশি দূর যেতে পারে না। তাই মনে হয়, এখানে কোথাও আমাকে শেষ করা হয়েছে।'

ভণ্টিদা মাথা নাড়ল, 'সুনীল ঠিকই বলেছে।'

কাবুল এবার জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে খুন করেছে?'

সুনীল বলল, 'জানি না। তবে দুটো লোক ছিল। একজন আরেক জনকে বলছিল, বেঞ্জামিন, কাজ শেষ করে ছোরাটা মাটির তলায় পুঁতে ফেলিস। বেঞ্জামিন বলল, ঠিক আছে।'

'বেঞ্জামিনকে চেনো?'

'না। সেদিনই প্রথম তার নাম শুনলাম। তবে গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হয়েছিল। আগে যেন কোথায় শুনেছি—'

'একটু ভাবো—'

চোখ বুজে খানিকক্ষণ চিন্তা করল সুনীল। তারপর কাবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, মনে পড়ছে না।'

ভণ্টিদা বলল, 'বুঝলি কাবুলটাবুল, এই বেঞ্জামিনকে যেভাবেই হোক, খুঁজে বার করতে হবে।'

কাবুল বলল 'নিশ্চয়ই। তুমি একটু চেষ্টা কর ভণ্টিদা—'

ভণ্টিদা মাথা ঝাঁকালো, 'উঁহু, আমি সুনীলকে বার করেছি, তোরা বেঞ্জামিনকে বার করবি। কাজটা ভাগ করে করতে হবে।'

কথাটা খুব খারাপ বলেনি ভণ্টিদা। তাকে দিয়ে খাটিয়ে সবটুকু সুনাম, প্রশংসা এবং প্রাইজট্রাইজ কাবুলরা পাবে, এটা তো আর হয় না। তাদেরও কিছু করা দরকার। কাবুল বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু—'

'কী?'

'বেঞ্জামিনকে কোথায় খুঁজব?'

চুপচাপ সবাই ভাবতে লাগল। হঠাৎ কী মনে হতে ভণ্টিদা বলে উঠল, 'লোকটা যদি পুরনো বদমাশ হয়, খুঁজে বার করতে সুবিধে হবে।'

কাবুল জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম?'

'পুলিশের কাছে দাগী আসামীদের ছবি, ঠিকানা আর লাইফ হিস্ট্রি থাকে। হীরাপুরে ফিরে তোদের ব্যানার্জি কাকুকে ফোন করিস। হয়ত একটা খবর পেয়ে যাবি।'

'আচ্ছা—'

সন্ধেবেলা বাংলোয় ফিরে লালবাজারে ফোন করতেই ব্যানার্জিকে পেয়ে গেল কাবুল।

ব্যানার্জি বললেন, 'কী ব্যাপার কাবুল মাস্টার, কাজ কত দূর এগুলো?'

কাবুল বলল, 'খানিকটা এগিয়েছে।'

ফোনের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে ব্যানার্জি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাই নাকি! গুড। একটু ডিটেল বল তো—'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে কাবুল বলল, 'এখন কিছু বলব না কাকু। আরেকটু এগিয়ে নিই। তারপর আপনাকে জানাবো।'

'ঠিক আছে। এখন কী জন্যে ফোন করেছ বল।'

কাবুল জানালো, সে বেঞ্জামিন নামে একটা বদমাশ লোকের খবর জানতে চায়।

ব্যানার্জি বললেন, 'ফোনটা রেখে দাও। আধ ঘণ্টা বাদে আমিই তোমাকে রিং করব।'

আধ ঘণ্টা লাগল না, ঠিক বাইশ মিনিটের মাথায় ব্যানার্জি ফোন করে বললেন, 'এক বেঞ্জামিনের খবর পাওয়া গেছে। লোকটা ডেঞ্জারাস। চুরি ডাকাতি থেকে শুরু করে হেন খারাপ কাজ নেই যা সে করেনি। দু-একটা খুনও নাকি করেছে, তবে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জেল খেটেছে আট বার। থাকে পার্ক সার্কাসে। সামসুল হুদা রোডের একটা বস্তিতে।'

'ফোটো আছে?'

'আছে।'

'একটা ফটো আমাদের চাই।'

'ঠিক আছে, কাল সকালে পেয়ে যাবে।' বলে কী ভেবে ব্যানার্জি ফের শুরু করলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব কাবুল মাস্টার—'

কাবুল জানতে চাইল, 'কী?'

'এই লোকটাই কি খুনি?'

'এখন কিছু বলব না।'

'অলরাইট অলরাইট, পরেই বোলো। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি—'

'বলুন।'

'বেঞ্জামিন লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর। খুব সাবধান।'

পরের দিন খুব সকালে লালবাজার থেকে একজন পুলিশের লোক বেঞ্জামিনের ফোটো দিয়ে গেল। আজ রবিবার; জামাইবাবু অফিসে যাননি। কাবুলটাবুলেরও স্কুল নেই। বাবার পারমিশান নিয়ে বেঞ্জামিনের ফোটোটা পকেটে পুরে দশটার ট্রেনে দুই ভাই কলকাতায় গেল।

এর আগে কাবুলরা অনেক বার কলকাতায় এসেছে। এই শহরের অলিগলি, রাস্তাঘাট—সব তাদের মুখস্থ। বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে গড়িয়াহাটার মোড় পর্যন্ত হেঁটে স্টেট ট্রান্সপোর্টের দশ নম্বর বাস ধরে ওরা প্রথমে এল বেকবাগানের মুখে। বড় রাস্তা পেরিয়ে সামসুল হুদা রোডে ঢুকে অনেকটা এগোলে বিরাট এক বস্তি পাওয়া গেল। বস্তিটার উল্টোদিকে রাস্তার জলের কলটা ঘিরে অনেক লোকজন। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ স্নান করছে। কেউ কলের তলায় বালতি বসিয়ে জল ভরছে। কলের বাঁ দিকের রাস্তার ধার ঘেঁষে টালির চালের অনেকগুলো ঘর। সেখানে রয়েছে তিন চারটে দর্জির দোকান, চার-পাঁচটা চায়ের দোকান। এ ছাড়া তেলেভাজা, স্টেশনারি, পান-সিগারেটের দোকানও রয়েছে কয়েকটা। একটা ডাক্তারখানা— 'পপুলার ফার্মেসি'ও চোখ পড়ল। ছুটির দিন বলে রাস্তায় বেশ ভিড় রয়েছে।

টাবুল চাপা গলায় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করবি রে দাদা? সেই ডেঞ্জারাস লোকটার খোঁজে বস্তির ভেতর ঢুকবি নাকি?'

'উঁহু। মুখে তালা লাগিয়ে চুপচাপ সেই বিকেল পর্যন্ত বস্তিটার সামনে দিয়ে একবার ওমাথায় যাব, একবার এ মাথায়। আর চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখব। তুইও দেখবি। লোকটা যখন এই বস্তিতে থাকে তখন রাস্তায় একবারও কি বেরুবে না?'

'ধর যদি, খুনেটা দূরে কোথাও গিয়ে থাকে?'

'তা হলে আবার কাল আসতে হবে।'

বিকেল পর্যন্ত বস্তির সামনে দিয়ে কতবার যে কাবুলটাবুল হাঁটল তার হিসেব নেই। রাস্তার প্রত্যেকটা লোকের মুখ তারা ভালো করে দেখতে লাগল। চায়ের দোকান, দর্জির দোকানগুলোতে নজর রাখল, কিন্তু না, ফোটোটাতে যে চেহারা রয়েছে সে রকম একটা লোককেও কোথাও দেখা গেল না।

হেঁটে হেঁটে পায়ের ডিম দুটো টন টন করছে। টাবুল বলল, 'আর পারছি না, রে দাদা।'

কাবুল সায় দিয়ে বলল, 'আমিও পারছি না। আজ থাক, কাল আবার আসব। বদমাইশটা মনে হচ্ছে আজ বস্তিতে নেই।'

'এখন হীরাপুরে ফিরবি তো?'

'হ্যাঁ—'

কী বলতে গিয়ে থেমে গেল কাবুল। চোখ কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, 'এত কাছে এলাম। সুনীলের সঙ্গে একটু দেখাই করে যাই। তারপর পার্কসার্কাস স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে চলে যাব।'

'খুব ভাল হবে। চল—'

সেই গুমটিটায় এসে নাম ধরে ডাকতেই আগের মতো খানিকটা হাওয়া জমাট বেঁধে সুনীল হয়ে গেল। বলল, 'তোমরা এলে, ভণ্টিদা আসেনি?'

'না।' কাবুল বলতে লাগল, 'ভণ্টিদা তো এখন আসবে না। কাল কী বলল মনে নেই? বেঞ্জামিনকে খুঁজবার ভার আমাদের। যদ্দিন না তাকে বার করতে পারছি তদ্দিন ভণ্টিদা কিছু করবে না।'

'তোমরা কি বেঞ্জামিনের জন্যেই আজ কালকাতায় এসেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'পেলে?'

'উঁহু। ঠিকানাটা জোগাড় করেছি, কিন্তু তার খোঁজ পাইনি।'

সুনীলের বয়স আট হলেও তার দারুণ বুদ্ধি। বলল, 'বেঞ্জামিনকে তো তোমরা আগে দেখনি। তাকে চিনবে কী করে?'

কাবুল মিটি মিটি হেসে বলল, 'চেনার ব্যবস্থা না করে কি কলকাতায় এসেছি। এই দেখ—' বলে পকেট থেকে বেঞ্জামিনের ফোটোটা বার করে সুনীলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

সুনীল এক পলক ফটোটা দেখেই চমকে উঠল, 'এ কে!'

'এই তো বেঞ্জামিন—'

'উহু, এ হল রামদেও প্রসাদ। এই আমার বাবার নাম করে স্কুল থেকে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।'

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল কাবুলের। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'বুঝেছি। বেঞ্জামিনই রামদেও প্রসাদ নাম নিয়ে ধোঁকা দিয়েছে। এই লোকটাই আসল বদমাইশ। একে ধরতে হবে।'

সন্ধে হয়ে আসছিল। টাবুল বলল, 'সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছি। ঘুরে ঘুরে পা টন টন করছে। এবার বাড়ি যাব।'

কাবুল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল।'

সুনীল হঠাৎ ডাকল, 'কাবুলদা টাবুলদা—'

কাবুলরা জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ?'

'এখানে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ মশা কমড়ায়। ট্রেনের শব্দে ঘুমোতে পারি না। ওধারে চামড়ার কারখানা রয়েছে। বিশ্রী গন্ধ আসে। তোমাদের ওখানে ভাল জায়গা দেখে আমাকে নিয়ে যাও না।'

কাবুল বলল, ভন্টিদার সঙ্গে কথা বলে দেখি। সে রাজি হলে তার কাছে থাকতে পার।'

সুনীল বলল, 'খুব ভাল হয়। ভন্টিদাকে যেভাবে হোক রাজি করতেই হবে।'

'ঠিক আছে।'

পরের দিনও আবার কলকাতায় এল কাবুলরা। আসার আগে সুনীলের ব্যাপারে ভন্টিদার সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছে। ভন্টিদা খুব খুশি। সে একা থাকে। সুনীল এলে একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। ফেরার সময় তাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

সামসুল হুদা রোডে বারকয়েক টহল দেবার পর আজ কিন্তু বেঞ্জামিনকে দেখা গেল। বস্তি থেকে বেরিয়ে আসছে।

একটা মার্কামারা ধরনের লোককে দেখে চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল টাবুলের। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল। ভয়ে সে চেঁচাতে যাচ্ছিল। কাবুল তাড়াতাড়ি তার মুখটা চেপে ধরে নিচু গলায় বলল, 'চুপ। ওর দিকে তাকিয়ে থাকবি না। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে চোখের কোণ দিয়ে এমনভাবে দেখবি যেন খুনেটা বুঝতে না পারে।'

এদিকে বেঞ্জামিন রাস্তা পেরিয়ে ওধারে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। বলল, 'চা, বিস্কুট—'

আড়ে আড়ে তাকাতে তাকাতে চায়েব দোকানটার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল কাবুলরা।

বেঞ্জামিনের চোখদুটো লাল আর ফোলা ফোলা। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি, গালে কাটা দাগ। পরনে লুঙ্গি আর বুশ শার্ট। চুপচাপ সে চা খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে! মন হয় কেউ আসবে, তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

ঘুরতে ঘুরতে টাবুল বলল, 'এখন কী করবি?'

কী যে করা উচিত ভেবে উঠতে পারছিল না কাবুল। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ট্রাম রাস্তার দিক থেকে একটা ঝকঝকে নতুন নীল রঙের গাড়ি চায়ের দোকানটার সামনে

এসে দাঁড়াল। আর তক্ষুনি কাপটা ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়ল বেঞ্জামিন। বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু খুচরো বার করে দোকানদারের দিকে ছুড়ে দিয়ে রাস্তায় চলে এল।

বোঝা যাচ্ছে নীল গাড়িটা বেঞ্জামিনের জন্যই এসেছে। তার যা চেহারা এবং পেশাক টোশাক তাতে এরকম একটা গাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক।

গাড়িটায় ধবধবে পোশাক-পরা ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে দরজা খুলে দিতেই বেঞ্জামিন উঠে তার পাশে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ছুটতে শুরু করল।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গাড়ির পেছনে নম্বরটার দিকে চোখ পড়ল কাবুলের। ডব্লু বি এস ১০০০১১। নম্বরটা এমন যে দেখামাত্র মাথায় ঢুকে গেল। কাবুল ডিটেকটিভ গল্পে পড়েছে অনেক সময় গাড়ির নম্বর থেকে মালিককে বার করা যায়। এরকম একটা ভালো গাড়ি কেন বেঞ্জামিনের মতো বদমাশকে তুলে নিয়ে গেল, জানা দরকার। সে শুনেছে, পুলিশকে নম্বর বললে গাড়ির মালিকের নাম ঠিকানা বার করে দিতে পারে। কাবুল ঠিক করে ফেলল, রাত্তিরে ব্যানার্জিকাকুকে ফোন করবে।

নীল গাড়িটা দেখতে দেখতে সামনের ট্রাম রাস্তায় মিলিয়ে গেল। টাবুল পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবি?'

কাবুল বলল, 'সুনীলকে নিয়ে হীরাপুর যাব।'

গুমটিটায় গিয়ে ওরা সুনীলকে সঙ্গে করে সোজা পার্কসার্কাস স্টেশনে চলে গেল। সুনীলকে অবশ্য চোখে দেখা যাচ্ছিল না, সে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে ছিল।

ট্রেন এসে ফিসফিসিয়ে কাবুল ডাকল, 'সুনীল—'

পাশ থেকে সুনীল সাড়া দিল, 'এই যে কাবুলদা—'

'আমাদের সঙ্গে ট্রেনে ওঠ। খুব সাবধানে উঠবে।'

'আচ্ছা।'

ওরা সবাই সামনের কামরায় উঠে পড়ল।

হীরাপুরে ট্রেন থেকে সুনীলকে নিয়ে ওরা প্রথমে ভণ্টিদার কাছে গেল। সুনীলকে দেখে ভণ্টিদা খুব খুশি। খুব আদর করে পাশে বসিয়ে বলল, 'ঘুরে ঘুরে ভাল করে বাড়িটা দেখে নাও—'

সুনীল ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল।

ভণ্টিদা ফের বলল, 'পছন্দ হল?'

সুনীল ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

দুপুরবেলা বেরিয়ে নিউ মার্কেটের বড় বড় দোকান থেকে অনেক কেক টেক এনেছিল ভণ্টিদা। সেগুলো ঘরের এককোণে একটা তাকে রেখে দিয়েছিল। উঠে গিয়ে সে-সব পেড়ে এনে কাবুলদের ভাগ করে দিল। নিজেও ক'টা নিল।

খেতে খেতে ভণ্টিদা বলল, 'এবার বল, কলকাতায় আজ কী করলি? বেঞ্জামিনের খোঁজ পাওয়া গেল?'

কাবুল বলল, 'পেয়েছি।' কিভাবে পেয়েছে, সব জানিয়ে দিল।

ভণ্টিদা বলল, 'এবার কী করবি?'

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, নীল গাড়ির ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। বেঞ্জামিনের মতো বিচ্ছিরি চেহারার একটা লোককে ওই রকম দামি গাড়িতে কারা নিয়ে গেল, জানতে হবে। তার আগে ব্যানার্জিকাকুকে ফোন করে জেনে নেব গাড়িটা কার।'

'সেই ভালো। ওটা জেনে নে। তারপর কী করা যায় ভাবব।'

বাংলোয় ফিরেই লালবাজারে ফোন করল কাবুল। সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে ব্যানার্জিকাকুর গলা ভেসে এল, 'বল কাবুলমাস্টার, খুনের ব্যাপারে কত দূর কী করলে?'

কাবুল বলল, 'এখনও কিছু বলব না।'

'অলরাইট। কী জন্যে ফোন করলে সেটা বলবে তো?'

'হ্যাঁ। আপনাকে একটা গাড়ির নম্বর দিচ্ছি। গাড়িটা কার তা বলতে পারবেন?'

'নম্বরটা ঠিক থাকলে নিশ্চয় পারব।'

সেই নীল গাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিল কাবুল। ব্যানার্জি বললেন, 'কাল সকালে জানিয়ে দেব।'

পরের দিন সকালে ফোন করে ব্যানার্জি জানালেন, গাড়িটা হীরালাল সামতানির। বাড়ির নম্বর ২০০/১/৭/৯৮এ লেক ভিউ রোড।

নাম ঠিকানা একটুকরো কাগজে টুকে নিয়ে দুই ভাই তক্ষুনি ভণ্টিদার কাছে ছুটল।

ভণ্টিদা আর সুনীল সবে ঘুম থেকে উঠে তুড়ি দিয়ে হাই তুলছে। অদৃশ্য থাকার জন্য তাদের অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। তবে তুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাবুলদের দেখে ওরা মানুষের চেহারা নিয়ে বসল। ভণ্টিদা বলল, 'কি রে, এত সকালে কী মনে করে?'

টাবুল বলল, 'সেই নীল গাড়িটা কার, আমরা জানতে পেরেছি। খবরটা দেবার জন্যেই এলাম।'

'কার গাড়ি ওটা?'

'হীরালাল সামতানির।'

সুনীল ওধার থেকে বলে উঠল, 'তার বাড়ি লেক ভিউ রোডে?'

'কাবুল বলল, 'হ্যাঁ।'

এবার বাড়ির নম্বরটা বলল সুনীল।

সবাই অবাক। কাবুল বলল, 'তুমি কী করে জানলে?'

'হীরালাল সামতানি আমার কাকা।'

'আপন?'

'না। বাবার কিরকম ভাই।'

ভণ্টিদা বলল, 'ভীষণ গোলমেলে ব্যাপার। সুনীলের কাকার গাড়িতে বেঞ্জামিন ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন?

কাবুল বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো ভণ্টিদা?'

'কী?'

'হীরালাল সামতানির বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে। বেঞ্জামিন তার ওখানে যায় কি না, গেলে কী করে, কী কথা বলে—সব জানা দরকার।'

'ঠিক বলেছিস। নজর রাখতে শুরু করে দে।'

'উঁহু। ওটা তোমাকে করতে হবে।'

কী মনে পড়তে ব্যস্তভাবে ভন্টিদা বলল, 'রাইট। আমরা সেদিনই তো কাজটা ভাগাভাগি করে নিলাম। আমি সুনীলের খবর আনলাম, তারপর তোরা বেঞ্জামিন, নীল গাড়ি আর হীরালাল সামতানির খবর আনলি। এবার আমার পালা। আজ শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। কাল থেকে বেঞ্জামিন আর হীরালালের পেছনে লাগব।'

কাবুল বলল, 'তুমি ভীষণ কুঁড়ে ভন্টিদা। এ হল মার্ডার কেস। দেরি করলে কিন্তু খুনিকে ধরা যাবে না।'

সুনীল এবং টাবুলও তার কথায় সায় দিল।

ভন্টিদা মুখটা করুণ করে বলল, 'আচ্ছা তোরা যখন চাপ দিচ্ছিস তখন আজই যাব। রাত্তিতে এসে একবার খবর-টবর নিয়ে যাস।'

রাত্তিরে পোড়ো বাড়িটায় এসে কাবুলরা দেখল, ভন্টিদা কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। সুনীল আর সে মুখোমুখি বসে গল্প করছিল।

কাবুলদের দেখে ভন্টিদা বলল, 'আয় আয়, বস।' ওরা বসলে বলতে লাগল, 'আজ কলকাতায় গিয়ে কিছু হল না। হীরালাল সামতানির বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা নিমগাছের ডালে সকাল ন'টা থেকে সন্ধে পর্যন্ত পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। বেঞ্জামিনের পাত্তা নেই। সারাদিন বসে থাকাই সার হল।'

'হীরালাল সামতানিকে দেখনি?' টাবুল জিজ্ঞেস করল।

'দেখেছি। একবার নীল গাড়িটায় করে বেরিয়ে লেক মার্কেটে বাজার করতে গিয়েছিল। আমি 'ফলো' করে গেলাম। বাজার করে সেই যে বাড়ি গিয়ে ঢুকল, আর বেরোয়নি।'

কাবুলরা কিছু না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভন্টিদা ফের বলল, 'তোদের কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে বেঞ্জামিনটা হীরালালের কাছে নিশ্চয়ই আসবে। ও না এলে হীরারালই যাবে ওর কাছে। আমি আবার কাল কলকাতায় যাচ্ছি। দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়। কাল আবার আসিস।'

দিনকয়েক কলকাতায় ছোটাছুটি করল ভন্টিদা। কিন্তু আসল কাজ কিছুই হল না।

রোজই রাত্তিরে আসে কাবুলরা। ভন্টিদা বলে, 'না রে, বেঞ্জামিন আসেনি। তবে আমি ছাড়ছি না। আবার গিয়ে সেই নিমগাছে বসব।'

এভাবে ছ'দিন কেটে গেল। সপ্তম দিন রাত্তিরে ভন্টিদার কাছে যেতেই দেখা গেল সে ভীষণ উত্তেজিত। বলল, 'জানিস বেঞ্জামিনটা আজ হীরালালের কাছে এসেছিল। ওকে নিয়ে হীরালাল একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসল। আমিও হাওয়ায় মিশে গিয়ে ঘুলঘুলির ফাঁক

দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হল ডেঞ্জারাস ব্যাপার। বেঞ্জামিন কালও আবার হীরালালের কাছে আসবে। একটা কাজ করতে পারিস?'

সবাই দম বন্ধ করে শুনছিল। কাবুল বলল, 'কী?'

'ব্যাটারিতে চলে এমন একটা টেপ রেকর্ডার জোগাড় করে দিতে পারবি?'

'টেপ রেকর্ডার দিয়ে কী হবে?'

ভন্টিদা বুঝিয়ে দিল, 'খুনীকে ধরতে হলে প্রমাণ চাই। বেঞ্জামিন আর হীরালালের পেছনে লেগে থেকে ওদের কথাপার্তা টেপ করে নিতে হবে। সেটাই হবে ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।'

কাবুল বলল, 'আমাদের একটা টেপ রেকর্ডার আছে। কাল সকালে দিয়ে যাব।'

পরের দিন দু'বার পোড়ো বাড়িটায় এল কাবুলরা। সকালে এসে টেপ রেকর্ডার দিয়ে গেল। রাত্তিরে আসতেই ভন্টিদা সেটা চালিয়ে দিল। বেঞ্জামিন আর হীরালালের কথা টেপ করে এনেছে সে। শুনতে শুনতে চুল খাড়া হয়ে উঠল সবার।

বেঞ্জামিন বলছে, 'আপনার দূর সম্পর্কের ভাইপো সুনীলকে চুরি করে ক'দিন লুকিয়ে রাখলে বিশ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু মোটে পাঁচ-হাজার টাকা ঠেকিয়েছেন।

হীরালাল বলছে, 'কী করব বল। ভেবেছিলাম হুমকি দিয়ে সুনীলের বাবার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করব, কিন্তু ব্যাটা একটা পয়সাও দিল না। টাকা না পেলে কোত্থেকে দেব?'

'আপনার কথায় সুনীলকে খুন পর্যন্ত করলাম। আমার টাকা দিন। নইলে বিপদে পড়বেন।'

'একটা কাজ করতে পারবে? তা হলে অনেক টাকা পেয়ে যাবে।'

'কী কাজ?'

'সুনীলদের বাড়িতে আলমারিতে লাখ লাখ টাকা থাকে। সেগুলো যদি আনতে পারো দু'জনেরই লাভ। তোমার অর্ধেক, আমার অর্ধেক।'

'আমাকে দিয়ে খুন করিয়েছেন, এখন ডাকাতি করতে বলছেন। ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাকাতি করা কি সোজা কথা!'

'আ রে, আমার কথাটা শোনই না—'

'কী?'

'ওই ফ্ল্যাটে আমি রোজই যাই। ওখানকার সব ঘর আর আলমারির নকল চাবি করিয়ে তোমাকে দিয়ে দেব।'

'আপনি না সুনীলদের আত্মীয়! আগে সুনীলকে খুন করিয়েছেন, এখন ডাকাতি করাতে চাইছেন। চমৎকার।'

খ্যাক খ্যাক করে হেসে হীরালাল বলছে, 'আত্মীয়-টাত্মীয় বুঝি না। আমার অনেক টাকা দরকার। লাখ লাখ টাকা। তোমারও তো দরকার।'

বেঞ্জামিন বলছে, 'ঠিক আছে, চাবিগুলো করিয়ে দিন। তারপর একদিন গিয়ে সুনীলদের বাকি সর্বনাশটা করে আসব। তবে একটা কথা হীরালালবাবু—'

'কী?'

'আমার হাতে ছুরিটা বেশি চলে। সুনীলের বাবা যদি বাধা দেয় খতম হয়ে যাবে।'

এই সময় সুনীল কেঁদে উঠল, 'ওরা আমার বাবাকে খুন করে ফেলবে।'

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে সুনীলের পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভণ্টিদা বলল, 'কোনো ভয় নেই। ওরা কিছু করতে পারবে না। কালই হীরালাল আর বেঞ্জামিনের হাতে হাতকড়া পড়ে যাবে।' কাবুল টাবুলকে বলল, 'টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে কাল তোদের ব্যানার্জিকাকুর সঙ্গে দেখা করবি। ওটা চালিয়ে শুনিয়ে দিতে ভুলবি না।'

কাবুল বলল, 'কক্ষনো না।'

দু'দিন হল পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। এখন আর স্কুল নেই। পর দিন সাড়ে দশটার ট্রেনটা ধরে সোজা লালবাজারে চলে এল কাবুলরা। একে ওকে জিজ্ঞেস করে ব্যানার্জিকাকুর কাছে চলে গেল। ওদের দেখে ব্যানার্জিকাকু প্রথমটা অবাক। তারপর দারুণ খুশি হয়ে বললেন, 'আরে কাবুল মাস্টার টাবুল মাস্টার যে—এস এস—' ওরা বসলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসবে যে আমাকে জানাও নি তো। হঠাৎ কী মনে করে?'

কাবুল বলল, 'সুনীলকে যারা খুন করেছে তাদের সম্বন্ধে সব জানতে পেরেছি। প্রমাণও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

ব্যানার্জিকাকু সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'কারা খুন করেছে? কী প্রমাণ এনেছ?'

কাবুল টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিল। সবটা শোনার পর দুই ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাহাদুর ছেলে।' তারপরই ফোনে কাকে যেন বারোজন আর্মড পুলিশসুদ্ধ একটা ভ্যান রেডি করতে বললেন।

আধ ঘণ্টা পর কাবুল টাবুলকে সঙ্গে নিয়ে কালো একটা ভ্যানে করে বেরিয়ে পড়লেন ব্যানার্জিকাকু।

লেক ভিউ রোডের বাড়িতে হীরালাল সামতানিকে পাওয়া গেল। কিছুতেই হাতকড়া পরতে সে রাজি নয়। খুব হম্বি তম্বি করল সে, চেঁচাল। শাসিয়ে শাসিয়ে বলল, তার মতো ভদ্রলোককে এভাবে অসম্মান করার ফল ভাল হবে না। তারপর যেই ব্যানার্জিকাকু টেপ রেকর্ডার চালিয়ে তার গলাটা একটু শোনালেন অমনি হীরালালের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

হীরালালকে তুলে ভ্যান ছুটল পার্কসার্কাসে।

সেই বস্তিটির উল্টোদিকের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল বেঞ্জামিন। পুলিশের গাড়ি দেখে এক লাফে বেরিয়ে পঞ্চাশ মাইল স্পিডে ছুটতে লাগল। এদিকে রাইফেল হাতে পুলিশরা তার পেছনে দৌড়চ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'রুখো, রুখো। নেহী তো গোলি মারেগা।'

ব্যানার্জিকাকু এবং কাবুল টাবুলও দৌড়চ্ছে। কিন্তু বেঞ্জামিন যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। ওলিম্পিকে পাঠালে নিশ্চয়ই সে দৌড়ে রেকর্ড করে ফেলত।

ক্রমশ বেঞ্জামিন দূরে চলে যাচ্ছে। একবার সে যদি ওধারের রেল লাইন পেরিয়ে গোলক-ধাঁধার মতো চামড়ার কারখানার অলিগলির ভেতরে ঢুকে পড়ে আর তাকে ধরা যাবে না।

হঠাৎ কাবুলের পাশ থেকে টাবুল বলে উঠল, 'দাদা গুলতি।'

চোখের পলকে দুই ভাইয়ের গুলতি থেকে সাঁই সাঁই করে কাচের গুলি বেরিয়ে বেঞ্জামিনের মাথায় কাঁধে আট দশটা ঢিবি গজিয়ে দিল। মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বেঞ্জামিন। আর পুলিশগুলো ছুটে গিয়ে তার হাতে লোহার হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল।

এর পর দারুণ হই হই ব্যাপার। ইংরেজি বাংলা হিন্দি উর্দু গুরুমুখী চীনা—সব ভাষায় খবরের কাগজে কাবুল টাবুলের ছবি বেরুল।

গড়ের মাঠের সিকিভাগ জুড়ে একটা প্যান্ডেল বানিয়ে কলকাতার মানুষেরা তাদের সংবর্ধনা দিল। বিরাট সিংহাসনের মতো দুটি চেয়ারে তাদের বসিয়ে প্রথমে মালা পরানো হল। কপালে দেওয়া হল চন্দনের টিপ। এই সময় কাবুল টাবুল একটা করে বেশি মালা চেয়ে নিল।

নেতারা, মন্ত্রীরা, বড় বড় লোকেরা দুই ভাইয়ের প্রশংসা করে বক্তৃতা দিলেন। এমন ছেলে দেশের গর্ব, এরা জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে।

ওরা যা উপহার পেল তা রাখতে তিনখানা ঘর বোঝাই হয়ে যাবে।

সংবর্ধনার পর হীরাপুরে এসে প্রথমেই ওরা ছুটল ভন্টিদা আর সুনীলের কাছে। বলল, 'জানো আজ গড়ের মাঠে কী হয়েছে!'

ভন্টিদা বলল, 'জানি। সুনীল আর আমি হাওয়ায় মিশে তোদের সংবর্ধনা দেখতে গিয়েছিলাম।'

সেই বাড়তি মালা দুটো সঙ্গে করে এনেছিল ওরা। কাবুল একটা মালা ভন্টিদার গলায় পরিয়ে বলল, 'তোমারও সংবর্ধনা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার উপায় নেই। তুমি ছাড়া খুনিকে আমরা কিছুতেই ধরতে পারতাম না। তাই আমরাই তোমাকে সংবর্ধনা দিলাম।'

এদিকে টাবুল সুনীলের গলায় আরেকটা মালা পরিয়ে দিতেই সে বলল, 'এ কি, আমাকে মালা দিচ্ছ কেন টাবুলদা? আমি তো আর খুনি ধরতে সাহায্য করিনি।'

কাবুল বলল, 'তুমি খুন না হলে আমরা তো সংবর্ধনা আর এত উপহার পেতাম না ভাই। তাই—'

ভন্টিদা আঙুল তুলে বলল, 'রাইট।'

হীরাপুর 'ডগ শো'
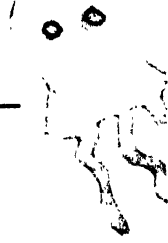
আজ রবিবার। স্কুল বন্ধ। তা ছাড়া বাড়ির মারাত্মক মাস্টার ধুরন্ধর সামন্তও পড়াতে আসবে না। সব দিক থেকেই আজ কাবুল টাবুলের ছুটি।

এখন বিকেল। দুই ভাই তাদের কোয়ার্টারের সামনে প্রকাণ্ড সবুজ মাঠে বসে আছে। ডান দিকে নিকু টিকু রুম্বা বুম্বারা বাঁশের গোলপোস্ট বানিয়ে টেনিস বল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ লাগিয়ে দিয়েছে। দেরি করে আসার জন্য কাবুল টাবুল কোন টিমেই চান্স পায় নি। বাঁ-দিকে তাদের বাবার বন্ধু সমীরকাকুর ছেলে বাবিয়া নানারকম কায়দা করে—কখনও হ্যান্ডেল ছেড়ে, কখনও দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে, কখনও সিটের ওপর শুয়ে — সাইকেল চালাচ্ছে। ভালো সাইকেল চালাতে পারে বলে বাবিয়ার ভীষণ ডাঁট।

সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচুর লোকজন সিনেমা হল কি মার্কেটের দিকে যাচ্ছে এখন। রাস্তাটা দক্ষিণে ক্রমশ উঁচু হয়ে যেখানে বিরাট একটা ব্রিজে গিয়ে মিশেছে অনেকে সেদিকেও বেড়াতে চলেছে। আর দেখা যাচ্ছে অগুনতি সাইকেল রিকশা। বেল বাজাতে বাজাতে এধার থেকে ওধারে তারা ছুটোছুটি করছে।

বাঁ হাতের দুটো আঙুল মুখে পুরে মার্বেল গুলির মতো গোল গোল চোখে একবার 'ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান' ম্যাচ আর বাবিয়াকে দেখছিল কাবুল। ভাবছিল পকেট থেকে গুলতি বার করে নিকু টিকুদের খেলার বারোটা বাজাবে, না বাবিয়ার ডাঁট ভাঙবে।

টাবুল কিন্তু এসব ভাবছিল না। সে ভীষণ উসখুস করছিল। একটু আগে কুড়িখানা লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা আর তিনটে আম দিয়ে বাড়ি থেকে টিফিন করে এসেছে। তবু মনে হচ্ছে কেমন যেন খিদে খিদে পাচ্ছে। দিনরাত টাবুলের খালি খাই খাই। সে জানে খাওয়ার ঘরের আলমারিতে কুড়িটা হিমসাগর আম, দু'বাটি ক্ষীর, এক থোকা লিচু, আনারসের জেলির আস্ত একটা শিশি, ঢাউস একটা ফ্রুট কেক আছে। কিন্তু আলমারির চাবিটা থাকে মায়ের আঁচলে। কী করে-সেটা সরানো যায়, ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতো পটপট করে ক'টা ঘাস তুলে মুখে পুরে ফেলেছিল। চিবিয়েই তক্ষুনি থু করে ফেলতে ফেলতে তার মনে হল, গরু-ছাগলরা কেন যে এইসব বিচ্ছিরি বাজে জিনিস খায়!

টাবুল একবার ভাবল, জেলি আর আম-টামের ব্যাপারে কাবুলের সঙ্গে পরামর্শ করবে। ওর ব্রেনটা দারুণ। ও ঠিক একটা প্ল্যান বার করে ফেলবে। আর তক্ষুনি দূর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'ডগ শো, ডগ শো, বিরাট কুকুর প্রদর্শনী।'

দুই ভাই এধারে ওধারে তাকাতেই দেখতে পেল, ব্রিজের দিক থেকে একটা সাইকেল রিক্শা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সিটে দুটো লোক বসে আছে। একজনের হাতে ছোট লাউডস্পিকার। সে সমানে বলে যাচ্ছে, 'যাঁদের ভালো ভালো দিশি বিদেশি কুকুর আছে, তাঁরা দলে দলে হীরাপুর ডগ শো'য়ে যোগদান করুন। শুধু কুকুরের চেহারা দেখালেই চলবে না। তাদের নানারকম খেলাও দেখাতে হবে। যে কুকুর সেরা খেলা দেখাতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পুরস্কার সাত শো টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ শো টাকা। প্রবেশ মূল্য নেই। হীরাপুরে এত বড় কুকুর প্রদর্শনী আর কখনও হয় নি। দলে দলে যোগ দিন। এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না। যোগদানের শেষ তারিখ এ মাসের পনেরো তারিখ।'

লাউডস্পিকারওলার পাশে যে বসে আছে সে রাস্তার লোকজনের হাতে ছাপানো হ্যান্ডবিল বিলি করছে। নিশ্চয়ই হ্যান্ডবিলগুলোতে 'ডগ শো'য়ের ব্যাপারটা লেখা আছে।

গোল গোল চোখে খানিকক্ষণ লোক দুটোকে দেখল কাবুল। তারপর টাবুলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'একটা হ্যান্ডবিল নিয়ে আয় তো।'

টাবুল জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

কাবুল বলল, 'আমরা ডগ শো'তে নাম দেব।'

'ডগ শো'য়ে নাম দিবি!' টাবুল অবাক।

'হ্যাঁ।'

'আমাদের তো কুকুর নেই। ডগ শো'য়ে কী দেখাবি তা হলে?'

'আঃ। খালি বড়দের মুখে মুখে তক্কো। যা বলছি তাই কর। কুকুর একটা ঠিক ম্যানেজ করে ফেলব।'

টাবুল জানে, কাবুল না পারে এমন কাজ নেই। কুকুর তো কুকুর, ইচ্ছা করলে সে কুমির, হাঙর, সাদা হাতি, এমন কি শুশুক পর্যন্ত জোগাড় করে ফেলতে পারে। আর কিছু না বলে টাবুল উঠে পড়ল। তারপর রাস্তায় গিয়ে একটা হ্যান্ডবিল নিয়ে এল। সেটার একদিকে ইংরেজিতে 'ডগ শো' সম্পর্কে নানারকম নিয়ম-টিয়ম ছাপানো রয়েছে, আরেক দিকে বাংলায়।

বাংলার দিকটা ভালো করে পড়ে নিল কাবুল। তারপর সেটা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে বলল, 'এবার ভন্টিদার কাছে চল।'

টাবুল বলল, 'ভন্টিদার কাছে কেন?'

'ডগ শো'য়ে নাম দিতে যাচ্ছি। এত বড় একটা ব্যাপার। ভন্টিদার হেল্প না পেলে চলবে না।'

'চল—'

দুই ভাই উঠে পড়ল। তারপর ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ওরা ভন্টিদার কাছে পৌঁছবার আগে তার সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক। তার ভাল নাম লালকমল জোয়ারদার, ডাকনাম ভন্টি। ভন্টিদা আসলে আমাদের মতো জ্যান্ত মানুষ না। মরবার পর মানুষ যা হয়ে যায় সে হল তা-ই। কাবুল টাবুলের সঙ্গে তার

আলাপ হয়েছিল পুরিতে। পুরি থেকে ভন্টিদা ওদের সঙ্গে এই হীরাপুরে চলে আসে। সামনে ওই যে বিরাট ব্রিজটা রয়েছে তার তলায় রেল লাইনের ধারে একটা পোড়ো দোতলা বাড়িতে ভন্টিদার থাকার জায়গা করে দিয়েছে কাবুলরা। আসলে যারা ভন্টিদার মতো তাদের পক্ষে পোড়ো বাড়ি, বট শ্যাওড়া কি তালগাছ ছাড়া আর কোথাও থাকা সম্ভব নয়।

রেল লাইনের পোড়ো বাড়িটার আশেপাশে আর কোনো বাড়িঘর নেই। চারদিকে নানারকম ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কাবুল টাবুল বাড়িটায় ঢুকল। তারপর সোজা দোতলায় উঠে এল।

বাড়িটার দরজা জানালা বলতে কিচ্ছু নেই। দেওয়ালের বালিটালি খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ভাঙাচোরা, মেঝের সিমেন্ট উঠে এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে।

ভন্টিদা আসার পর দোতলায় দু'খানা ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছে কাবুলরা। অন্য ঘরগুলো ধুলোবালি এবং নানারকম আবর্জনায় বোঝাই।

দোতলায় উঠে কাবুল বলল, 'ভন্টিদা, আমরা এসে গেছি।'

হাওয়ার ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তারপর দশ সেকেন্ডও লাগল না, খানিকটা বাতাস জমাট বেঁধে একটা গোলগাল মধ্যবয়সী লোক হয়ে গেল।

কাবুল বলল, 'একটা ভীষণ দরকারে তোমার কাছে এলাম ভন্টিদা—'

ভন্টিদা বলল, 'দরকারের কথাটা পরে শুনছি। আগে কিছু খেয়ে টেয়ে নে।'

ভন্টিদা ভীষণ রকমের আয়েশি। ভালো খাবার চাই, শোবার জন্য ভালো বিছানা চাই। মরার পরও এসব অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। কাবুলরা তাই বাড়ি থেকে একটা দামি মাদুর, শতরঞ্চি, তোষক, ফুল-টুল আঁকা নরম জয়পুরী চাদর, ওয়াড়-দেওয়া লেপ, মাথার বালিশ, পাশ বালিশ, খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করবার টুথপিক—এমনি অনেক জিনিস দিয়ে গেছে। তবে তার খাওয়া-দাওয়ার জন্য কাবুলদের কিছু করতে হয় না। নিজের খাবার নিজেই সে জোগাড় করে নেয়।

যাই হোক, ভন্টিদা ঘরের কোণ থেকে শতরঞ্চি বার করে মেঝেতে পেতে দিল। তারপর কুলুঙ্গি থেকে তিনটে বড় বড় মাটির ভাঁড় আর বিরাট একটা প্যাকেট নিয়ে এল। কাবুল টাবুল তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের বসতে বলে নিজেও বসে পড়ল।

মাটির ভাঁড় তিনটে রাবড়িতে বোঝাই। প্যাকেটে রয়েছে চিকেন কাটলেট, ফিশ রোল আর স্যান্ডউইচ। দেখতে দেখতে কাবুল টাবুলের চোখ লোভে চকচক করতে লাগল।

ভন্টিদা বলল, 'হাঁ করে বসে রইলি কেন? খা—'

কাবুল টাবুলরা যখনই এখানে আসে, কিছু না কিছু পায়ই। কিন্তু তাই বলে রাবড়ি? চিকেন কাটলেট, ফিশ রোল? খেতে খেতে কাবুল বলল, 'এ সব তুমি পেলে কোথায়?'

ভন্টিদা বলল, 'আজ একটু কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে পার্ক স্ট্রিটে হাজির হলাম। ওখানে বড় বড় দামি দামি সব রেস্তোরাঁ হয়েছে। একটা রেস্তোরাঁ থেকে

কাটলেট-টাটলেট তুলে নিলাম। পার্ক স্ট্রিট থেকে গেলাম বড়বাজারে। এখানে একটা মিষ্টির দোকান থেকে রাবড়ি নিয়ে এলাম। নিজেকে হাওয়ায় ভ্যানিশ করে রেখেছিলাম তো। কেউ আমাকে দেখতে পায় নি। তাই জিনিসগুলো আনতে সুবিধে হল।'

টাবুল ফিশ রোলে প্রকাণ্ড কামড় বসিয়ে বলল, তোমার কত সুবিধে ভন্টিদা, ইচ্ছে হল তো স্রেফ হাওয়ায় মিশিয়ে গেলে, আবার ইচ্ছে হল তো মানুষের মতো চেহারা নিয়ে সবার সঙ্গে ভিড়ে গেলে। এই রকম যদি আমরা হতে পারতাম, পৃথিবীর সব রেস্তোরাঁ আর মিষ্টির দোকান সাবাড় করে দিতাম।'

ভন্টিদা টাবুলের পিঠে আদর করে টোকা দিতে দিতে বলল, 'দুঃখু করিস না টাবলে, আগে মর। তারপর আমার মতো হতে পারবি। না মরলে এই সুবিধাটা পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে কাবুলের দিকে ফিরল, 'এবার তোর দরকারি কথাটা শুনি—'

কাবুল বলল, 'দারুণ মুশকিলে পড়ে গেছি ভন্টিদা—'

'কি রকম?'

'ডগ শো'য়ের ব্যাপারটা খুলে বলল কাবুল।

সব শুনে ভন্টিদা বলল, 'এর ভেতর মুশকিলের কী আছে? একটা কুকুর জুটিয়ে 'ডগ শো'য়ে নাম দিয়ে দে—'

'আমাদের যে কুকুর নেই।'

'তোদের না থাক, তোদের বন্ধুদের তো আছে।'

একটু ভেবে কাবুল বলল, 'না, আমার বন্ধুদের কারো কুকুর নেই। একজনের বেজি আছে, একজনের টাট্টু, আরেক জনের বাঁদর।'

'তোর বাবার বন্ধুদের নেই?'

কাবুলের মনে পড়ে গেল। সে ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'সমীরণকাকু মৃন্ময়কাকু অশোককাকু আর বিকাশকাকুর কুকুর আছে।'

ভন্টিদা বলল, 'এই তো হয়ে গেল। কাকুদের কারো কাছ থেকে একটা কুকুর শো'য়ের দিন ধার নিবি। শো হয়ে গেলে ফেরত দিবি।'

'তা হলে তো হবে না। কুকুরের খেলাও দেখাতে হবে। শোয়ের দিন ধার নিলে কুকুরের খেলা দেখাব কী করে?'

'তবে এক কাজ কর, আগেই ধার নে।'

'তা না হয় নিলাম। কিন্তু কুকুরকে কে খেলা শেখাবে?'

'আমার কাছে নিয়ে আসিস, শিখিয়ে দেব। একসময় আমি ডগ ট্রেনার ছিলাম।'

রাবড়ি-টাবড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাবুল বলল, 'তা হলে আমরা এখন বাবার বন্ধুদের বাড়ি চলে যাই।'

ভন্টিদা বলল, 'যা।'

'কুকুর পেলেই কিন্তু চলে আসব।'

'আচ্ছা।'

কাবুল টাবুল উঠে পড়ল।

কিন্তু ওদের বাবার চার বন্ধু—মৃন্ময়কাকু সমীরণকাকু বিকাশকাকু এবং অশোককাকু—কেউ কুকুর দিল না। সবাই জানালো হীরাপুর 'ডগ শো'য়ে তারাও নাম দেবে। কাজেই কুকুর ধার দিতে পারবে না।

খুবই ভাবনার কথা। কাবুল টাবুল আবার ভন্টিদার সেই পোড়ো বাড়িটায় ফিরে এল।

ভন্টিদা মানুষের চেহারা নিয়ে শতরঞ্চির ওপর বসে ছিল। কাবুল টাবুলকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, তোরা খালি হাতে চলে এলি। কুকুর কোথায়?'

কাবুল জানালো, তার বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে কুকুর পাওয়া গেল না।

'বড় মুশকিল হয়ে গেল যে।' বলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল ভন্টিদা। আর ভাবতে ভাবতে তার মুখ আলো হয়ে উঠল। এবার সে বলল, 'হয়েছে।'

কাবুল টাবুল একদৃষ্টে ভন্টিদার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না তাদের। একসঙ্গে দু'জনে বলে উঠল, 'কী হয়েছে ভন্টিদা?'

'ভালো কুকুর যখন পাওয়া গেল না, রাস্তা থেকেই একটা কুকুর ধরে নিয়ে আয়।'

কাবুল টাবুল অবাক। তারা বলল, 'কিন্তু সেগুলো তো নেড়ি কুকুর —'

ভন্টিদা বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। নেড়ি কুকুরকেই সাত দিনে এমন ট্রেনিং দেব যে অ্যালসেশিয়ান আর বুলডগকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।'

কাবুল টাবুলের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারা বলল, 'ঠিক তো ভন্টিদা?'

'ঠিক ঠিক। দেখে নিস তোরা।'

পরের দিনই স্কুল ছুটির পর কাবুল টাবুল 'ডগ শো'য়ে নাম দিয়ে এল। নাম লেখাবার পর থেকে শুরু হল কুকুর খোঁজা।

স্কুল, বাড়ির মাস্টারের কাছে পড়া—এ সবের পর খুব বেশি একটা সময় পায় না কাবুল টাবুল। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে কুকুর ধরার জন্য বেরিয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু ব্যাপারটা যত সোজা ভাবা গিয়েছিল তত সোজা নয়। হীরাপুরে সব মিলিয়ে একশো রাস্তা। আর এই একশো রাস্তায় আছে মোট আটশো বাহাত্তরটা কুকুর। এই রাস্তার কুকুরগুলো সবাই কাবুল টাবুলকে হাড়ে হাড়ে চেনে। কেননা, এদের ওপরেই গুলতির টিপ প্র্যাকটিশ করে দু'জনে হাত পাকিয়েছে। আধ মাইল দূরে দুই ভাইয়ের গন্ধ পেলেই ওরা ল্যাজ গুটিয়ে উধাও হয়ে যায়।

কাবুল টাবুল বুঝতে পারল, এভাবে হবে না। ওরা দিনকয়েক রাস্তার কোণে পাউরুটি সন্দেশ বিস্কুট সাজিয়ে, হাতে বকলস আর লোহার লম্বা শেকল নিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। খাবারের লোভে যদি কোনো কুকুর আসে গলায় বকলস পরিয়ে লোহার চেইন বেঁধে ফেলবে।

দু-একটা কুকুর এলেও খাবারগুলো খেতে গিয়ে কিসের একটা গন্ধ পেল যেন। বোধহয় কাবুল টাবুলের। তারপর চমকে উঠে এদিক সেদিক তাকিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে চোঁ চাঁ দৌড়।

ব্যাপার স্যাপার দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ল কাবুল টাবুল। বাবার বন্ধুরা তো ভালো জাতের কুকুর দিলই না, রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে! কুকুরই যদি না পাওয়া যায়, 'ডগ শো'য়ে গিয়ে কী দেখাবে?

অগত্যা দুই ভাই ভন্টিদার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। সব শুনে ভন্টিদা বলল, 'দুনিয়ার সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়, নইলে দরকারের সময় উপকার পাওয়া যায় না। গুলতি মেরে মেরে সবগুলো কুকুরকে চটিয়ে রেখেছিস। এখন তারা কেন সাহায্য করবে?'

মুখটা ভীষণ করুণ করে কাবুল বলল, 'তা হলে কী হবে ভন্টিদা, আমাদের কি 'ডগ শোয়ে' নাম লেখানোই সার হল?'

ভন্টিদা বলল, 'দাঁড়া একটু ভেবে নিই।' বলে গালে হাত দিয়ে চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, 'এক কাজ কর, হীরাপুরের সব রাস্তার কুকুর তোদের চেনে। এখানে হবে না। তোরা ট্রেনে করে পরের স্টেশন সুলতানগঞ্জে চলে যা। ওখানকার কুকুররা তোদের চেনে না। সুলতানগঞ্জ থেকে একটাকে ধরে নিয়ে আয়।'

এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। ভন্টিদার পরামর্শটা বেশ ভালো লাগল। কাবুল টাবুল আর দেরি করল না। বকলস, লোহার চেইন, পাউরুটি, কেক, এইসব নিয়ে সেইদিনই সুলতানগঞ্জে চলে গেল। পাউরুটি কেক নেবার কারণ আছে। ওগুলোর লোভ দেখিয়ে কুকুর ধরা। কিন্তু সারাদিন সেখানকার চৌষট্টিটা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে একটাকেও ধরা গেল না। হীরাপুরের মতো সুলতানগঞ্জের কুকুরগুলোও কাবুল টাবুলকে দেখামাত্র দৌড় লাগিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। খুব সম্ভব হীরাপুরের কোনো কুকুর এখানে এসে তাদের সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে গিয়েছিল। হয়ত কাবুল টাবুলের চেহারার একটা ডেসক্রিপশনও দিয়ে যা থেকে খুব সহজেই তাদের চেনা যায়।

দুই ভাই এবার আর পরামর্শের জন্য ভন্টিদার কাছে গেল না। নিজেরাই মাথা খাটিয়ে পরের দিন সুলতানগঞ্জের আরো দুটো স্টেশন পর হৃদয়পুরে চলে গেল। আর কী আশ্চর্য, স্টেশন থেকে বেরিয়ে দু'পা যেতে না যেতেই একটা রোগা লোম-ওঠা কুকুর কেক এবং পাউরুটির লোভে কান আর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাবুল টাবুলের সামনে এসে দাঁড়াল।

কাবুল কুকুরটাকে পাউরুটি ছিঁড়ে দিতে দিতে টাবুলকে বলল, 'টাবলে, এটার গলায় বকলস পরিয়ে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেল।'

টাবুল খুঁতখুঁত করতে লাগল, 'এই মরকুটে লোম ওঠাকে 'ডগ শো'য়ে দেখাবি নাকি?'

'হ্যাঁ। দেখলি তো হীরাপুর আর সুলতানগঞ্জে আমরা কত ঘুরলাম কিন্তু কোনো কুকুর আমাদের সাহায্য করল? এটা যখন নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে তখন একেই 'ডগ শো'য়ে নামিয়ে দেব। ওর কাছে আমরা—আমরা—ভালো কথায় কী যেন বলে'—সঠিক কথাটা মনে করতে না পেরে একটু ভাবল কাবুল। তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ, কৃতজ্ঞ।'

ফেরার ট্রেনে কুকুরটাকে নিয়ে হীরাপুরে নেমেই কাবুল টাবুল ভন্টিদার কাছে চলে গেল। বিচ্ছিরি চেহারার এই রকম একটা জন্তুকে দেখে ভন্টিদা বলল, 'এটা কী ধরে এনেছিস!'

কেন কুকুরটাকে এনেছে, কাবুল জানিয়ে দিল। শুনে ভন্টিদা বেজায় খুশি। বলল, এই তো চাই। যার কৃতজ্ঞতা নেই সে মানুষই না।'

ঝোঁকের মাথায় কুকুরটাকে ধরে এনেছে ঠিকই, তবু মনে মনে চিন্তা ছিল কাবুলের। বলল, 'এই লোম ওঠাকে 'ডগ শো'য়ে নামানো যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই যাবে। আমার কাছে যখন নিয়ে এসেছিস তখন এটাকে অ্যালসেশিয়ান, ফক্সটেরিয়ান আর বুলটেরিয়ারের জেঠামশাই বানিয়ে দেব। ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। খাইয়ে খাইয়ে দশ দিনের ভেতর নেড়িটাকে কী করে ফেলি, দেখিস।'

'ওকে খেলা শেখাবে না?'

'শেখাব রে, শেখাব। কিছু ভাবিস নি। শুধু বাড়ি থেকে একটা ডগ সোপ, ব্রাশ, একটা টেনিস বল আর সরু একটা বেত দিয়ে যাস। আজ কুকুরটা রেস্ট নিক। কাল থেকে ওর ট্রেনিং শুরু করব।'

পরের দিন রবিবার। সকাল হতে না হতেই কাবুল টাবুল ভন্টিদার আস্তানায় হাজির হয়ে গেল। কাল সন্ধেবেলা অদৃশ্য হয়ে হীরাপুরের বাজারে গিয়েছিল ভন্টিদা। সেখান থেকে দুধ মাংসের চপ ছানা পাঁউরুটি সন্দেশ—এইসব এনে রেখেছিল। কাবুল টাবুলরা দুই ভাই, ভন্টিদা নিজে আর কুকুরটা—চারজনে মিলে প্রথমে খেয়ে নেওয়া হল।

তারপর সাবান দিয়ে কুকুরটাকে স্নান করিয়ে ব্রাশ দিয়ে গা আঁচড়ে আঁচড়ে পোকা বার করা হল।

এত আদরযত্ন কোনোদিন পায় নি কুকুরটা। সে সমানে কেঁউ কেঁউ করে যেতে লাগল।

চানটানের পর গা শুকোবার জন্য ভন্টিদা কুকুরটাকে রোদে বেঁধে রেখে এসে বলল, ট্রেনিং স্টার্ট করার আগে ওটার একটা নাম দেওয়া যাক।'

কাবুল টাবুল জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম দেবেন?'

চিন্তা-টিন্তা করে ভন্টিদা বলল, 'ইথিওপিয়ান হারকিউলিস। তবে আমরা হারকিউলিস বলেই ডাকব।'

কাবুল বলল, 'এত জায়গা থাকতে ইথিওপিয়ার নাম দিলেন কেন?'

'তোদের আগেই বলেছি আমি ম্যাট্রিক আর স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছি। দু'বারই জিওগ্রাফিতে ইথিওপিয়ার রাজধানীর নাম লিখতে বলেছিল। একবার লিখেছিলাম লন্ডন, একবার মাদ্রাজ। সাতের বেশি কোনোবার জিওগ্রাফিতে পাইনি। তবে ইথিওপিয়াটাকে বড় ভালো লেগে গেছে রে। 'ডগ শো'য়ের সময় তোদের যখন জিজ্ঞেস করবে এটা কী কুকুর, বলবি ইথিওপিয়ান ডগ।'

'কিন্তু ওটাকে দেখলেই তো বোঝা যায় ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুকুর।'

'ওটা কি আর এই রকম থাকবে! দেখবি, সাজিয়ে গুজিয়ে ওটাকে কী বানিয়ে দিই। কিন্তু আর দেরি নয়। এবার ট্রেনিং শুরু করা যাক।'

কুকুরটাকে ফের ঘরে এনে ভন্টিদা স্নেহমাখা গলায় বলল, 'বয়, স্ট্যান্ড আপ—'

কুকুরটা শুধু বলল, 'কেঁউ—'

'বয়, সিট ডাউন—'

'কেঁউ—'

'কিছু ভয় নেই। লক্ষ্মী মানিক আমার। বয় স্ট্যান্ড আপ—'

উত্তর পাওয়া গেল, 'কেঁউ—'

এবার বিরক্ত হল ভন্টিদা। বলল, 'আমি খুব নরম লোক, কিন্তু দরকার হলে কঠোর হতে পারি। স্ট্যান্ড আপ—'

'কেঁউ—'

'নাঃ, কঠোর না হয়ে উপায় নেই দেখছি।' বলে ঘরের কোণ থেকে কাবুলদের আনা বেতটা নিয়ে এল। তারপর কড়া গলায় বলল, 'স্ট্যান্ড আপ—'

বেত-টেত দেখে কুকুরটা বেজায় ঘাবড়ে গেল। ল্যাজটা পেছনের দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে ভীরু চোখে আড়ে আড়ে ভন্টিদাকে দেখতে দেখতে বলল, 'কুঁই—'

'দারুণ ঠ্যাটা দেখছি। অতি অবাধ্য। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আস্ত বাঁদর হয়ে উঠেছে। কোনো কিছু শেখার, জানার ইচ্ছা নেই।' বলেই হুমকে উঠল ভন্টিদা, 'স্ট্যান্ড আপ—'

কুকুরের জবাব এল, 'কুঁই—'

কী ভেবে ভন্টিদা এবার বলল, 'বুঝেছি, তোর এখন 'স্ট্যান্ড আপ' 'সিট ডাউন' করতে ভাল লাগছে না। ঠিক আছে অন্য খেলাই শুরু করা যাক।' বলে কাবুলদের আনা সেই বলটা বার করে ঘরের আরেক কোণে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'বয়, বলটাকে আমার কাছে নিয়ে এস। ব্রিং দি বল—'

কুকুরটার লেজ আরো ঢুকে গেল। চোখ নামিয়ে সেটা শুধু বলল, 'কুঁই—'

'যাও বলছি—'

'কুঁই—'

এইভাবে কুকুরের ট্রেনিং চলতে লাগল। দিন সাতেক পরেও দেখা গেল ভন্টিদা যেখান থেকে শুরু করেছিল ঠিক সেইখানেই পড়ে আছে।

তার মানে ভন্টিদা যখন বলে, 'স্ট্যান্ড আপ', কুকুরটা বলে, 'কেঁউ—'। ভন্টিদা যখন বলে, 'সিট ডাউন', কুকুরটা বলে, 'কুঁই'। বল ছুড়ে দিয়ে আনতে বললে আনে না, ল্যাজটা শুধু তার পেছনের দুই পায়ের ভেতর ঢুকে যায়।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার দেখা গেল। ভন্টিদা কুকুরটাকে সত্যিকার হারকিউলিস বানাবার জন্য প্রচুর খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেছিল। মাছ দুধ ফল আইসক্রিম মাংস ছানা—এমনি নানা জিনিস। কিন্তু ভন্টিদার তর্জন গর্জনের জন্যই কিনা কে জানে, ভয় পেয়ে সেটা সারাদিন সিঁটিয়ে থাকে। অমন ভালো ভালো জিনিস ছুঁয়েও দেখে না। ফলে সেটা আরো রোগা, আরো ঘিয়ে ভাজা হয়ে যেতে থাকে।

দেখে শুনে ঘাবড়ে গেল কাবুলরা। বলল, 'এটা খেলা শিখল না। তার ওপর গায়ের লোম আরো উঠে গেল। এটাকে নিয়ে কী করে 'ডগ শো'য়ে যাব?'

ভন্টিদা হাত তুলে বলে 'কুছ পরোয়া নেই। তোদের 'ডগ শো' কবে?'

'পরশু বিকেল।'

'তার মধ্যে হারকিউলিসকে কী বানিয়ে দিই দেখিস।'

কাবুল টাবুল আর কিছু বলল না তবে ভন্টিদার কথায় খুব একটা ভরসা পেয়েছে বলে মনে হল না।

দেখতে দেখতে ডগ শো'য়ের দিন এসে গেল। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কাবুল টাবুল ভন্টিদার কাছে চলে গেল। এসেই অবাক। ভন্টিদা লাল নীল সবুজ হলুদ, এমনি নানা রঙের প্রচুর লোম, চমৎকার নতুন বকলেস, আঠা, ক্লিপ, কুকুরদের মুখ আটকাবার জন্য নাইলনের জাল নিয়ে বসে আছে।

কাবুলরা জিজ্ঞেস করল, 'এসব দিয়ে কী হবে ভন্টিদা?'

ভন্টিদা বলল, 'হারকিউলিসকে সাজানো হবে।'

'এগুলো পেলে কোথায়?'

'কাল সন্ধেবেলায় তোরা চলে যাবার পর কলকাতায় গিয়েছিলাম। চিৎপুরে একটা মেক-আপের দোকানে ঢুকে নিয়ে এসেছি। ওরা নানা রকম সাজের জিনিস বিক্রি করে। তোরা হারকিউলিসকে ধর। আমি ওকে সাজাতে শুরু করি।'

কাবুল হারকিউলিসের গলার দিকটা ধরল, টাবুল ধরল কোমর। ধরে তাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখল। আর ভন্টিদা তার মুখে নাইলনের জাল পরিয়ে আঠা আর ক্লিপ দিয়ে সারা গায়ে লোম লাগিয়ে দিতে লাগল।

দু'তিন ঘন্টা পর হারকিউলিসকে আর চেনা গেল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বড় বড় লাল নীল হলুদ সবুজ লোম ঝালরের মতো দেখাচ্ছে। ঘিয়ে ভাজা লেজটা সাদা লোমে এখন ঢাকা।

সাজগোজ হয়ে যাবার পর গলায় নতুন বকলস পরিয়ে ভন্টিদা বললেন, 'এখন আর হারকিউলিসকে নেড়ি কুত্তা বলে মনে হচ্ছে?'

'না ভন্টিদা, সত্যি তুমি ম্যাজিক জানো।' হারকিউলিসের এই নতুন বাহার দেখে কাবুল টাবুল বেজায় খুশি। তবু তারা জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তার নেড়ি কুকুরকে তো ইথিওপিয়ান হারকিউলিস বানিয়ে দিলে। কিন্তু ও যে কোনো খেলাই শিখল না। 'ডগ শো'য়ে গিয়ে হারকিউলিস কী দেখাবে?'

ভন্টিদা বলল, 'সে কথাও আমি ভেবে রেখেছি। কাছে আয়, তোদের কানে কানে বলি—' কাবুল টাবুল এগিয়ে এলে নিচু গলায় তাদের কিছু বলল।

শুনতে শুনতে হাসি ফুটল দুই ভায়ের মুখে। তারা লাফিয়ে উঠল, 'দারুণ হবে।'

'বলছিস!'

'হ্যাঁ, ভন্টিদা।'

'তা হলে বিকেলে 'ডগ শো'য়ের আগে ভালো ড্রেস করে চলে আসিস। তখন হারকিউলিসকে নিয়ে যাবি। আমিও তোদের সঙ্গে যাব।'

'কিন্তু তোমাকে যে সবাই দেখে ফেলবে।'

'আরে বাবা, যাতে দেখতে না পায় সেইভাবেই যাব।'

'বুঝেছি।'

বিকেলে ফুলপ্যান্ট টাই-ফাই পরে কাবুল টাবুল হারকিউলিসকে নিতে এল।

ভন্টিদা বলল, 'ওকে কোলে তুলে নে।' বলতে বলতে তার হাত পা আস্তে আস্তে গা থেকে আলগা হয়ে খসে গেল। তারপর কুয়াশার মতো ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

একটু পরে হাওয়ার ভেতর থেকে ভন্টিদার গলা ভেসে এল, 'চল এবার।'

সবাই বেরিয়ে পড়ল।

'ডগ শো'য়ের জন্য হীরাপুরের খেলার মাঠে বিরাট প্যান্ডেল খাটানো হয়েছিল। প্যান্ডেলটার চারদিক ঘেরা, তবে ওপারটা খোলা। সেখানে এক দিকে বিরাট মঞ্চ, অগুনতি কুকুর পর পর বসে আছে। কুকুরগুলোর পেছনে তাদের মালিকরা দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরগুলোর নানা রকম চেহারা। কোনোটা হোঁতকা, কোনোটা বেঁটে, কোনোটা সরু লিক লিকে, কোনোটা এত্তটুকুন। কোনোটার থ্যাবড়া গম্ভীর মুখ, কোনোটার বেজায় বিরক্ত চোখ, কোনটার দুষ্টু দুষ্টু চাউনি। নামও তাদের নানা রকম—বুলটেরিয়ার, ফক্সটেরিয়ার, ল্যাব্রাডর, গোল্ডেন, রিট্রিভার, স্প্যানিয়েল ইত্যাদি ইত্যাদি। কুকুরদের উল্টোদিকে সারি সারি চেয়ারে দর্শকরা বসে আছে।

কাবুলরা প্যান্ডেলে ঢুকতেই একটা লোক তাদের সঙ্গে করে মঞ্চের কাছে নিয়ে গেল। অন্য একটা লোক খাতা পেন্সিল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কুকুরের নাম?'

কাবুল বলল, 'ইথিওপিয়ান হারকিউলিস।'

নাম টুকে নিয়ে লোকটা বলল, 'কুকুর নিয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়াও—' বলে মঞ্চটা দেখিয়ে দিল।

কাবুলরা মঞ্চে গিয়ে হারকিউলিসকে বসিয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্য কুকুরেরা হারকিউলিসের মতো এমন আজব চেহারার জন্তু বোধ হয় আগে আর দেখেনি। তারা একসঙ্গে ভৌ ভৌ করে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। হারকিউলিসের মুখে নেট পরানো থাকায় সে ঠিক উত্তর দিতে পারল না, কুঁই কুঁই করে একটু আওয়াজ করল শুধু।

কিছুক্ষণের মধ্যে শো শুরু হয়ে গেল। একজন মাইকে বলতে লাগল, 'প্রথমে তরুণকুমার সেন তাঁর বুলডগের খেলা দেখাবেন।'

একটা লোক তার বিরাট বুলডগ নিয়ে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর তার গলায় একটা কাগজ বেঁধে দর্শকদের মধ্যে একজন মহিলাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা ওঁকে দিয়ে এস।' বুলডগটা তক্ষুনি তাই করল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হাততালির শব্দ উঠল।

এইভাবে ল্যাব্রাডর, ফক্সটেরিয়ার অ্যালসেশিয়ান গ্রেহাউন্ড এমনি নানা কুকুর একের পর এক খেলা দেখিয়ে গেল। কেউ আগুনের চাকার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে গেল। কেউ পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে দু-পা জোড়া করে দর্শকদের নমস্কার করল। কেউ যোগাসন করে দেখাল।

সব শেষে ডাক পড়ল কাবুল টাবুলের। দুই ভাই হারকিউলিসকে নিয়ে মঞ্চের সামনের দিকে চলে এল। কাবুল হারকিউলিসকে কোলে নিয়ে বলল, 'আমার এই কুকুর এমন খেলা দেখাবে, যা পৃথিবীর আর কোনো কুকুর কোনোদিন দেখাতে পারেনি, পারবেও না। এখুনি এটাকে আমি ওপরে ছুড়ে দেব। ওটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আকাশে মিলিয়ে যাবে। দশ মিনিট পর আবার ওটা ফিরে আসবে। বলে গলা নামিয়ে আস্তে করে ডাকল, 'ভন্টিদা—'

হাওয়ার ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'আমি রেডি। ছুড়ে দে।'

কাবুল হারকিউলিসকে শূন্যে ছুড়ে দিল। হাওয়ার ভেতর থেকে তাকে লুফে নিল ভন্টিদা।

দর্শকরা দেখতে লাগল ইথিওপিয়ান হারকিউলিস প্যান্ডেলের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক দশ মিনিট বাদে আবার সেটা মঞ্চে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে যে হাততালি শুরু হল তা থামতে কুড়ি মিনিট লেগে গেল। সত্যি, এমন কুকুরের খেলা কেউ কখনও দেখেনি।

এক সময় মাইকে জানানো হল, 'ডগ শো'য়ের ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়েছে কাবুল টাবুলের ইথিওপিয়ান হারকিউলিস।

দিদির বিয়ে আর ভানোয়া

কিছুক্ষণ আগে বাবা বাড়ি ফিরে এসেছেন। তারপর থেকেই আমাদের সবার মন ভীষণ খারাপ।

দুপুরে বাবা শ্যামবাজার গিয়েছিলেন আমার দিদির বিয়ের কথা পাকা করতে। দশ-বারো দিন আগে ছেলের বাবা আর মামা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। দিদিকে দেখে তাঁদের পছন্দ হয়েছে।

দিদি এম. এ পাস, তাছাড়া দারুণ সুন্দর। তাকে দেখলে সবার ভাল লাগবে। কিন্তু আজ যখন বাবা শ্যামবাজার গেলেন ছেলের বাবা জানিয়ে দিয়েছেন বিয়েতে অনেক টাকা আর অনেক গয়না যৌতুক দিতে হবে।

চার বছর হল আমরা খুব গরিব হয়ে গেছি। বাবার যে বড় ব্যবসাটা ছিল সেটা কী জন্য জানি না, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা ছোটখাটো কী সব কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালান। রোজ আমাদের বাড়ি মাছ আসে না, মাখন আর মুরগির মাংস ছ'মাসের মধ্যে চোখে দেখিনি। আমাদের যখন এই অবস্থা, বাবা কোত্থেকে অত টাকা আর অত গয়না দেবেন!

এবার নিজেদের কথা একটু বলি। বাবার নাম অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল, বয়স সাতান্ন। মায়ের নাম মণিমালা। দিদির কথা আগেই বলেছি। তার নাম জয়ন্তী, বয়স চব্বিশ। আমার বয়স বারো, ক্লাস সেভেনে পড়ি, ডাক নাম বাবুল, ভাল নাম রজত কুমার সান্যাল। টালিগঞ্জে একটা পুরনো দোতলা বাড়িতে আমরা থাকি। বাবার হাতে যখন প্রচুর টাকা-পয়সা ছিল তখন বাড়িটা কিনেছিলেন।

এখন বিকেল। একতলায় আমার ঘরে চুপচাপ বসে আছি। শ্যামবাজার থেকে ফিরে বাইরের চওড়া বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসেছেন বাবা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন মা। দিদি অবশ্য কাছাকাছি কোথাও নেই।

ঘরের ভেতর থেকেও টের পাচ্ছি মা কাঁদছেন, বাবাও বেশ ভেঙে পড়েছেন। ওঁরা খুব আশা করেছিলেন, দিদির বিয়েটা হয়ে যাবে।

হঠাৎ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বাবা বললেন, 'কে?'

হিন্দিতে জবাব এল, 'হামলোগ বাবুজি, কিরপা করকে (দয়া করে) দরবাজা খুলিয়ে—'

বাবা আমার ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'দ্যাখ তো বাবুল, কে ডাকাডাকি করছে—'

আমি গিয়ে দরজাটা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম।

একটি মাঝবয়সী লোক—মাথায় বিরাট পাগড়ি, কাঁচাপাকা প্রকাণ্ড গোঁফ, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে বিহারীদের ঢংয়ে খাটো কাপড়, ঢলঢলে হাতাওলা হলুদ পাঞ্জাবি। কাঁধ থেকে একটা বড় চটের ব্যাগ ঝুলছে। পায়ে মোটা চামড়ার চপ্পল।

লোকটার গা ঘেঁষে একটি সাত-আট বছরের ছেলে। তার মাথাতেও পাগড়ি, পরনে বয়স্ক লোকটার মতোই ধুতি আর হলুদ পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা। ছেলেটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যত বার চোখাচোখি হচ্ছে, সে কিন্তু চোখ সরিয়ে নিচ্ছে না। শুধু সুন্দর মিষ্টি একটু হাসি তার মুখে ফুটে উঠছে। তার হাসি দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন আমাকে চেনে। কিন্তু আমি কি তাকে কোথাও দেখেছি? মনে করতে পারলাম না।

বয়স্ক লোকটি হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি তেরো নম্বর রজনী দাস লেন?'

আমরা কলকাতায় যে হিন্দি শুনি, এ লোকটার হিন্দি ঠিক সেরকম নয়, তবে সব বোঝা যায়। তার কথায় রয়েছে গেঁয়ো টান। মনে হয়, বিহার কি মধ্যপ্রদেশের কোনো গ্রাম থেকে সে এইমাত্র কলকাতায় এসেছে।

আমি মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

'এ কোঠির মালিক কি অমরেন্দ্রনাথ বাবুজি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বাবুজির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবাকে লোকটার কথা বললাম। বুঝতে পারছি মন খারাপের জন্য এখন বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা নেই বাবার। নেহাত লোকটা একেবারে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া দুম করে এরকম একটা লোক কেন এসে হাজির হল, বাবার বোধহয় সে ব্যাপারে একটু কৌতূহল হচ্ছিল।

বাবা বলেন, 'নিয়ে আয়।'

দরজার পর থেকেই বাঁধানো উঠোন। তারপর ছ'টা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠতে হয়।

লোকটা ছেলেটাকে সঙ্গে করে আমার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকল। বাবা এবং মায়ের উদ্দেশে হাতজোড় করে, মাথা অনেকটা ঝুঁকিয়ে বলল, 'রাম রাম বাবুজি, রাম রাম বহেনজি।'

মা এবং বাবাও হাতজোড় করলেন। বাবা বললেন, 'আসুন—'

বারান্দায় দু-চারটে খালি চেয়ার পড়ে ছিল। ওখানেই লোকটাকে এবং ছেলেটাকে বসানো হল।

বাবা বললেন, 'আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

লোকটা বলল, 'চেনার কারণ তো নেই বাবুজি, আমরা কেউ কাউকে আগে দেখিনি। আমার নাম জগনপ্রসাদ সিং। আমরা রাজপুত ক্ষত্রিয়। বিহারের হাজারিবাগ জেলায় আমার

বাড়ি।' সঙ্গের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলে, 'আর এ হল আমার লেড়কা ভানোয়া, ভাল নাম ভানপ্রসাদ। টু ক্লাসে পড়ে।'

এত সব শোনার পরও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাবা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই জগনপ্রসাদ ফের বলে, 'আগে আমরা কখনও কলকাত্তায় আসিনি। কালীঘাটে আমাদের গাঁওয়ের একজন থাকে। আজ সুবে হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে তার কাছে উঠেছিলাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে আপনার কোঠিতে এলাম।'

বাবা বা জগনপ্রসাদের কথাবার্তার দিকে আমার কান নেই। একদৃষ্টে ভানোয়া বা ভানপ্রসাদকে লক্ষ করছিলাম।

ভানোয়া নিজের চেয়ারটিতে বসে অস্থিরভাবে কখনও মাকে, কখনও বাবাকে, কখনও আমাকে, আবার কখনও বা বাড়িটা দেখছিল।

বাবা বললেন, 'আমার কাছে কী দরকারে এসেছেন বলুন—'

ঠিক এই সময় পরিষ্কার বাংলায় ভানোয়া বলে ওঠে, 'সবাইকে দেখছি, কিন্তু দিদি কোথায়?' তার বলার ভঙ্গিতে অবশ্য বিহারের গেঁয়ো টান রয়েছে।

বাবা, মা এবং আমি তিনজনেই চমকে উঠি। অবাক চোখে তাকে দেখতে দেখতে বাবা জগনপ্রসাদকে বলেন, 'আপনার ছেলে বাংলা জানে?'

জগনপ্রসাদ ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'জানে বাবুজি।'

'ও কি স্কুলে বাংলা পড়ে?'

'আমাদের গাঁয়ের স্কুলে বাংলা 'লিখিপড়ি'র চল নেই।'

'আপনাদের কাছাকাছি কোনো বাঙালি থাকে?'

'না বাবুজি।'

আমাদের বিস্ময় বাড়তেই থাকে।

জগনপ্রসাদ আবার বলে, 'জানেন বাবুজি, কলকাত্তায় আপনাদের কোঠিতে আমাকে যে আসতে হল তা ওর জন্যে।'

বাবা সামনের দিকে ঝুঁকে অসীম আগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, 'কিরকম?'

এই সময় ভানোয়া বলে ওঠে, 'আচ্ছা, ওখানে কুয়ো ছিল না?' বলে আঙুল বাড়িয়ে উঠোনের একটা কোণ দেখিয়ে দেয়।

বাবা আরো ঝুঁকে পড়েন, 'ছিল, দু বছর আগে বুজিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

অন্যমনস্কের মতো ভানোয়া বলে, 'জানি তো।' তারপরই অস্থির হয়ে ওঠে, 'দিদিকে ডাকো না?'

বাবা ডাকতে যাচ্ছিলেন, মা হঠাৎ আধফোটা চাপা গলায় ভানোয়াকে বললেন, 'এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে দিদির কাছে নিয়ে যাচ্ছি—'

মায়ের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠি। তাঁর সমস্ত শরীর ভীষণ কাঁপছে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে অসহ্য কিছু একটা আটকাবার চেষ্টা করছেন। চোখের দৃষ্টি তাঁর স্থির।

ভানোয়া তক্ষুণি উঠে দাঁড়ায়। মায়ের সঙ্গে দোতলার দিকে যেতে যেতে আচমকা আমাকে বলে, 'তুই এখানে থাক বাবুল, আমি দিদির সঙ্গে দেখা করে আসছি।' বলে চলে যায়।

আমার নাম ভানোয়া জানল কী করে? কিভাবে জানল আমাদের উঠোনে একটা কুয়ো ছিল? এ বাড়িতে, এমনকি কলকাতাতেই যে কখনও আসেনি তার পক্ষে এসব জানা কী করে সম্ভব?

বাবা চেয়ারটা টেনে নিয়ে জগনপ্রসাদের আরো কাছে গিয়ে বসেন। তার দু'টি হাত ধরে বলতে থাকেন, 'ভানোয়ার সব কথা আমাকে বলুন জগনপ্রসাদজি—'

'বাবুজি, সেই জন্যেই তো এত দূরে ছুটে এসেছি।' বলে একটু থামে জগনপ্রসাদ। তারপর আবার শুরু করে। ভানোয়া তার একমাত্র ছেলে। তার বয়স যখন পাঁচ তখন থেকেই মাঝে মাঝে বাংলা বুলি (ভাষা) বলত সে, আর বলত কলকাত্তার কথা। বলত, কলকাত্তায় তার মা আছে, বাপুজি আছে, এক ছোট ভাই আর বড়ী বহেনও আছে।

জগনপ্রসাদরা প্রথমে এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না। পরে অনেকবার শুনতে শুনতে বলত, 'আমরাই তো তোর মা আর বাপুজি।' ভানোয়া বলত, 'তোমরা এখানকার মা, বাপু। আর ওরা কলকাত্তার মা, বাপু, ভাই আর বহেন।' আরেকটু বড় হবার পর সে বলত, 'আমাদের বাড়ি টালিগঞ্জে, তেরো নম্বর রজনী দাস লেন। বাপুজির নাম অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল, ভাইয়ের নাম বাবুল, বহিনের নাম জয়ন্তী। আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। ভানোয়া ভীষণ জেদি, এখানে আসার জন্য সে এক একদিন খুব কান্নাকাটি করত।'

শেষ পর্যন্ত জগনপ্রসাদ গ্রামের বয়স্ক লোকদের কাছে গিয়ে ভানোয়ার ব্যাপারটা জানায়। সব শুনে তারা ভানোয়াকে নিয়ে কলকাতায় আসতে বলে। কিন্তু আগে আর কখনও এ শহরে আসেনি জগনপ্রসাদ। ভানোয়া তাকে ভরসা দিয়ে বলে, হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুতে পারলে ওখান থেকে সে টালিগঞ্জে নিয়ে যেতে পারবে। ওদিকের রাস্তাঘাট সব তার জানা। ছেলের জেদে কাল রাতে তাকে ট্রেন ধরতে হয়েছিল। কালীঘাটে তাদের গ্রামের একজন লোক থাকে। তার ঠিকানা যোগাড় করে এনেছে। কেননা, রজনী দাস লেন নামে কলকাতায় যদি কোনো রাস্তা না থাকে বা অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল, বাবুল বা জয়ন্তী নামে কাউকে না পাওয়া যায় তখন তারা কোথায় থাকবে?

জগনপ্রসাদ বলে যায়, 'বাপুজি, সত্যিই হাওড়ায় নামার পর ভানোয়া আমাকে রাস্তাঘাট চিনিয়ে আগে কালীঘাট নিয়ে আসে, তারপর এখানে।'

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক রূপকথার গল্প শুনছি যেন। জগনপ্রসাদের কথা শেষ হলে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো বাবা বলে উঠলেন, 'জাতিস্মর—'

শব্দটার মানে জানে না জগনপ্রসাদ। সে বলল, 'বুঝতে পারলাম না বাবুজি—'

'যে আগের জন্মের কথা মনে করতে পারে তাকে বলে জাতিস্মর।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে জগনপ্রসাদ, 'তাই হবে বাবুজি, তাই হবে।'

এই সময় দোতলা থেকে দিদি এবং মায়ের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। কান্না জড়ানো ব্যাকুল গলায় দিদি আমাদের ডাকে, 'বাবা, তোমরা তাড়াতাড়ি ওপরে এস।'

আমরা দ্রুত দোতলায় চলে যাই। এখানে সবসুদ্ধু তিনটে শোবার ঘর। একটা ঘর দিদির, একটা মা-বাবার, আর দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় কেউ থাকে না। সব সময় সেটা তালা দিয়ে রাখা হয়। ওটার ভেতর একটা বড় বাঁধানো ছবি রয়েছে। মা রোজ সন্ধেবেলায় একবার তালা খুলে ঘরটা ধোয়ামোছা করেন। তারপর ছবিটায় নতুন টাটকা মালা পরিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেন। আমি ওপরে থাকি না, আমার ঘর একতলায়।

ওপরে আসতেই চোখে পড়ে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটার তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে বাঁধানো বড় ছবিটার সামনে মা আর দিদি ভানোয়াকে জড়িয়ে ধরে সমানে কাঁদছে।

আমরা ঢুকতেই ভানোয়াকে দেখিয়ে মা ভাঙা ভাঙা গলায় বলেন, 'দিদির সঙ্গে কথা বলবে বলে ও তো আমাকে নিয়ে ওপরে এল। তারপর জয়ন্তী আর আমাকে টানতে টানতে এই ঘরটার সামনে এনে বলল, তালা খুলে দাও। খুলে দিলাম। এখন ছবিটা দেখে ও কী বলছে শোন।' বলে বাঁধানো ছবিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ভানোয়াকে বলেন, 'বল বাবা, বল—'

ছবিটা তেরো-চোদ্দ বছরের একটি কিশোরের। মুখটা দারুণ সুন্দর। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ। কী কারণে যখন সে খুব হাসছিল, সেই সময় এই ছবিটা তোলা হয়। ছবির এই ছেলেটি আমার দাদা।

ভানোয়া বলে, 'ওটা তো আমার ছবি।'

বাবা কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'ওর নাম জানো?'

'বা রে নিজের নাম জানব না? ও তো বুবাই, ভাল নাম কৌশিক।'

আমার দাদার ঠিক ওই দুটো নামই ছিল। হঠাৎ ভীষণ কষ্ট হতে লাগল আমার। টের পাচ্ছি, চোখ দুটো জলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলব।

বাবা ঝাপসা গলায় বললেন, 'ওর কী হয়েছিল বল তো—'

'স্কুল ছুটির পর যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন বাস চাপা পড়ে—'

ভানোয়াকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বাবা দু হাতে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরেন। চোখ দিয়ে তাঁর জলের স্রোত নামতে থাকে।

মা আর দিদি একটানা কেঁদে চলেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জগনপ্রসাদ অনবরত চোখ মুছছে।

শুনেছি, আমার যখন তিন বছর বয়স সেই সময় আমার দাদা স্কুল থেকে ফেরার সময় বাসের তলায় পড়ে মারা যায়। সেই দাদাই এতকাল পর ভানোয়া হয়ে ফিরে এসেছে। আমার বুকের ভেতর যে কান্নাটাকে আটকে রেখেছিলাম সেটা এখন বেরিয়ে এল। আমি ভানোয়ার কাছে গিয়ে তার পিঠে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলাম।

কান্নাকাটি থামার পর বাবা প্রচুর মিষ্টি আর ভানোয়ার জন্য নতুন জামা প্যান্ট জুতো কিনে নিয়ে এলেন। মা কোলে বসিয়ে ভানোয়াকে খাওয়ালেন।

ঠিক হল জগনপ্রসাদদের কালীঘাটে তাদের গ্রামের সেই লোকটির কাছে যেতে দেওয়া হবে না। ওরা আমাদের কাছেই থাকবে।

ভানোয়া আসার পর দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে বাবা মা দিদি বা আমি—তাকে কেউ ছাড়তে চাই না। সারাক্ষণ ওকে ঘিরে থাকি।

দেখা যাচ্ছে, আগের জন্মের সব কথা তার মনে আছে। যতদিন এখানে ছিল, এ বাড়িতে কী কী ঘটেছে, সমস্ত বলে যায় সে।

দিনের বেলা ভানোয়া সবার। কিন্তু রাত্তিরে তাকে পুরোপুরি একলা পাই। সে আর আমি আমার ঘরে শুই।

আজ রাত্তিরে পাশাপাশি শুয়ে বললাম, 'আচ্ছা ভানোয়া—'

ভানোয়া বলল, 'কতবার বলেছি আমাকে ভানোয়া বলবি না, আমি না তোর দাদা—'

'সে তো আগের জন্মে—'

'আগের জন্মের দাদা বুঝি দাদা নয়?'

'তুই তো আমার থেকে ছোট।'

'ছোট হলেও তোর দাদা—'

'ঠিক আছে, দাদাই বলব। আচ্ছা, তুই তো এ বাড়ির সকলের কথা বলেছিস। ছোট ঠাকুমার কথা মনে আছে? তার কথা কিন্তু বলিসনি। ছোট ঠাকুমা কিন্তু তোকে ভীষণ ভালবাসত।'

ছোট ঠাকুমা আমার বাবার কাকিমা। মৃত্যুর আগে কিছুদিন আমাদের বাড়ি এসে ছিলেন।

ভানোয়া বলে, 'বা রে, ছোট ঠাকুমাকে মনে থাকবে না! তাকে তো দেখতে পেলাম না।'

'তুই যেদিন বাসচাপা পড়লি তার দিন তিনেক পরে মারা গেছে।'

'ও, তাই—' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ধড়মড় করে উঠে পড়ে ভানোয়া। মশারি তুলে নিচে নামতে নামতে বলে, 'আয় তো আমার সঙ্গে—'

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বলি, 'কোথায়?'

'আয় না।' বলতে বলতে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেয় ভানোয়া। বাইরে এসে টানা বারান্দা দিয়ে বাঁ দিকে যেতে যেতে সে আবার বলে, 'তুই জানিস, মরার আগে ছোট ঠাকুমা বাবাকে একটা কাঠের বাক্স দিয়েছিল কিনা—'

ছোট ঠাকুমা বা দাদা যখন মারা যায় তখন আমি খুবই ছোট। সেই সময়কার কথা আমার কিছু মনে নেই। বললাম, 'না।'

একেবারে শেষ ঘরটার সামনে এসে দেখা গেল তালা লাগানো রয়েছে। ভানোয়া বলে, 'এই ঘরে ছোট ঠাকুমা থাকত না?'

'হ্যাঁ, তাই শুনেছি। এখন কেউ থাকে না।'

'চাবি কোথায়?'

'আমার ঘরে আছে।'

'নিয়ে আয়।'

চাবি আনার পর তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালানো হল।

একধারে একটা তক্তপোশ, গোটা দুই আধভাঙা চেয়ার, একটা কাঠের আলমারি ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। সবসময় বন্ধ থাকার জন্য ঘরভর্তি ধুলো এবং ভ্যাপসা গন্ধ।

ভানোয়া একটা ঘুলঘুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তুই আমার থেকে অনেক লম্বা। তক্তপোশের ওপর একটা চেয়ার তুলে তার ওপর উঠে দ্যাখ তো ওটার ভেতর একটা বাক্স আছে কিনা।'

ঘুলঘুলিটা ভেঙে গেছে। সেটার ফোকরে কী আছে, নিচে থেকে বোঝা যায় না। আমি চটপট তক্তপোশে চেয়ার তুলে উঠে পড়লাম এবং ফোকরে হাত গলিয়ে একটা সুন্দর কারুকাজ-করা কাঠের বাক্স বার করে নেমে এলাম।

বাক্সটার ওপর প্রায় এক ইঞ্চি ধুলো পড়েছে। আঙুল দিয়ে পুঁছতে যাব, হাত বাড়িয়ে বাক্সটা টেনে নিল ভানোয়া। তার দুই চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। সে বলল, 'বাক্সটা কেউ ধরেনি দেখছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের বাক্স এটা?'

'জানি না। ছোট ঠাকুমা আমাকে ওখানে রাখতে বলেছিল, আমি রেখে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুই তো আমার থেকে ছোট, ওখানে হাত গেল কী করে?'

'বা রে, আগের জন্মে লম্বা ছিলাম না? তক্তপোশে চেয়ার তুলে ঠিক হাত পেয়ে গিয়েছিলাম।' বলে একটু থামে ভানোয়া। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'ছোট ঠাকুমা কী বলেছিল জানিস?'

'কী?'

'দিদির বিয়ের সময় বাক্সটা বাবাকে দেবে। এতে যা আছে তাতে নাকি তিনজনের বিয়ে হয়ে যায়। চল, ওপরে যাই—'

'ওপরে কেন?'

'বাক্সটা দিতে হবে না?'

বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের জাগিয়ে বাক্সটা বাবার হাতে দিয়ে ছোট ঠাকুমার ইচ্ছার কথা বলে ভানোয়া।

বাক্সটা খুলতেই হীরে মুক্তো বসানো প্রচুর সোনার গয়না বেরিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে ভানোয়াকে বুকের মধ্যে টেনে কাঁদতে থাকেন বাবা। মা এবং আমিও কেঁদে ফেলি।

পরদিনই শ্যামবাজারে গিয়ে বিয়ের কথা পাকা করে আসেন বাবা।

তিনি ফেরার পর জগনপ্রসাদ বলে, 'বাবুজি, কী করে কথাটা বলব বুঝতে পারছি না। কিন্তু না বললে—'

বাবা বলেন, 'বলুন না—'

'ভানোয়ার তো স্কুল কামাই হচ্ছে। তাই—'

'কিন্তু ওর দিদির বিয়ে আসছে মাসে।'

'তখন আবার আসবে।'

ভানোয়ার যাবার কথায় বাড়িতে নতুন করে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। বাবা মা আমি, কেউ তাকে ছাড়ব না। আমি ভানোয়াকে বলি, 'তোকে হাজারিবাগ যেতে দেব না। কিছুতেই না।'

ভানোয়া আমার একটা হাত ধরে বলে, 'স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া ওখানেও তো আমার অ্যারেকটা মা আছে; আমি না গেলে তার কষ্ট হবে না?'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, স্কুলে গ্রীষ্ম, হোলি পুজো মিলিয়ে যে চার মাস ছুটি থাকে সেই সময় ভানোয়া এসে আমাদের কাছে থাকবে। আমরাও যাব ওখানে।

আরো তিন দিন পর আমার আগের জন্মের দাদা এবং এ জন্মের ভানোয়া দিদির বিয়ের ব্যবস্থা করে এবং আমাদের আরো একবার কাঁদিয়ে জগনপ্রসাদের সঙ্গে হাজারিবাগ চলে যায়।

পাগল মামার চার ছেলে

আমার সেজোমামার নাম পাগলচাঁদ সমাজপতি। এই একটা নামই তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। রাস্তায় বেরুলেই কেউ ডাকে 'এই যে পাগলবাবু', কেউ ডাকে 'এই যে পাগলচন্দ্র', কেউ বলে 'পাগলাদা'।

এতবার পাগল শুনলে কার না মাথা খারাপ হয়ে যায়। উপায় থাকলে নামটা কবেই পাল্টে ফেলতেন সেজোমামা। কিন্তু ওটা তাঁর বাবা, মানে আমাদের দাদুর দেওয়া নাম। তা-ছাড়া ম্যাট্রিক থেকে এম-এ পর্যন্ত যত সার্টিফিকেট আর ডিগ্রি পেয়েছেন, সবগুলোতেই লেখা আছে পাগলচাঁদ সমাজপতি। মনে অনেক দুঃখ থাকলেও তাই নামটা আর বদলানো যায়নি।

নিজের বেলা তো পারেননি, তাই সাধ মিটিয়ে চার ছেলের নাম দিয়েছেন—প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতন, প্রলয়নাশন, প্রলয়ঘাতন। অবশ্য ওদের একটা করে ডাকনামও আছে। আবু, টাবু, হাবু এবং পাবু। সেজোমামা সগর্বে সেজোমামিকে বলেছেন, কেমন নাম দিয়েছি বলো তো? ঐ নামের জোরে আমার ছেলেরা পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবে।

সেজোমামি বলেছেন, তা হয়তো হবে। কিন্তু এতগুলো প্রলয় একসঙ্গে ঘরে এনে ঢোকালে। আমার তো ভয়ই করছে।

মামির ভয়টা যে মিথ্যে নয়, তা পরে হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিল। আমার চার মামাতো ভাইয়ের মতো এমন দুর্ধর্ষ বিচ্ছু ইরম্মদ ছেলে ভূ-ভারতে খুব বেশি জন্মায়নি। নিজেদের নামের গুণেই কিনা কে জানে, বাড়িতে দিনরাত তারা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে যায়।

যদিও এই গল্পটা চারজন প্রলয়কে নিয়ে, তবে তার আগে আমার সেজোমামা আর সেজোমামি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেজোমামা টকটকে ফর্সা আর বেজায় মোটা। বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় মোটারা খুব ভালো মানুষ আর ঠাণ্ডা মানুষ হয়। আমার সেজোমামাও তাই। নাকের তলায় স্যার আশুতোষের মতো গোঁফ। সব সময়ই হাসিখুশি। সারাক্ষণ তাঁর পরনে থাকে গ্যালিশ-দেওয়া ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট। শার্টের বোতাম লাগাতে, জুতোর ফিতে বাঁধতে আর দাড়ি কামাতে প্রায়ই ভুলে যান তিনি।

একটা ওষুধ কোম্পানিতে বড় চাকরি করেন সেজোমামা, সারা বছরই তাঁকে হিল্লি-দিল্লি বেড়াতে হয়। এ মাসে যদি গৌহাটি যান, আসছে মাসে ভুবনেশ্বর, তার পরের মাসে জব্বলপুর বা এলাহাবাদ।

সে যাই হোক, ছেলেদের কীর্তিকলাপ দেখে সেজোমামার মতো ঠাণ্ডা মানুষেরও রক্ত একেক দিন মাথায় চড়ে যায়। হুঙ্কার দিয়ে বলেন, সব কটাকে বাড়ি থেকে বার করে দেব।

সেজোমামি একেবারে সেজোমামার উল্টো, ভয়ানক রোগা, গায়ে মাংস-টাংস নেই, শুধু হাড়, বারো মাস ভোগেন। মাপ নিলে সেজো মামার চারভাগের এক ভাগ হবেন, চার ছেলের জ্বালায় সারাক্ষণ পাগল হয়ে থাকেন। তার ওপর অসুখ-বিসুখ তো আছেই। দুর্বল গলায় দিনরাত চেঁচিয়ে যান, এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে এমন কি কেউ নেই। কিন্তু সেজোমামি যতই চিৎকার করুন, প্রলয়নাচন প্রলয়মাতনরা তা গ্রাহ্যই করে না।

সেজোমামারা অনেকদিন শ্যামবাজারে ছিলেন। কিন্তু সেখানে বাড়িটা ছিল খুবই ছোট, মোটে আড়াইখানা ঘর; বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তাই পরশুদিন বাড়ি বদলে চেতলায় এসেছেন।

পুরনো আমলের এই একতলা বাড়িটা চমৎকার। পাঁচখানা বড়-বড় ঘর। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পেছনে বাগান।

পরশু এসেই কাল অফিসের কাজে রাঁচী যেতে হয়েছে সেজোমামাকে। ফিরবেন সাতদিন বাদে। এ কদিন নতুন জায়গায় একা সেজোমামিকে ছেলেদের সামলে রাখতে হবে। এখানে আসার পর পাশের বাড়ির বলাইবাবুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আর সবাই অচেনা। এবার আসল গল্পটা শুরু করা যেতে পারে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর মুখ-টুখ ধুয়ে আবু-টাবু-হাবু-পাবু চার ভাই ডাইনিং রুমে গিয়ে খেতে বসেছে। সেজোমামি প্রত্যেকের প্লেটে ডিমসেদ্ধ, কলা, রুটি, মাখন আর এক গেলাস করে দুধ দিয়েছেন।

পাবু চামচ দিয়ে তার ডিমটা কাটতে যাচ্ছিল, হাবু চেঁচিয়ে উঠল, 'কাটবি না পাবু, দাঁড়া—'

বলেই ছোঁ মেরে পাবুর প্লেট থেকে ডিমটা তুলে নিজের ডিমের পাশে রেখে মেপে দেখল, তারটা একটু ছোট। অমনি হাত-পা ছুড়ে লাফালাফি শুরু করে দিল, 'আমাকে ছোট ডিম দিয়ে পাবুকে বড় ডিম দেওয়া চলবে না। ওকে আমি খুন করে ফেলব'—ব'লেই এক কামড়ে পাবুর ডিমের অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো।

পাবুও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার ছেলে নয়। সেও দুধের গেলাস ছুড়ে মারলো হাবুর দিকে। পাবুর হাতের টিপও দারুণ। গেলাসটা হাবুর থুতনিতে গিয়ে লাগলো। মেঝেময় ডিম, পাউরুটি, মাখন আর দুধের স্রোত।

সেজোমামি দু'হাত তুলে সেই পুরনো কথাটা করুণ মুখে আরও একবার বললেন, 'এই চার দস্যুর হাত থেকে কেউ কি আমাকে বাঁচাতে পারে না?'

অদ্ভুত ব্যাপার। মামির কথা শেষ না হতেই আচমকা কেউ যেন ঠাস্ করে হাবুর গালে বিরাশি ছক্কার একটা চড় কষাল, আর সে ঠিকরে পড়লো ওধারের দেওয়ালে। আবু আর টাবুর মাথা দুটো আপনা হতেই ঠুকে গেল; সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের কপালে মার্বেল গুলি গজিয়ে উঠলো। তারপরেই দেখা গেল পাবুর কান দু'টো অদৃশ্য হাতে কেউ মুচড়ে দিচ্ছে।

মুহূর্তে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ থেমে গেল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; অথচ তাদের

মাথা, গাল আর কানের দশা কে এমন করে ছাড়ল, বুঝতে না পেরে বেজায় ভয় পেয়ে গেল পাবুরা। টুঁ শব্দটি না করে চার ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর স্কুলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত বাড়িটা শান্ত হয়ে রইলো। অবশ্য চেতলায় আসার আগেই পাগল মামা চার ছেলেকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ থামায় সেজোমামি খুবই খুশি হয়েছেন। তবে ভয়ও পেয়েছেন যথেষ্ট। তারা পাঁচজন ছাড়া অন্য কেউ ডাইনিং রুমে ছিল না। তাহলে কে ওভাবে চড় মারল, কান মুললো, মাথা ঠুকে দিল? খুবই গোলমেলে ব্যাপার।

ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে সেজমামি সোজা পাশের বলাইবাবুদের বাড়ি চলে গেলেন। ওরা কিছু জানলেও জানতে পারে। তেমন হলে পাগলমামা ফিরে এলেই বাড়ি বদলাতে হবে।

সকালবেলার ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেলেন সেজোমামি। সব শুনে বলাইবাবুর মা পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'এই কাণ্ড হয়েছে! কোনো ভয় নেই!'

সেজোমামির উদ্বেগ কাটে না। তিনি বললেন, 'বিপদ-টিপদ হবে না তো?'

'আরে না-না। বরং উল্টোটাই হবে।'

'কে আমার বাঁদর ছেলেগুলোকে টিট্ করলো বলতে পারেন?'

'দু-চার দিন থাকো, নিজেই বুঝতে পারবে। না পারলে বোলো, আমি বুঝিয়ে দেবো।'

সেজোমামি বাড়ি ফিরে এলেন। বলাইবাবুর মা পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। ফলে সেজোমামির দুশ্চিন্তাটা থেকে গেল।

বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পর পাগল মামার চার ছেলে আবার স্বমূর্তি ধারণ করল। সকালের বেদম মারধরের কথা তারা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভুলে গেছে। চার ভাইয়ের শোবার জন্য চারখানা ছোটো খাট রয়েছে। খাটগুলোর পায়ায় চাকা লাগানো। স্কুল থেকে ফিরেই জলখাবার খেয়ে খাট চারটি টেনে এনে ঘরের মাঝখানে জোড়া লাগায় ওরা। তারপর ক্যারাম বা লুডো খেলতে বসে।

আজ ওরা লুডো খেলছে। একদলে আছে আজ পাবু আর আবু অন্য দলে টাবু এবং হাবু। খেলাটা ভালোই চলছিল। হঠাৎ টাবু বাঁ হাতের কারসাজিতে একটা কাঁচা ঘুঁটিকে পাকিয়ে ফেললো। কিন্তু আবু-পাবুর চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়! তারা চিৎকার করে উঠলো, 'চোট্টা, চোট্টা—চোরামি করে খেলছিস।'

টাবুরাও রুখে দাঁড়ালো, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না। ওটা আমার পাকা ঘুঁটি।'

'মিথ্যুক, চোর শয়তান—' বলেই লুডোটা উল্টে দিল পাবু।

তারপরেই চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেজোমামি পাশের ঘরে ছিলেন; দৌড়ে এলেন এবং সরু গলায় চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'মরবি, এক-এক করে তোরা একদিন নির্ঘাত শেষ হয়ে যাবি।'

মামির কথা কারো কানেও ঢুকলো না। চার ভাই হাতাহাতি চালিয়েই যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ চেঁচাবার পর ক্লান্ত হয়ে মামি তাঁর সেই পুরনো আর্জিটাই আরও একবার শোনালেন। 'কেউ কি এই হতচ্ছাড়াদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে না?'

কথা শেষ হবার আগেই তাজ্জব ব্যাপার। চারখানা খাট গড়গড়িয়ে চার দেওয়ালে গিয়ে ঠেকল। কাজেই মারামারিটা তক্ষুনি বন্ধ হয়ে গেল। সকালবেলার মতো চার ভাই ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

মামির কিন্তু ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হাতের কাছে একটা দারুণ জিনিস পাওয়া গেছে। শুধু মুখ ফুটে একটু আর্জি জানালেই হলো। মনে হচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে কাজ হবে। দুরন্ত, দুর্ধর্ষ ছেলেগুলোকে এতদিনে বশে আনতে পারবেন।

বিকেলের এই ঘটনার পর ঘন্টা দুয়েক বেশ ভালোভাবেই কাটল। তারপর যেই সন্ধে নামল, অমনি সেজোমামি চেঁচাতে শুরু করলেন, 'পড়তে বস রে, পড়তে বস রে—'

কিন্তু প্রলয়নাচন বা প্রলয়মাতনদের দেখে মনে হলো না যে মায়ের কথা তাদের কানে ঢুকেছে।

অগত্যা সেজোমামি কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে করুণ গলায় বললেন, 'এমন কেউ নেই, যে বজ্জাতগুলোকে কান ধরে পড়তে বসায়।'

ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে গেল। কার যেন অদৃশ্য হাত কান ধরে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে চার ভাইকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ালের তাকগুলোতে, যেখানে ওদের বই থাকে, সেখান থেকে এর গ্রামার, ওর জ্যামিতি, তার ইতিহাস ধপাধপ এসে আবু-টাবুদের সামনে পড়তে লাগলো। তার মানে এক্ষুনি পড়া শুরু করতে হবে।

কিন্তু চার প্রলয় এমনই ঘাবড়ে গেছে যে, কারো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কী যে করবে, কেউই ভেবে ঠিক করতে পারল না।

সেজোমামিও ছাড়বার পাত্র নন। হাতের কাছে দারুণ একটা অস্ত্র পেয়ে গেছেন; সেটা আবার কাজে লাগালেন। ওপরের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'দত্যিগুলো একদম পড়ে না; বছর-বছর ফেল করে। কেউ কি এদের পড়িয়ে দিতে পারে না?'

বলা শেষ হলো কি হলো না, একজোড়া বেত কোত্থেকে যেন ঘরের ভেতর এসে হাওয়ায় নাচতে লাগল। চার ভাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওরা চুপচাপ তাকিয়ে আছে দেখে সপাং করে বেত দুটো টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল।

প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতনরা বুঝল চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। চার ভাই ঘাড় গুঁজে, গলা ছেড়ে পড়তে শুরু করে দিল। আর বেত দুটো ঘরময় হাওয়াতে ঘুরে-ঘুরে তাদের পাহারা দিতে লাগল।

দশটা পর্যন্ত পড়াশুনো করে, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে গুটিগুটি গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন রাত্তিরে খাওয়া এবং শোওয়ার সময় ধুন্ধুমার বেঁধে যায়। আজ কিছুই হল না।

পরের দিন সকালে ডাইনিং রুমে খাবার-দাবারের ভাগ নিয়ে আবার পঞ্চম পানিপথের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইটা আজ বাধল না। লুচি-হালুয়া দেওয়া হয়েছিল চার ভাইকে।

আবু টাবুর প্লেটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'টেবো আমার চেয়ে বেশি হালুয়া পেয়েছে।'

ওদিকে হাবু চেঁচিয়ে উঠেছে, 'আমি পাবুর চেয়ে কম হালুয়া পেয়েছি।'

ছুড়বার জন্য চার ভাই যখন প্লেট তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় সেজোমামী কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটি আবার বললেন, 'কেউ কি এই পাজিগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারে না?'

তখুনি কেউ যেন চার ভাইয়ের হাত থেকে কাপ-প্লেট কেড়ে নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখল এবং তাদের কান ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

অগত্যা ট্যাঁ-ফোঁ না করে প্রলয়নাচনেরা নিজের-নিজের ভাগের লুচি-হালুয়া খেয়ে সোজা পড়ার ঘরে চলে গেল।

মামি মুখ তুলে বললেন, 'আপনি কে জানি না। তবে আমার বড্ড উপকার করছেন। এখন থেকে আমার চার ছেলের বাঁদরামো ঘুচিয়ে ওদের ভাল করে দিন—' বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ঘন্টা দুই পড়াশুনো করে, স্নান সেরে খেয়ে চার ভাই পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

স্কুলে যাবার নাম করে বেরুলেও বেশিরভাগ দিন তারা স্কুলে যায় না। রাস্তায় ডাংগুলি খেলে কিংবা অ্যালজেব্রা কি বাংলা ব্যাকরণের বই বেচে সিনেমা দেখে।

আজ ওরা ঠিক করল, চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে ঘুরতে যাবে। কিন্তু তার আগেই কেউ যেন ওদের ঘাড় ধাক্কা দিতে-দিতে স্কুলের ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

এরপর থেকে রোজ সকালে পাঁচটা বাজতেই, কে যেন চার ভাইকে বিছানা থেকে তুলে বাথরুমে পাঠিয়ে দেয়। মুখ-টুখ ধোয়া হলে এক জোড়া বেত তাদের ডাইনিং রুমের দরজা দেখিয়ে দেয়। ওরা যখন খায়, বেত দুটো হাওয়ায় নাচতে থাকে। খাওয়া হলে পড়ার ঘরে যখন আসে, বেতজোড়া তখনও পিছু ছাড়ে না। একটু ফাঁকি দিয়েছে কি, অমনি সপাং করে পিঠে বাড়ি পড়ে। স্কুল কামাই করারও উপায় নেই। অমনি গলা ধাক্কা দিতে দিতে কেউ তাদের ক্লাসে নিয়ে যাবে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে টিফিন খাবার সময় থেকে রাত্তিরে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ বেতজোড়া ওদের সঙ্গে ঘুরতে থাকে।

সেজোমামি তো বেজায় খুশি। ছেলেদের পেছনে চেঁচিয়ে তার যে অসুখ করেছিল, তা এখন সেরে যেতে শুরু করেছে। রাঁচীতে সেজোমামাকে চিঠি লিখে তিনি সব জানিয়েছেন।

ওদিকে প্রলয়নাচন প্রলয়মাতন প্রলয়নাশন প্রলয়ঘাতন, চার ভাইয়ের প্রলয় থেমে গেছে। পঞ্চম পানিপথের যুদ্ধের লড়াই এ বাড়িতে আর হচ্ছে না। লড়াই তো দূরের কথা জোরে কথা বলার পর্যন্ত উপায় নেই। তার ওপর রোজ নিয়ম করে স্কুলে যেতে হচ্ছে, বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়তে হচ্ছে। চার ভাইয়ের মনে আর সুখ নেই।

একদিন রাত্তিরে পরামর্শ করে তারা ঠিক করল, এখানে আর থাকবে না। রাত পোহাবার আগেই চেতলা ছেড়ে চলে যাবে। এখান থেকে ভোরের বাস ধরে যাবে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস, বোম্বে মেল—প্রথমে যে ট্রেন পাওয়া যাবে, তাতেই চড়ে যাবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। চার ভাই মাকে চিঠি লিখে অন্ধকার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে সেজোমামী দেখলেন, ছেলেদের ঘর ফাঁকা। টেবিলের ওপর একটা ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। সেটা খুলতেই দেখা গেল, কয়েক লাইন লেখা রয়েছে।

শ্রীচরণেষু মা,

তুমি নিশ্চয়ই ভূত পুষেছো। তার এত বেতের বাড়ি, কানমলা, চড় আর সহ্য হয় না। মার খেতে-খেতে সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে। দিনের পর দিন মাথা গুঁজে এতো পড়াশুনো করতে ভাল লাগে না।

তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এ-জীবনে আর দেখা হবে না। বাবা ও তুমি আমাদের প্রণাম নিও।

ইতি—

হতভাগ্য

আবু-টাবু-হাবু-পাবু

অন্য সময় হলে এ চিঠি পড়ে সেজোমামি কেঁদে-কেটে সারা বাড়ি মাথায় তুলতেন। আজ কিন্তু কিছু করলেন না! নিজের মনে ঘরের কাজ করতে লাগলেন। তিনি জানেন যাঁর ওপর ওদের দায়িত্ব দেওয়া আছে, তিনিই ওদের ব্যবস্থা করবেন।

আটটা তখনও বাজেনি, দেখা গেল, লম্বা মোটা দড়ি দিয়ে চার ভাইকে বেঁধে অদৃশ্য কেউ টানতে-টানতে বাড়ি নিয়ে আসছে।

এরপর টাবুরা একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বাঁদরামো করা চলবে না। ঘাড় গুঁজে দুবেলা পড়তে হবে, মারামারি বন্ধ করতে হবে এবং রোজ স্কুলেও যেতে হবে।

এসব ঘটনা ঘটে যাবার পর সেজোমামি আবার একদিন পাশের বাড়ির বলাইবাবুদের বাড়ি গেলেন এবং যা-যা হয়েছে সব বললেন।

সমস্ত শুনে বলাইবাবুর মা বললেন, 'সেদিন বলেছিলাম ভয় নেই, আমার কথা মিলল তো?'

সেজোমামি বললেন, 'মিলেছে। আচ্ছা মাসিমা একটা কথা বুঝতে পারছি না।'

'কী কথা?'

'যিনি আমার এত উপকার করছেন, তিনি কে?'

'একজন কড়া হেডমাস্টার। ও বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। মরার পরও বাড়ি ছেড়ে যাননি। বড্ড ভালমানুষ। কিন্তু ছেলেদের বেয়াদপি, বজ্জাতি একদম সহ্য করতে পারেন না। পাজি ছেলেরা দু দিন ওখানে থাকলেই টিট্ হয়ে যায়।'

এইসব ঘটনার বছরখানেক বাদে দেখা গেল, মামির অসুখ-বিসুখ একদম সেরে গেছে। আর অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আবু-টাবু-হাবু-পাবু, চার ভাই-ই ফার্স্ট হয়েছে।

রজতের বন্ধু আনন্দ
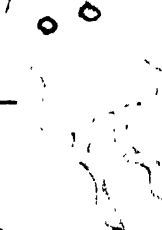
দিনসাতেক হল বাই-পাসের এ দিকটায় একটা বাড়িতে চলে এসেছে রজতরা।

ক'বছর আগে এই অঞ্চলটায় ছিল সরু সরু গলি। ছিল সেকেলে শ্যাওলা-ধরা ছোট ছোট বাড়ি, টিন বা টালির চালা, বিরাট বিরাট সব বস্তি। ছিল কত যে পানা-পুকুর, ডোবা এবং ঝোপঝাড়। গলিগুলো এখন নেই বললেই চলে। এখন চারদিকে ঝাঁ-চকচকে রাস্তা। আদ্যিকালে বাড়িঘর ভেঙে, ডোবা-পুকুর বুজিয়ে, ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে আকাশ-ছোঁয়া কত যে নতুন নতুন দশতলা বারোতলা চোদ্দতলা ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে তার লেখাজোখা নেই। আরও অনেকগুলো তৈরি হচ্ছে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে পুরনো দিনের কোনও চিহ্নই থাকবে না। উঁচু উঁচু হাই-রাইজে এলাকাটা ছেয়ে যাবে।

রজতরা কিন্তু কোনও ফ্ল্যাট কিনে এখানে আসে নি। ওর বাবা অমরেশ লাহিড়ি ফ্ল্যাট বাড়ি মোটেও পছন্দ করেন না। আট দশ তলা বিল্ডিংগুলোর পায়রার খোপের মতো সব ঘরে রাজ্যের মানুষ থাকে। সারাক্ষণ হই চই। অশান্তি। কারণে অকারণে ঝগড়াঝাঁটি।

ভিড় টিড়ে অমরেশবাবুর দম বন্ধ হয়ে আসে। তিনি এখানে পুরনো আমলের একখানা তেতলা বাড়ি কিনেছেন। প্রায় বারো কাঠা জায়গায় মাঝখানে বাড়িটা। চারপাশ খোলামেলা।

কেনার পর ছ'মাস ধরে সেটাকে লোক লাগিয়ে মেরামত করা হয়েছে। দেওয়ালের পলেস্তারা নানা জায়গায় খসে গিয়েছিল। সেগুলো নতুন করে লাগানো হল। ঘুণে-ধরা দরজা জানালা পালটানো হল। প্রত্যেকটা ঘরের মেঝে উপড়ে ফেলে বসানো হল টাইলস। বাথরুমে দামি কমোড আর শাওয়ার। ইনটেরিয়র ডেকরেটর দিয়ে সাজানো হল পুরো বাড়িটা। ভাল মালি যোগাড় করে তাকে দিয়ে সামনে এবং পেছনে তৈরি করা হল নানারকম ফুল আর ফলের বাগান। সবুজ কার্পেটের মতো লন। বাড়িটার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। কে বলবে, মাত্র ছ'মাস আগে আগাছার জঙ্গলে এটা একটা ভগ্নস্তূপের মতো পড়ে ছিল!

এত বড় বাড়িতে সব মিলিয়ে মোটে ছ'জন মানুষ। বাবা, মা, ঠাকুমা, এক দাদা, এক দিদি আর রজত নিজে।

বাবা অর্থাৎ অমরেশ লাহিড়ির বিরাট ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা। মায়ের নাম আরাধনা। তিনিও নিজেদের বিজনেস দেখেন। দাদা সোমেন শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হোস্টেলে থেকে পড়ে। ছুটিতে বাড়ি এসে কিছুদিন কাটিয়ে যায়। দিদি বৈশালী পড়ে লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে। তার ফার্স্ট ইয়ার চলছে। রজত পড়ে ক্লাস সেভেনে। একটা নাম-করা

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। তার বয়স তেরো। ডাকনাম সানু। ঠাকুমা রাজলক্ষ্মী দেবী সারাদিন পুজোর ঘরে পড়ে থাকেন। একটা পুরো দেওয়াল জোড়া সিংহাসনে গণেশ লক্ষ্মী কালী দুর্গা থেকে শুরু করে প্রায় শ'খানেক দেবদেবীর মূর্তি। তাদের স্নান করানো, ফুল দিয়ে সাজানো, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পুজোর আয়োজন, মন্ত্রপাঠ — এই করেই তাঁর সময় কেটে যায়। রজতদের তিনখানা গাড়ি। একটা টাটা সুমো, একটা অ্যামবাসাডর, একটা মারুতি-থাউজেন্ড। সবগুলোই তাদের ব্যবসার কাজে ছোটাছুটি করে। তবে এরই ফাঁকে অ্যামবাসাডরটা সময় বার করে রজত আর তার দিদিকে স্কুল কলেজে পৌঁছে দেয়, ছুটির পর বাড়িতে ফিরিয়েও নিয়ে আসে।

এখন সামার ভ্যাকেশান চলছে। রজত এবং দিদির লম্বা ছুটি। দাদার কলেজেও ছুটি চলছে। অন্য সব বার বড়দিনে, পুজোর সময় কি গরমের ছুটিতে দাদা বাড়ি চলে আসে। কিন্তু এবার সামার ভ্যাকেশানের পর তার কী একটা পরীক্ষা আছে। তাই সে আসছে না। হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করবে।

বাবা-মা সাড়ে ন'টা বাজতে না-বাজতেই তাঁদের অফিসে চলে যান। দিদিটা সারাক্ষণ পড়ার বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। পড়া ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার আর কোনও কাজ নেই। ঠাকুমা তাঁর পুজো টুজো নিয়ে ব্যস্ত।

এদিকে সবেমাত্র এই এলাকায় এসেছে রজতরা। এখানে তার বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। তা ছাড়া, হুটহাট বাইরে বেরিয়ে কোথাও ঘুরে টুরে যে আসবে, বাবা-মা সেটা একদম পছন্দ করেন না। বাড়ির ভেতরেই তাকে আটকে থাকতে হয়।

পড়াশোনা হয়ে যাবার পর রজত একতলা দোতলা তেতলা করে বেড়ায়। কখনও ছাদে উঠে ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু একা একা এইভাবে কাঁহাতক আর কাটানো যায়।

আজ বিকেল বেলায় রোদের তাপ কমে গেলে পেছন দিকে বাগানে চলে এল রজত। এখানে রয়েছে চমৎকার একখানা লন। সেটার মাঝখানে সিমেন্টের স্ল্যাব ঢেলে বসার ব্যবস্থা। লন'টাকে ঘিরে লাল সুরকির পথ। তারপর রকমারি ফুল-ফলের গাছ। উঁচু বাউন্ডারি-ওয়ালের গা ঘেঁষে সারি সারি দেবদারুর চারা বসানো হয়েছিল। সেগুলো এখনও খুব বড় হয় নি। প্রত্যেকটার হাইট সমান। সাড়ে-চার কি পাঁচ ফিটের মতো।

এদিকটায় রজতদের বাড়ির সীমানা পেরোলে বেশ কিছু ফাঁকা জমি, আগাছার ঝাড়, পুকুর আর প্রচুর তাল গাছ চোখে পড়বে। তারপর অবশ্য সরকারি হাউসিং স্কিমের অগুনতি বাড়ি।

পেছনের এই বাগানটা রজতের ভীষণ প্রিয়। সকালে বিকেলে এখানে কত রকমের পাখি যে চলে আসে। তা ছাড়া রয়েছে রংবেরঙের প্রজাপতি, গঙ্গাফড়িং, মৌমাছি এবং নাম-না-জানা পতঙ্গের ঝাঁক। আর গাছে ঝিঁঝিরা। তাদের দেখা যায় না। গাছপালার আড়াল থেকে সারাদিন গলা সেধে যায়।

বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে রজতের একটা সাইকেল দাঁড় করানো থাকে। অন্য দিনের মতো আজও বাগানে এসে কিছুক্ষণ পাখি আর প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখল সে। ঝিঁঝিদের ডাক শুনল। তারপর সাইকেলটা টেনে এনে সেটায় চড়ে লনের চারপাশের

সুরকির পথটায় বাঁই বাঁই করে পঁচিশ তিরিশ পাক ঘুরে নেমে পড়ল। একটানা সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা রাস্তায় রেখে লনের মাঝখানে এসে সিমেন্টের সিটে বসল রজত। জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল তার। মিনিট কয়েক জিরিয়ে আবার কয়েক চক্কর ঘুরবে। সাইকেল চালাতে তার ভীষণ ভাল লাগে।

পশ্চিম দিকে উঁচু উঁচু বাড়ির ওধারে সূর্যটা আরও খানিকটা নেমে গেছে। আকাশ এখন টকটকে লাল। বাতাস জুড়িয়ে যাচ্ছে। আধ ঘন্টা, বড় জোর চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সন্ধে নেমে যাবে।

রজত দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন আর সে হাঁফাচ্ছে না, জোরে শ্বাস পড়া বন্ধ হয়েছে।

হঠাৎ খুব কাছ থেকে কেউ যেন ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'তুমি তো খুব ভাল সাইকেল চালাতে পারো—' গলার স্বরটা ধরা ধরা, ভাঙা। ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম।

রজত চমকে উঠল। মাথাটা এধারে ওধারে ঘুরিয়ে কারোকেই দেখতে পেল না। তার মনে হল, ভুল শুনেছে। এই বাগান একেবারে ফাঁকা। সে ছাড়া আর তো কেউ নেই। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড বাদে ফের সেই গলা কানে এল, 'ভয় পেও না। আমাকে তোমার বন্ধু ভাবতে পার।'

গায়ে কাঁটা দেয় রজতের। গলা শুকিয়ে কাঠ। দৌড়ে যে পালিয়ে যাবে, তার উপায় নেই। কেউ যেন পা দু'টো পেরেক ঠুকে মাটিতে গেঁথে দিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনও রকমে সামলে নিয় ত্রস্তভাবে বলল, 'কে তুমি?'

'আমার নাম আনন্দ। ডাক-নাম বিজু। আমাকে তুমি বিজু বলেই ডেকো।'

'ডাকব যে, তোমাকে তো দেখতেই পাচ্ছি না।'

'আমাকে দেখা যায় না।'

যেদিক থেকে গলার স্বরটা ভেসে আসছে সেদিকে তাকিয়ে রজত জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

আনন্দ বলল, 'পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব।'

'পরে তোমাকে পাব কোথায়?'

'আমি এই বাড়িতেই থাকি। তোমাকে ঠিক খুঁজে নেব। তোমার নামটা কী ভাই?'

আনন্দকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। জানিয়ে দিয়েছে সে নাকি এ বাড়িতেই থাকে।

সব কেমন গুলিয়ে গেল রজতের। তবে কি — তবে কি —। যে কথাটা তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল সেটা জিজ্ঞেস করতে একেবারেই সাহস হল না। কোনও রকমে নিজের নাম আর ডাক-নামটা বলল সে।

আনন্দ বলল, 'আমি তোমাকে শানু বলেই ডাকব।'

ঘাড় সামান্য হেলিয়ে দেয় রজত, 'আচ্ছা—'

'সাত দিন আগে তোমরা যখন এ-বাড়িতে এলে, আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমাকে দেখে কী ভাল যে লেগেছিল! স্কুলে তোমার ভ্যাকেশান চলছে। তাই ক' দিন ধরে

তোমাকে বিকেল বেলায় এই বাগানে একা একা বেড়াতে দেখছি। সাইকেল চালাতে দেখছি। খালি ভাবতাম, তোমার সঙ্গে গল্প করব। তারপরেই মনে হত, যদি তুমি ভয় পেয়ে যাও? কিন্তু আজ আর পারলাম না, সোজা এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম।'

একটু চুপ।

তারপর আনন্দ আবার শুরু করে, 'জানো শানু, আমিও একসময় খুব ভাল সাইকেল চালাতে পারতাম।'

আনন্দর সঙ্গে কথা বরতে বলতে ধীরে ধীরে সাহস বাড়ছিল রজতের। নিজের অজান্তেই সে বলে ফেলল, 'সাইকেলটা তো ওখানে রয়েছেই। যাও না, চড়ো—' বলে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

'না।'

'না কেন?'

'আমি একা চড়ব না। তুমিও সঙ্গে থাকবে। আমি চালাব। তুমি পেছনে ক্যারিয়ারে বসবে—'

গলা শুনে মনে হচ্ছে আনন্দর বয়স খুব বেশি নয়। তার চাইতে দু-এক বছরের ছোট কি বড় হবে। একটি অদৃশ্য কিশোর তাকে পেছনে বসিয়ে সাইকেল চালাবে, ব্যাপারটা ভাবতেই ভারি মজা লাগল রজতের। সে উঠে পড়তে পড়তে বলল, 'ঠিক আছে। চল—'

কিন্তু বাধা পড়ল। বাউন্ডারি ওয়ালের শেষ মাথায় গেট। সেটা খোলার আওয়াজ কানে আসতে সেদিকে তাকায় রজত। দেখা গেল দারোয়ান মস্ত লোহার ফটকটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝবয়সী ঘনশ্যাম বাইরের রাস্তা থেকে বাড়ির কমপাউন্ডে ঢুকে পেছনের বাগানের দিকে আসছে।

ঘনশ্যাম রজতদের মালি। রোজ বিকেলে দিকে এসে সে লম্বা রবারের নল দিয়ে গাছে জল দেয়, দরকারমতো সার দেয়, মস্ত কাঁচি দিয়ে গাছের পাতা ছেঁটে ফেলে। আগাছা সাফ করে।

আনন্দ বলল, 'আজ সাইকেল চালানো থাক। তোমাদের মালি এসে গেছে, সে যদি দেখে, তুমি পেছনে বসে আছ, অথচ বোঁ বোঁ করে সাইকেল চলছে, হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক কান্ডই করে বসবে। এখন আর কোনও কথা নয়।'

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে রজত। তারপর ডাক, 'বিজু—'

সাড়া পাওয়া গেল না। তার মানে আনন্দ চলে গেছে।

এদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। রজত অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সাইকেলটা বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে যেখানে হেলান দিয়ে রাখা হয় সেখানে রেখে বাড়ির ভেতর চলে এল।

একতলায় কিচেন, ডাইনিং রুম, ক'টা শোবার ঘর আর সাজানো গোছানো বিশাল ড্রইং রুম। পুরো দোতালাটা মা আর বাবার। তেতলায় রজতদের তিন ভাইবোনের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বিরাট বেডরুম। তা ছাড়া একটা বড় হল-ঘরও আছে।

চাকর বাকরেরা যে-যার কাজে ব্যস্ত। ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে

অন্য দিন বাগান থেকে ঘুরে এসে একবার দিদির ঘরে হানা দেয় রজত। তাকে কিছুক্ষণ জ্বালাতন করে। কিন্তু আজ সোজা নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। আনন্দর ব্যাপারটা তাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে অন্য কিছুই ভাবতে পারছে না।

একসময় উঠে পড়ল রজত। কাল ম্যাথসের টিচার আসবেন। অনেকগুলো অঙ্ক কষতে দিয়ে গেছেন। সেগুলো কষতে হবে। তা ছাড়া, সামার ভ্যাকেশানের পর স্কুল খুললেই হাফ ইয়ারলি এগজামস। অন্য পড়াও আছে। অ্যাটাচড বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে, পোশাক পালটে পড়তে বসে গেল সে। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন বসছে না। বাগানের খানিক আগে সত্যিই কি আনন্দ নামে অদৃশ্য কোনও কিশোরের সঙ্গে কথা বলেছে? সব কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তার শোবার ঘরের একধারে পড়ার টেবল। সেখানে বসেই একসময় রজত দেখতে পায় বাবা-মা ফিরে এলেন।

দশটা নাগাদ বাড়ির কাজের লোক দশরথ তাকে নিচে ডাইনিং রুমে ডেকে নিয়ে গেল। বাবা, মা আর দিদি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত্তিরে এ-বাড়িতে সবাই একসঙ্গে বসে খায়। এটা অনেক দিনের রেওয়াজ।

মা আর বাবা মোটেও গম্ভীর নন, খুবই হাসিখুশি। ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন। খাওয়ার টেবলে তাঁরা অনেক গল্প টল্প করলেন। অন্যমনস্কর মতো হুঁ হুঁ করে গেল রজত।

খাওয়া শেষ হলে ফের তেতলায় নিজের ঘরে ফিরে আসে সে। অন্য দিন ওপরে উঠেই শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে যায়। কিন্তু আজ শুলেও কিছুতেই ঘুম আসছে না। পুরু গদিওলা ধবধবে নরম বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে।

আচমকা আনন্দর ডাক শোনা গেল, 'শানু—'

ধড়মড় করে উঠে বসে রজত। এই রাত্রিবেলায় আনন্দ যে তার ঘরে এসে হাজির হবে, ভাবতে পারে নি। বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপতে লাগল। বলল, 'তুমি!'

'একা একা ভাল লাগছিল না। তাই ভাবলাম, তোমার কাছে এসে একটু গল্প করি। ঘুমটা বোধ হয় ভাঙিয়ে দিলাম—'

রজতের বুকের কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে কমে এল। এর মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে, আনন্দ সত্যিকারের ভাল ছেলে, তার কোনও ক্ষতি করবে না। বলল, 'না, আমার ঘুম আসে নি। বসো—'

আনন্দকে দেখা যাচ্ছে না। তবু রজত টের পেল, তার কাছাকাছি খাটের ওপর বসে পড়েছে আনন্দ।

খানিক চুপচাপ।

তারপর রজত খানিক চিন্তা করে বলল, 'তোমার সম্বন্ধে আমার ভীষণ কিউরিয়সিটি হচ্ছে—'

সামান্য হাসির শব্দ হল। পরক্ষণে আনন্দ বলে ওঠে, 'আমার নামটাই শুধু বলেছি। কিন্তু আমি কে, কীভাবে এখানে এলাম, কতদিন এ বাড়িতে আছি — এসব জানতে চাও তো?'

'হ্যাঁ।'

'সে-সব বলার জন্যেই তো এলাম। বিকেল বেলা ভেবেছিলাম সাইকেল চালাবার পর আমার কথা তোমাকে বলব। কিন্তু তোমাদের মালিটা এসে গেল। সাইকেল চড়াও হল না, নিজের কথাও বলতে পারলাম না।'

এরপর আনন্দ থেকে থেমে যা বলল তা এইরকম। যে পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িটা এখানে ছিল, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তার ঠাকুরদা সেটা বানিয়েছিলেন। এখানে থাকতেন ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা আর মা। আনন্দর বাবা তাঁর ঠাকুরদার একমাত্র সন্তান।

ওদের পূর্বপুরুষের অজস্র টাকা-পয়সা ছিল। তা ছাড়া, ঠাকুরদা আর বাবা দু'জনেই বিরাট চাকরি করতেন। প্রচুর মাইনে।

ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে থাকতেই আনন্দর জন্ম। ওর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন ঠাকুরদা মারা যান। তারও তিন বছর বাদে ঠাকুমার মৃত্যু হল।

আনন্দর কোনও ভাইবোন নেই। সেও তার মা-বাবার একমাত্র ছেলে। সব দিক থেকেই চৌকশ। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। দারুণ ফুটবল, ব্যাডমিন্টন আর ক্যারম খেলতে পারত। স্কুলের মাস্টার মশাইরা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত লোকজন, সবাই তাকে ভালবাসত।

কিন্তু ক্লাস নাইনে ওঠার পর কয়েক দিনের জ্বরে আনন্দ মারা যায়। এই শোক সইতে পারেন নি তার মা-বাবা। একেবারে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। এই বাড়িটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

হাওড়ায় আনন্দের আরও একটা বাড়ি ছিল। এটায় তালা লাগিয়ে মা-বাবা সেখানে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ত্রিশ-বত্রিশ বছর কেটে গেছে। পড়ে থেকে থেকে বাড়িটার হাল ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। চারদিকে আগাছার জঙ্গল। কার্নিস, রেনওয়াটার পাইপ, দেওয়াল, সব প্রায় ধসে পড়েছিল।

আনন্দর মা-বাবা চলে গেলেও মৃত্যুর পর সে এ-বাড়িতেই থেকে গেছে। ওঁরা থাকতে বার বার কাছে গিয়ে কথা বলতে চাইত কিন্তু ওর মা-বাবা ভীষণ ভয় পেতেন।

আনন্দ বলতে লাগল, 'মাস ছয়েক আগে আমার বাবা এই বাড়িটা তোমার বাবাকে বেচে দিলেন। তারপর সারিয়ে সুরিয়ে তোমরা চলে এলে। আমিও তোমার মতো একজন বন্ধু পেয়ে গেলাম।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'এই হল আমার লাইফ-হিস্ট্রি। এখন থেকে আমরা এক বাড়িতেই থাকছি। পরে আবার গল্প করব। অনেক রাত হল। এখন ঘুমোও। আমি চলি—'

ঘরে একটা খুব অল্প পাওয়ারের নীল আলো জ্বলছিল। আনন্দকে দেখতে না পেলেও রজত টের পেল সে খাট থেকে নেমে পড়েছে।

হঠাৎ আনন্দ খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, তোমার ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট, নেট, ক্যারম বোর্ড টোর্ড আছে দেখছি।'

রজতের বইয়ের আলমারির পাশে চমৎকার কাঠের র‍্যাকে সাজানো রয়েছে তার যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম। আনন্দ নিশ্চয়ই সেগুলো দেখতে পেয়েছিল।

রজত বলল, 'দাদা বাড়ি এলে আমরা দু'জনে খেলি। দিদিটা পড়ার বই ছাড়া আর কিছু

বোঝে না। দাদার সামার ভ্যাকেশানের পর এগ্‌জামস। সে এবার আসবে না। আমারও খেলা হবে না। একা একা তো আর খেলা যায় না।' তাকে বিষণ্ণ দেখাল।

আনন্দ বলল, 'মন খারাপ করো না। আমি তো আছি। কাল দুপুরে এসে তোমার সঙ্গে ক্যারম খেলব। এখন চলি—'

পরদিন দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে রজত। আনন্দকে দেখা যায় না যে তাকে ডেকে আনবে। সে কোথায় আছে, কে জানে। কখন আসবে তা-ই বা কে বলবে। স্থির থাকতে পারছিল না রজত। একবার বিছানায় শুচ্ছে, তক্ষুনি উঠে পড়ছে। ঘরময় কিছুক্ষণ হয়তো ঘুরে বেড়াল। তারপর চলে গেল জানালার কাছে। অধীরভাবে বাইরে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ মনে হল, দুপুরে তার ঘরে আসার কথাটা কি ভুলে গেছে আনন্দ? আর তখনই তার গলা শোনা গেল, 'খুব রেস্টলেস হয়ে পড়েছ, না?'

চকিত হয়ে ওঠে রজত, 'হ্যাঁ। এত দেরি করলে?'

'কোথায় দেরি? সবে তো একটা বাজে। যাও, ক্যারম বোর্ডটা এনে মেঝেতে পেতের ফেল। আর হ্যাঁ, তোমার ঘরের দরজটা বন্ধ করে দাও—'

রজত অবাক। 'দরজা বন্ধ করতে বলছ কেন?'

শব্দ করে হাসল আনন্দ, 'হুট করে ঘরে ঢুকে কেউ যদি দেখে তুমি অদৃশ্য কারও সঙ্গে ক্যারম খেলছ, স্রেফ অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

ঠিকই বলেছ আনন্দ। দরজা বন্ধ করে তারা খেলতে বসে গেল।

রজত আর আনন্দ মুখোমুখি বসেছে। মাঝখানে ক্যারম বোর্ড। আন্দকে দেখা না গেলেও তার স্ট্রাইকার বোর্ডের ওপর ছুটে গিয়ে নির্ভুল ভাবে চারপাশের নেট-লাগানো ফুটোগুলোতে ঘুঁটি ফেলে দিচ্ছে। একের পর এক।

রজত ক্যারম ট্যারম ভালই খেলে। এই নিয়ে তার চাপা একটা গর্ব ছিল। কিন্তু আনন্দ তাকে স্ট্রাইকার ধরার তেমন চান্সই দিচ্ছে না। গেমের পর গেম ডাহা হারিয়ে দিচ্ছে।

হারের চেয়ে যেটা বড় ব্যাপার তা হল কোনও অশরীরী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এই প্রথম সে খেলছে। উত্তেজনা, শিহরন, বিস্ময় — সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল তার।

দু'আড়াই ঘন্টা খেলার পর আনন্দ বলল, 'ক্যারম থাক। এবার চল, খানিকক্ষণ ব্যাডমিন্টন খেলা যাক।'

রজত সায় দিল, 'ঠিক আছে?'

'কোথায় খেলবে?'

'নিচের লনে নেট টাঙিয়ে খেলা যায়।'

'না।'

'কেন?'

সেই একই সমস্যার কথা বলল আনন্দ। অশরীরী কারও সঙ্গে রজতকে কেউ খেলতে দেখলে স্রেফ ভিরমি খাবে।

রজতকে আস্তে মাথা নাড়ে, 'ঠিকই বলেছ। তা হলে ছাদে চল। ওখানে সাদা রং দিয়ে ব্যাডমিন্টনের কোর্ট আঁকা আছে। নেট টাঙাবার জন্যে রয়েছে কাঠের স্ট্যান্ড।'

র‍্যাকেট, নেট টেট নিয়ে ছাদে চলে এল দু'জনে। ওপরে ওঠা কিংবা নিচে নামার জন্য এখানে একটা দরজা আছে। সেটা বন্ধ করে নেট টাঙিয়ে খেলা শুরু হল।

রজত লক্ষ করতে লাগল, তার উলটো দিকে একটা র‍্যাকেট ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আর নেটের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে আসছে সাদা ধবধবে ফেদারটা।

আনন্দ ব্যাডমিন্টনটা তেমন একটা ভাল খেলে না। পর পর গেম জিততে লাগল রজত।

এক সময় খেলা শেষ হল আনন্দ তারিফের সুরে বলল, 'তুমি কিন্তু ব্যাডমিন্টনটা দারুণ খেল—'

রজত বলল, 'আর ক্যারমের বেলায়? তুমি তো আমাকে গো-হারান হারালে।'

আনন্দ হাসতে লাগল, 'আমরা সমান সমান। কোঈ কিসিসে কম নেহী।'

একটা ব্যাপার রজত লক্ষ করেছে, কাল ভাঙা ভাঙা, ধরা গলায় কথা বলছিল। আজ তার কণ্ঠস্বর অনেক স্পষ্ট হয়েছে। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'অনেক বছর তো কথা বলার অভ্যেস ছিল না। তাই ভয়েসটা ওই রকম হয়ে গিয়েছিল।'

রজত ভেবেছিল গরমের ছুটিটা একা একা মনমরা হয়ে কাটাতে হবে। কিন্তু আনন্দর মতো একজন বন্ধু পেয়ে, তার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন ক্যারম খেলে, বিকেলে একসঙ্গে সাইকেলে চড়ে দিনগুলো চমৎকার কেটে যেতে লাগল। শুধু তাই না, সে লেখাপড়ায় ভাল হলেও অ্যারিথমেটিকের প্রবলেমের অঙ্ক নিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়। আনন্দ এ-ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। অঙ্কগুলো জলের মতো বুঝিয়ে দেয়। ইংরেজি আর বাংলার ওপর তার খুব দখল। রজতের জন্য চমৎকার রচনা লেখে, হিস্ট্রির নানা প্রশ্নের উত্তর লেখে। এমন বন্ধু আগে আর কখনও পায় নি রজত।

গরমের ছুটির পর স্কুল খুলতে যখন সপ্তাহখানেক বাকি সেইসময় একদিন রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া সেরে রজত যখন তেতলায় তার ঘরে গিয়ে শুতে যাবে, আনন্দ এসে হাজির। আজকাল সে কাছাকাছি এলেই টের পেয়ে যায় রজত। বলল, 'কী ব্যাপার, কিছু বলবে?'

'বসো। তোমার সঙ্গে ভীষণ আর্জেন্ট কথা আছে।' বলে রজতের খাটের একধারে বসে পড়ল আনন্দ। তার বলার ভঙ্গিতে দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনা মেশানো রয়েছে।

রজতও বসে পড়েছিল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

'তোমাদের কি ডেঞ্জারাস টাইপের কোনও এনিমি আছে?'

'এনিমি, মানে শত্রু?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মা-বাবা খুব ভালমানুষ। ঠাকুরদাও ছিলেন তা-ই। কখনও কারও ক্ষতি করেন নি। কত লোকের যে উপকার করেছেন, তার ঠিক নেই। আমাদের কেন শত্রু থাকবে?'

একটু চুপ।

তারপর রজত বলল, 'হঠাৎ তোমার এ-কথাটা মনে হল কেন?'

আনন্দ বলল, 'আজ একটা প্রাইভেট কার তোমাদের বাড়ির গেট থেকে খানিকটা দূরে এসে থেমেছিল। সেটার ভেতর থেকে তিনটে লোক নেমে এল। দু'জনের পরনে টাইট জিনস, জ্যাকেট। একজনের চোখে মস্ত সান-গ্লাস। আরেক জনের খালি চোখ কিন্তু গালে লম্বা কাটা দাগ। একেবারে মার্কামারা মার্ডারার চেহারা। ওদের পকেটে মনে হল, রিভলভার টিভলভার কিছু ছিল। তবে থার্ড লোকটাকে বাইরে থেকে সাঙ্ঘাতিক মনে হয় নি। পরনে দামি সাফারি স্যুট, পায়ে চকচকে দামি জুতো। হাতে সোনার ব্যান্ড ওলা ঘড়ি। এই তিন নম্বর লোকটা অন্য দু'জনকে কমপাউন্ড ওয়ালের বাইরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপা গলায় কী যেন বলছিল। মাঝে মাঝে তোমার নাম করছিল। আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'ওরা তোমাদের কোনও রকম ক্ষতি করতে চায়।'

বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল রজতের। সে বলল, 'তোমার সঙ্গে বিকেলে ছাদে ব্যাডমিন্টন খেললাম। তারপর নিচে গিয়ে সাইকেল চালালাম। কই, তখন তো আমাকে এ-সব কিছু বল নি!'

আনন্দ বলল, 'সন্ধের একটু আগে আগে তুমি বাড়ির ভেতর চলে গেলে। বললে, তোমার টিচার আসবেন। আমি তখন এধারে ওধারে খানিকক্ষণ ঘুরে কমপাউন্ড ওয়ালের ওপর গিয়ে বসলাম। আর তখনই ওই লোক তিনটেকে দেখতে পেলাম। ওদের কথা কানে এল। খবরটা দেবার জন্যে তোমার ঘরের জানলা দিয়ে ক'বার উঁকি দিলাম। যতবার যাই, দেখি মাস্টার মশাই তোমাকে পড়াচ্ছেন। উনি চলে যাবার পর তুমি খেতে গেলে। এখন তোমাকে একলা পেয়েছি, তাই বলতে পারলাম।'

'কী হবে বল তো?'

'এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তো আছি।'

'বাবাকে কি সব জানাব?'

'এক্ষুনি জানাবার দরকার নেই। আগে ওদের মতলবটা বুঝি। কোথায় থাকে খবর নিই। তারপর দরকার হলে তোমার বাবাকে জানাতে বলব।'

গরমের ছুটির পর রজতের স্কুল আর তার দিদির কলেজ খুলে গেল। স্কুল-কলেজ খোলা থাকলে বাড়ির অ্যামবাসাডরটা প্রথমে দিদিকে কলেজে নামিয়ে রজতকে তার স্কুলে পৌঁছে দেয়। ফেরার সময় অবশ্য উলটো ব্যাপার। রজতের স্কুলটা দূরে বলে ছুটির পর তাকে আগে তুলে পরে দিদির কলেজে আসা হয়। দিদির যদি তখনও ছুটি না হয়ে থাকে রজতকে অপেক্ষা করতে হয়। তরপর দু'জনে একসঙ্গে বাড়ি আসে।

দিদি একেবারে টের পায় না, কিন্তু রজত বুঝতে পারে স্কুলে যাতায়াতের সময় আনন্দ তার সঙ্গেই থাকে। অবশ্য সেই বদমাশ লোকগুলোর পাত্তা নেই। আনন্দ তাদের আর দেখতে পায় নি।

দু'সপ্তাহ ক্লাস চলার পর আজ সাঙ্ঘাতিক ব্যাপারটা ঘটে গেল।

স্কুল ছুটির পর রজতদের অ্যামসাডর তাকে তুলে নিয়ে দিদির কলেজের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটা চালায় মাঝবয়সী রামসেবক যাদব। সে বিহারের লোক, কিন্তু অনেক বছর রজতদের কাছে চাকরি করছে। পৃথিবীতে তার কেউ নেই। সে ওদের বাড়িতেই থাকে।

রজতদের স্কুলের সামনে দিয়ে চওড়া ট্রাম রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে কিছুটা এগোলে ডান পাশে একটা সরু গলি। এই গলিটা অন্য একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। গলি দিয়ে ওধারের রাস্তায় যেতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি দিদির কলেজে পৌঁছনো যায়। নইলে অনেকটা ঘুরতে হয়, সময়ও লাগে ঢের বেশি।

বড় রাস্তাগুলোতে বিকেলবেলা প্রচুর লোকজন থাকলেও গলিটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। কেন না, ওটার একদিকে বহুকালের পুরনো একটা গোরস্থান অন্য পাশে ক'টা ভাঙাচোরা পড়ো বাড়ি। সময় বাঁচাবার জন্য এই গলি দিয়েই গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করে রমাসেবক।

আজও তাই করছিল। গলিটার মাঝামাঝি যখন সে চলে এসেছে সেই সময় আচমকা একটা টাটা সুমো উলটো দিক থেকে এসে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রামসেবক জোরে ব্রেক কষে অ্যামবাসাডরটা থামিয়ে দিল। নইলে দুর্ঘটনা ঘটে যেত। ভীষণ রেগে গিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইয়ে কেয়া হ্যায়? গাড়ি হটাও—'

ততক্ষণে টাটা সুমো থেকে দু'টো মারাত্মক খুনে চেহারার লোক নেমে পড়েছে। হাতে রিভলভার। দৌড়ে এসে একজন রামসেবকের কপালের ডান পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে চাপা গলায় হিস হিস করে ওঠে, 'চোপ। একটু আওয়াজ করলে খুলি উড়িয়ে দেব।'

চোখের তারা স্থির হয়ে গেল রামসেবকের। কী বলতে যাচ্ছিল, গলা দিয়ে সেটা আর বেরিয়ে এল না।

এদিকে আরেকটা লোক অ্যামবাসাডরের পেছন দিকের দরজা খুলে ফেলেছে। হাতের রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরে খুব ঠাণ্ডা গলায় রজতকে বলল, 'নেমে এস।'

বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল রজতের। আঙুলের ডগাগুলো ঝি-ঝি করছে। আলো কমে গিয়ে চারপাশ কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। নিজের অজান্তেই বুঝিবা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে।

লোকটা রজতের হাত ধরে টানতে টানতে টাটা সুমোতে নিয়ে তুলল। ওদিকে রামসেবকের কপালে যে লোকটা রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছিল সে আচমকা ফায়ার করে অ্যামবাসাডরের চাকা ফাঁসিয়ে দিয়ে দৌড়ে এসে টাটা সুমোতে উঠে পড়ল। লোকটার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। রামসেবক যাতে পেছনে ধাওয়া করতে না পারে সেই কারণে গুলি করা।

টাটা সুমোর ড্রাইভার স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল। বিদ্যুৎগতিতে সে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ওদিকের বড় রাস্তায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সামনের সিটে ড্রাইভার। ব্যাক-সিটে রজতকে মাঝখানে বসিয়ে দু'পাশে রিভলভার হাতে সেই খুনে টাইপের লোক দু'টো বসেছে। তাদের একজন খুব নরম গলায় বলল, আমাদের কথামতো চললে, কিচ্ছু করব না।'

রজত উত্তর দিল না।

লোকটা ফের বলল, 'গোলমাল না করে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে, কেমন?'

দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রজতের। তবু তারই মধ্যে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ডানপাশের লোকটা হেসে হেসে বলল, 'গেলেই দেখতে পাবে।'

'আমি আপনাদের চিনি না। আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'ক'টা দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাই—'

টাটা সুমো বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। এই বিকেল বেলায় চারদিকে অজস্র লোকজন, নানা ধরনের গাড়ির স্রোত। মরিয়া হয়ে রজত ভাবল, চিৎকার করে উঠবে। রাস্তার কেউ শুনতে পেলে নিশ্চয়ই তাকে শয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করবে।

দু'পাশের লোক দু'টো ভীষণ ধূর্ত। রজতের মাথায় কী চিন্তা চলছে, সেটা মুহূর্তে টের পেয়ে গেল। বাঁ পাশের লোকটা চাপা গলায় শাসাল, 'একদম চেঁচাবে না।' বলেই আচমকা প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে তার মুখে ঠেসে ধরল।

রজত প্রাণপণে লোকটার হাত ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু খুনেটার গায়ে এমন প্রচণ্ড শক্তি যে কিছুই করা গেল না। সে টের পেল, রুমাল থেকে মিষ্টি অথচ তীব্র একটা গন্ধ নাকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। দু'চোখ জড়িয়ে আসছে।

কার একটা লেখায় ক্লোরোফর্মের কথা যেন পড়েছিল রজত। মনে হল রুমালে সেই রকম কিছু মাখিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হচ্ছে। সে যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়তে শুরু করেছে সেই সময় কানের কাছে অস্পষ্ট ফিসফিসানি শুনতে পেল, 'কোনও ভয় নেই। আমি সঙ্গে আছি।'

আনন্দর গলা। সে যেন আরও কী বলল, কিন্তু তার কিছুই বুঝতে পারল না রজত। বিকেলবেলার কলকাতা তার চোখের সামনে থেকে একেবারে মুছে গেল। সব অন্ধকার।

জ্ঞান ফিরলে রজত দেখতে পেল সে দারুণ সাজানো গোছানো একটা ঘরে দামি খাটে, ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু দরজা-জানালা সব বন্ধ। সে ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। মাথায় যেন ঘন কুয়াশা জমে আছে। প্রথমটা রজত বুঝতে পারল না, এই ঘরটায় সে কীভাবে এল। কেনই বা শুয়ে আছে? আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যেতে লাগল। স্কুল ছুটির পর কী কী ঘটেছে, একে একে সব মনে পড়ে গেল তার। ভাবল সেই খুনে টাইপের লোক দু'টোই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই জায়গাটা কোথায়? লোক দু'টোকেই বা দেখা যাচ্ছে না কেন? তাকে শুইয়ে রেখে ওরা কোথায় গেল?

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রজত। তার মনে হল, এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো দরকার। দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়বে। তারপর রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে কাছাকাছি কোনও থানায় চলে যাবে।

বিছানা থেকে সবে নেমেছে, কানের কাছে সেই ফিস ফিস। 'তুমি কি দরজা খুলতে যাচ্ছ?'

রজতের মনে পড়ল, আনন্দ বলেছিল সে সবসময় তার কাছে কাছেই থাকবে। বলল, 'হ্যাঁ।'

'খুলতে পারবে না। বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে বদমাসগুলো হোটেলে খেতে গেছে। তোমার জন্যেও খাবার নিয়ে আসবে।'

'ওরা কারা, কেন আমাকে এখানে ধরে এনেছে, তুমি জানো?'

আনন্দ বলল, 'জানি। তোমাকে সেদিন বলেছিলাম না, তিনটে লোক তোমাদের বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। মনে আছে?'

রজত বলল, 'আছে।'

'এরা হচ্ছে সেই তিন বদমাশ—'

'দু'জনকে দেখেছি। থার্ড লোকটার যে ডেসক্রিপশান দিয়েছিলে তেমন কারোকে তো দেখিনি।'

'তাকেও কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবে। সে-ই হচ্ছে আসল ক্রিমিনাল। নাম মণিলাল চৌধুরি। মণিলাল ওই শয়তান দু'টোকে দিয়ে তোমাকে কিডন্যাপ করিয়েছে। র‍্যানসম কাকে বলে জানো?'

'জানি। মুক্তিপণ।'

'মণিলাল তোমার বাবাকে ফোন করে জানিয়েছে, তিন দিনের মধ্যে পনেরো লাখ টাকা দিলে তোমাকে ছেড়ে দেবে। নইলে—'

রুদ্ধশ্বাসে রজত জিজ্ঞেস করল, 'নইলে কী?'

আনন্দ বলল, 'তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

রজত শিউরে উঠল, 'বাবা কি টাকাটা দিতে রাজি হয়েছেন?'

'জানি না। তাঁর কথা আমি শুনতে পাই নি। তবে—'

'কী?'

'তোমার বাবাকে র‍্যানসমের টাকা দিতে হবে না।'

'কিন্তু ওরা যে বাবাকে শসিয়েছে, মুক্তিপণ না দিলে আমাকে ছাড়বে না। খুন করে ফেলবে—' বলতে বলতে ভয়ে গলা বুজে আসে রজতের।

আনন্দ বলল, 'খুন করা এতই সোজা? আমি আছি কী করতে? ওই দেখ—' ঘরের কোণে একটা মোটা লোহার রড দেখিয়ে বলতে লাগল, 'ঘন্টাখানেক আগে তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলে, ওরা ধরাধরি করে টাটা সুমো থেকে নামিয়ে এই ঘরে এনে শুইয়ে দিয়েছিল। আমি তখন ওই রডটা নিয়ে ওদের সঙ্গে ঢুকে ওটা ওখানে রেখে দিই।'

রজত জিজ্ঞেস করে, 'কী হবে রডটা দিয়ে?'

'পরে দেখো। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোন। কিছুক্ষণের মধ্যে বদমাশগুলো ফিরে আসবে। ওরা যা বলে মুখ বুজে তাই করবে। বাধা দেবে না। কেমন?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় রজত। বন্ধুর ওপর তার ভরসা যে নেই তা নয়। কিন্তু এই খুনেগুলোর হাত থেকে আনন্দ তাকে উদ্ধার করতে পারবে কি না, পারলে কীভাবে পারবে,

বুঝে উঠতে পারছে না। সে কী বলতে যাচ্ছিল, বাইরে তালা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ব্যস্তভাবে আনন্দ বলে উঠল, 'শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। এখন আর একটা কথাও নয়—'

রজত পা তুলে বিছানায় বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

দরজার পাল্লা ঠেলে তিন জন ঘরের ভেতর চলে এল। দু'জন রজতের চেনা। তিন নম্বর লোকটার চেহারার ডেসক্রিপশন আগেই আনন্দ দিয়েছিল। মণিলাল চৌধুরিকে চিনতে তাই অসুবিধা হল না। খুনে মার্কা লোকদু'টোর একজনের হাতে খাবারের প্যাকেট, আরেক জনের হাতে বড় ওয়াটার বটল।

ঘরের একধারে ক'টা চেয়ার রয়েছে। তিন জন তিনখানা চেয়ার টেনে রজতের খাটের পাশে বসে পড়ল।

মণিলাল বলল, 'ঘুম ভেঙেছে দেখছি। ভেরি গুড। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? তোমার জন্যে বিরিয়ানি আরা চিলি চিকেন নিয়ে এসেছি। খেয়ে নাও। তারপর তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

আস্তে আস্তে উঠে বসল রজত। খাওয়া শেষ হল মণিলাল বলল, 'তোমাকে কী জন্যে ধরে এনেছি জানো?'

আনন্দ চুপ করে থাকতে বলেছে। রজত উত্তর দিল না।

মণিলাল বলতে লাগল, 'তোমার বাবার অনেক টাকা। আমরা তোমার জন্যে মাত্র পনেরো লাখ চেয়েছি। কিন্তু তোমার বাবা মিস্টার অমরেশ লাহিড়ি ভাবার জন্যে টাইম চাইছেন। মনে হয়, পুলিশের কাছে যাবার মতলব করেছেন। আমরা সেই চান্সটা কিছুতেই দেব না।' পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে রজতের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'বাবাকে লাইনে ধর। তাকে বুঝিয়ে দাও, পুলিশের কাছে গেলে ফল ভাল হবে না। তোমার লাইফের চেয়ে পনেরো লাখ বেশি নয়—'

কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা ধরতে যাচ্ছিল রজত। তার আগেই ঘরের কোণে রাখা সেই লোহার ডান্ডাটা সপাটে এসে পড়ল মণিলালের মুখে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘর ভাসিয়ে দিতে লাগল।

মারাত্মক চোট লাগায় মণিলাল বন্দুকবাজ দু'টোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। টাল সামলাতে না পেরে দুই বদমাশ ঠিকরে পড়েছে মেঝেতে। কিন্তু তারা উঠে দাঁড়াবার আগেই ডান্ডাটা সজোরে তাদের মুখ মাথায় মালাই চাকিতে কোমরে হাঁটুতে এসে পড়তে লাগল। তিনজনের শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি। সমানে গোঙাচ্ছে তারা।

সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য। কারোকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা মারাত্মক অস্ত্র দ্রুত ওপরে উঠছে, পরক্ষণে আছড়ে পড়ছে তিন শয়তানের ওপর। তাদের হাড় মাংস থেঁতলে দিচ্ছে।

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রজত। একসময় একটা অদৃশ্য হাত তাকে ধরে টেনে তুলল। তারপর আনন্দর গলা শোনা গেল, 'চল। ডান্ডাটা কেন এনে রেখেছিলাম, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখে নি রজত। তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কোনও রকমে বলতে পারল, 'হ্যাঁ।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের শেকল তুলে দিল আনন্দ। বলল, 'যা পিটিয়েছি, মিনিমাম দশ ঘন্টা ক্রিমিনালগুলো মেঝেতে পড়ে থাকবে। দরজাও বন্ধ করে দিলাম। এবার বাকি কাজটা সেরে ফেলতে হবে।'

রজত জিজ্ঞেস করল, 'বাকি কী কাজ?'

'চল না। গেলেই বুঝতে পারবে।'

এই বাড়িটা একতলা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। একেবারে নিঝুম। ঘরের ভেতর তিন বদমাশ ছাড়া আর কেউ আছে বলে মনে হল না।

গেট পেরিয়ে বাইরের পিচের রাস্তায় এসে দেখা গেল চারদিক সুনসান। এলাকাটা ফাঁকা ফাঁকা। অনেক দূরে দূরে একেকটা বাড়ি। কোথাও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। এখানে ওখানে টিম টিম করে রাস্তার আলো জ্বলছে।

রজতের হাতটা ধরেই রেখেছিল আনন্দ। জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছে সে। সেই বিকেল থেকে রজতের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু আনন্দর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হচ্ছে।

রজত বলল, 'এটা তো কলকাতা শহর বলে মনে হচ্ছে না।'

আনন্দ বলল, 'না। কলকাতা থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে এটা একটা ছোট শহর। নাম রাজনগর।'

একটু চাপচাপ।

তারপর আনন্দ ফের বলে, 'তোমাকে যখন ওরা ঘরে আটকে রেখেছিল, আমি কিছু খোঁজখবর নিয়েছিলাম। সেগুলো বলছি। একদম ভুলে যেও না। আমরা এখন থানায় যাচ্ছি। সেখানে ওসি'কে এসব জানাতে হবে। আমার পক্ষে তো বলা সম্ভব নয়। আমি বললে ভদ্রলোক ফেইন্ট হয়ে যাবেন।'

রজত বলল, 'ওসি'কে কী জানাতে হবে, বল—'

'যে বাড়িটা থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম ওটার নাম 'হ্যাপি ভিলা'। মালিক মণিলাল চৌধুরি। 'হ্যাপি ভিলা' যে রাস্তার ওপর সেটার নাম ধরণী ঘোষাল রোড।'

রজত বুঝতে পারল, ক্রিমিনালদের অ্যারেস্ট করার জন্য এই সব ইনফরমেশন ভীষণ জরুরি।

থানাটা শহরের মাঝামাঝি জায়গায়। এই অঞ্চলটা মোটামুটি জমজমাট। বেশ রাত হয়েছে তবু এখনও বেশ কিছু দোকানপাট, হোটেল খোলা রয়েছে।

থানার গেটে যে-কনস্টেবলটা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করতে ওসি'র কামরা দেখিয়ে দিল। রজতর সোজা সেখানে চলে গেল।

ওসি'র বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পেটানো স্বাস্থ্য। হাইট ছ'ফিটের বেশি। জবরদস্ত চেহারা। গায়ে পুলিশের জমকালো উর্দি।

এখন সাড়ে ন'টার মতো বাজে। এত রাতে এই ছোট মফস্বল শহরের থানায় তেরো চোদ্দ বছরের একটি ছেলেকে একা আসতে দেখে ওসি বেশ অবাক হলেন। তিনি তো জানেন না, রজতের সঙ্গে আনন্দও রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? কে তুমি?'

নিজের নাম টাম বলে তার অপহরণের ঘটনাটা জানিয়ে দিল রজত।

ওসি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। রজতকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'তোমার কিডন্যাপিং-এর খবরটা পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে থানায় থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ধেবেলায় আমরাও খবরটা পেয়েছি। কারা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কীভাবে ছাড়া পেলে?'

রজত বলল, 'সব বলব স্যার। আগে আমার বাবাকে ফোন করে বলুন, আমি আপনাদের থানায় ওয়েট করছি। আর যারা আমাকে কিডন্যাপ করেছিল, ধরণী ঘোষাল রোডের 'হ্যাপি ভিলা'য় তারা একটা ঘরে আটকে আছে। ওদের অ্যারেস্টের ব্যবস্থা করুন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' ওসি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রজতের কাছ থেকে তাদের ফোন নাম্বার নিয়ে প্রথমে তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজনগর থানায় চলে আসতে বললেন। তারপর টেলিফোন নামিয়ে রেখে রজতের দিকে তাকালেন, 'তোমাকে ভীষণ টায়ার্ড দেখাচ্ছে। তুমি এখানে রেস্ট নিতে থাকো।' আমি কিছুক্ষণের ভেতর চলে আসছি। তোমার বাবাও এসে পড়বেন।' ওসি বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে বিরাট আর্মড ফোর্স।

ঘন্টাদেড়েক পর ফিরে এলেন ওসি। ততক্ষণে রজতের বাবা অমরেশ লাহিড়িও চলে এসেছেন।

ওসি'কে কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছিল। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে রজতকে বললেন, 'হ্যাপি ভিলা'য় গিয়ে আমি অবাক। তিন ক্রিমিনাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। চারদিকে রক্তের স্রোত। একটা ভারী লোহার রড পাওয়া গেছে। মনে হয়, ওটা দিয়ে ওদের বেদম মারা হয়েছে। কিন্তু তোমার মতো একটা বাচ্চা ছেলের পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। ওদের এমন হাল কেমন করে হল, বলতে পার?'

তাকে কিডন্যাপ করার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব বলে গেল রজত। খুঁটিনাটি কিছু বাদ দিল না।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখ গোলাকার হয়ে গিয়েছিল ওসি এবং রজতের বাবার।

ওসি বললেন, 'তাই কখনও হতে পারে!'

রজত উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই হাওয়ার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হয় হয়। আমিই পিটিয়ে ওদের ওই দশা করেছি।'

ওসি চমকে উঠলেন, 'কে তুমি?'

'আমি রজতের বন্ধু আনন্দ।'

সোনার টাকা

পঞ্চাশ বছর আগে আমি প্রথম বম্বে যাই। এখন অবশ্য শহরটার নাম বদলে করা হয়েছে মুম্বাই। কিন্তু আমার এই গল্পটা তো এই সময়ের নয়। অনেক দিনের পুরনো। তাই বম্বেই লিখছি।

বম্বে গিয়েছিলাম চাকরির খোঁজে। মাসখানেক এখানে ওখানে ছোটাছুটি এবং একে তাকে ধরাধরির পর একটা কাপড়ের কলের হেড-অফিসে কাজ জুটে গেল।

বম্বে তখন আজকের মতো বিশাল হয়ে ওঠে নি। তবে চারদিকে হাত-পা ছড়াতে শুরু করেছে।

মূল শহরের চার্চ গেট স্টেশন থেকে ইলেকট্রিক ট্রেন শহরতলি ভেদ করে অনেক দূর চলে যেত। এখনও যায়। দু-চার মিনিট যেতে না-যেতেই স্টেশন। সেগুলোর গায়ে ছোট ছোট বসতি। অনেকটা মফস্বল টাউনের মতো। ওই সব জায়গায় ভিড় ছিল না। হইচই নেই। গাড়িটাড়ি বেশ কম।

আমার অফিস খাস বম্বে শহরে। থাকতাম মাইল পনেরো দূরে খার নামে শহরতলির একটা জায়গায়। মাঝারি ধরনের মাদ্রাজি হোটেল। হোটেলের বোর্ডারদের বেশির ভাগই দক্ষিণ ভারতের লোকজন। কিছু কিছু সিন্ধি এবং কোঙ্কনিও ছিল। আমিই একমাত্র বাঙালি।

সপ্তাহে আমার পাঁচদিন অফিস। শনি আর রবি ছুটি। ছুটি বলে হোটেলে শুয়ে বসে বা আয়েস করে ঘুমিয়ে কাটাতে আমার ইচ্ছা করত না। এই দুটো দিন সকাল হলেই স্নান সেরে শুকনো কিছু খাবারদাবার আর জলের বোতল ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়তাম। একা একা নিজের ইচ্ছামতো বেড়াতে আমার কী ভাল যে লাগে। সাবার্বন ট্রেনে চড়ে বম্বে শহরের দিকে নয়, উলটো দিকে অনেক দূরের কোনও স্টেশনে গিয়ে নেমে পড়তাম। এখানে যে স্টেশনে নামা যাক, খানিকটা হাঁটলেই সমুদ্র আরব সাগর।

সমুদ্র আমার ভীষণ প্রিয়। তা ছাড়া বম্বের শহরতলির নানা জায়গায় সমুদ্রের গা ঘেঁষে মাথা তুলে আছে ছোট বড় কত যে পাহাড়। সব মিলিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অন্য ছুটির দিনের মতো সেদিনও একটা স্টেশনে নেমে সমুদ্রের ধারে বাদামি 'বীচে'র ওপর গিয়ে বসলাম। সামনের দিকে যতদূর চোখ যায় আরব সাগর। ডান পাশে ক'টা বিরাট বিরাট ভগ্নস্তূপ। কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে, পোর্তুগিজ বোম্বেটেরা এই সব

অঞ্চলে বহুকাল আগে কেল্লা বানিয়েছিল। ভেঙেচুরে সেগুলোর এখন এই হাল। বাঁ পাশে সাত আটটা পোড়ো বাড়ি। কোনওটা দোতলা, কোনওটা তেতলা। প্রতিটি বাড়ি ঘিরে অনেকটা করে জায়গা। এই সব বাড়ি কেল্লাগুলোর মতো অত পুরনো নয়। ষাট সত্তর কি আশি বছর আগের। পয়সাওলা লোকেরা নিরিবিলিতে শহরের হট্টগোল থেকে দূরে সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য এগুলো তৈরি করিয়েছিল। তারা হয়তো মরে ঝরে গেছে। তাদের ছেলেমেয়ে কিংবা নাতি নাতনি কেউ নেই। থাকলেও এই নিঝুম জায়গায় এসে থাকার মতো শখ ওই বংশধরদের নেই। তবে আরও খানিকটা দূরে বেশ ক'টা পুরনো বাড়ি ভেঙে উঁচু উঁচু বিল্ডিং মাথা তুলছে। তার মানে বম্বে সিটি শহরতলির দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। কয়েক বছরের ভেতর এই সব জায়গা আর নিরালা থাকবে না।

পুরনো, নোনা-ধরা, ধসে-পড়া বাড়ি আর জল-দস্যুদের কেল্লা ছাড়া বীচের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে কত যে নারকেল গাছ। সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে অগুনতি জেলে নৌকো। বাতাসে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সি-গাল। ভাঙা কেল্লা দু'টোর ওধারে উঁচুনীচু পাহাড়।

সবে সেপ্টেম্বর মাসের শুরু। আগস্টের মাঝামাঝি এ-বছরের মতো এখানকার বর্ষা শেষ হয়েছে। বম্বের বর্ষার মতো সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ভূ-ভারতে আর কোথাও হয় কি না আমার জানা নেই। সেই জুন থেকে আগস্টের আধাআধি পর্যন্ত একটানা জল ঝরতেই থাকে। ঝরতেই থাকে অবিরাম।

এখন কোথাও ছিটেফোঁটা মেঘ চোখে পড়ছে না। আকাশ আশ্চর্য নীল। দুপুর হতে ঢের দেরি। সোনালি রোদ সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

আমার ইচ্ছে সূর্য মাথার ওপর উঠে এলে দুপুরের খাওয়া সেরে বোম্বেটেদের প্রাচীন ঘাঁটিগুলো দেখতে যাব। তিন শ,' সাড়ে-তিন শ' বছর আগে উত্তাল সব মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পোর্তুগিজ জলদস্যুরা বম্বেতে এসে কেল্লা তৈরি করে কীভাবে তার ভেতর থাকত, হয়ত তার কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও ওখানে রয়ে গেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কর মতো এ-সব ভাবছিলাম। হঠাৎ চাপা, খসখসে গলায় কেউ ডেকে উঠল, 'এ মিস্টার—'

নির্জন বীচ। আশেপাশে কেউ নেই। এখানে কে আমাকে ডাকতে পারে? চমকে উঠে এধারে ওধারে তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম দশ বারো ফুট দূরে বাতাসে কী যেন জমাট বেঁধে আবছাভাবে মানুষের একটা চেহারা ফুটে উঠে কাঁপতে কাঁপতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মিনিট দুই বাদে ফের একই দৃশ্য। বার চার পাঁচেক এইভাবে চলল। তারপর মূর্তিটা স্পষ্ট হল।

বয়স ষাট বাষট্টি। চৌকো মুখ। তামাটে রং। দৃঢ় চোয়াল। হাইট ছ'ফিটেরও বেশি। এই বয়সেও চামড়া তেমন কুঁচকে যায় নি। লোকটার সাজসজ্জা সেকেলে। ঢলঢলে ফুল প্যান্ট, ডবল-কাফ দেওয়া ফুলশার্ট, মাথায় ঢেউ খেলানো ফেল্টের টুপি। পায়ে ফিতে-বাঁধা বুট জুতো। বুকে টাই ঝুলছে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। সোনার চেনে বাঁধা সেকেলে পকেট ঘড়ি। পুরনো কী একটা বইয়ে এ জাতীয় সাহেবি পোশাক আশাক পরা ছবি দেখেছিলাম। লোকটা যেন সেই বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে

আছে। পরনে শার্ট, ট্রাউজার্স থাকলেও সে যে অভিজাত বংশের মানুষ, বলে না দিলেও চলে। যথেষ্ট সৌখিনও।

দেখামাত্র টের পেয়েছিলাম লোকটা অবাঙালি। শুধু তা-ই না; তার চেহারায় অভারতীয় একটা ছাপ রয়েছে।

ভয়ে আতঙ্কে আমার বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার আওয়াজ হচ্ছিল। মনে হল, হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটু আগে যেভাবে লোকটা হাওয়ার ভেতর থেকে কয়েক বারের চেষ্টায় মানুষের আকার পেল, এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। বুঝতে পারছি, আমার চোখে পাতা পড়ছে না। দৃষ্টি একেবারে স্থির।

লোকটা ভারতীয় আদবকায়দা জানে। হাতজোড় করে বিনীতভাবে ইংরেজিতে বলল, 'আমি কি এখানে বসতে পারি?'

উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে খানিক দূরে বসে পড়ল লোকটা। বলল, 'আলাপ করতে হলে নাম জানলে সুবিধা হয়। এক সময় আমার নাম ছিল মাইকেল গঞ্জালেস। আপনার?'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তবু কোনও রকমে বলতে পারলাম, 'বাসুদেব মল্লিক।'

'আমরা গোয়ার ক্রিশ্চান। আমাদের বলা হয় পিদ্রু। তবে পূর্বপুরুষ ছিল পোর্তুগিজ। বহুকাল এদেশে কাটাবার পর ইন্ডিয়ান হয়ে গেছি। তা আপনারা ভারতের কোন এলাকার লোক?'

'ওয়েস্ট বেঙ্গলের। আমি বাঙালি হিন্দু।'

'বেঙ্গলের নাম শুনেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলটা কোথায়?'

বুঝতে বলতে হল, উনিশ শ'সাতচল্লিশে দেশভাগ হয়ে গেছে। বাংলা আর পাঞ্জাবের অনেকটা অংশ কেটে নিয়ে তৈরি হয়েছে পাকিস্তান। বাংলার যে টুকরোটা ইন্ডিয়ায় পড়েছে সেটার নতুন নাম হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল।

মাইকেল গঞ্জালেস আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'এটা আমার জানা ছিল না। আসলে আপনি যে দেশভাগের কথা বললেন তখন আমি বেঁচে ছিলাম না। সে যাক, বাঙালিদের আমি খুব রেসপেক্ট করি। বাংলাদেশে অনেক বড় বড় জ্ঞানীগুণী মানুষ জন্মেছেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খুব খুশি হলাম।'

মাইকেল গঞ্জালেস যেভাবে হাওয়ার ভেতর থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে আমার সামনে বসে আলাপ জামাতে চাইছে তাতে আদৌ খুশি হই নি। বুকের ধড়ফড়ানিটা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। লোকটার কথার উত্তর দিলাম না।

গঞ্জালেস জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বম্বেতে বেড়াতে এসেছেন?

বললাম, 'না। এখানে চাকরি করি।'

'কোথায় থাকেন?'

আমার আস্তানার কথা জানাতে হল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর গঞ্জালেস কী ভেবে বলল, 'আপনাকে খুব সৎ আর ভদ্র যুবক বলে মনে হয়। আমার মন বলছে, আপনি আমার একটা উপকার করতে পারেন।'

বিনা মতলবে গঞ্জালেস যে আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে আসে নি সেটা আঁচ করতে পারছিলাম। বহুকাল আগে যে বেঁচে ছিল, একজন জীবন্ত মানুষ তার কী উপকার করতে পারে, তা আমার মাথায় আসছিল না। সাহস করে জিজ্ঞেস করতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে মারাত্মক একটা ব্যাপার ঘটে গেল। গঞ্জালেসের হাত পা মাথা বুক পেট, সব কিছু হঠাৎ আলগা হতে হতে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আমার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল। উঠে যে পালিয়ে যাব, তার উপায় নেই। কেউ যেন বড় বড় গজাল ঠুকে আমাকে বীচে গেঁথে দিয়েছে।

বাতাসের ভেতর থেকে গঞ্জালেসের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'প্লিজ ভয় পাবেন না মিস্টার মল্লিক। দু-চার মিনিটের মধ্যে আপনি ফের আমাকে দেখতে পাবেন।'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি বসে থাকি।

গঞ্জালেস যা বলেছিল তা-ই ঘটল। কিছুক্ষণ আগের মতো হওয়ায় জমাট বাঁধতে বাঁধতে তার শরীরটা আবার আগের মতোই হয়ে গেল। তেমনি পুরনো আমলের পাক্কা অভিজাত পিদ্রু। খানিক আগে যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে আছে।

গঞ্জালেস বলল, 'বেশিক্ষণ শরীরটা ধরে রাখতে পারি না। হাড় মাংস খুলে খুলে মিলিয়ে যায়।'

প্রথম দিকে গঞ্জালেসের গলাটা ঘষা ঘষা শোনাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে এখন সেটা অনেক পরিষ্কার হয়েছে। লোকটা আমার ক্ষতি করতে চায় না, সেটা বুঝতে পারছিলাম। ভয়টা একটু একটু কমতে শুরু করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন কী উপকার করার কথা যেন বলছিলেন?'

গঞ্জালেস সরাসরি প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে বলল, 'তার মানে আমাদের বংশের কথা বলা দরকার। সব শুনলে বুঝতে পারবেন, আপনার কাছে কী চাই—'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

গঞ্জালেস শুরু করে।

তারা পোর্তুগিজদের বংশধর ঠিকই, একসময় গোয়াতেও থাকত কিন্তু এক শ'বছর কি তারও আগে তার ঠাকুরদার বাবা বম্বেতে চলে আসেন। ব্যবসা-ট্যাবসা করে প্রচুর টাকা করেছিলেন।

গঞ্জালেসদের বংশে ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব কম। কয়েক পুরুষ ধরে সবারই একটি করে ছেলে। ঠাকুরদারাই শুধু দুই ভাই। তাঁর ছোট ভাইটি কম বয়সে খারাপ সঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা শাসন করেও তাকে শোধরানো যায় নি। ঠাকুরদার বাবা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেন। সে আর কখনও ফিরে আসে নি।

ঠাকুরদা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। পূর্বপুরুষের ব্যবসা তিনি অনেক বাড়িয়ে ছিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান গঞ্জালেসের বাবা। খুব অল্প বয়সে গঞ্জালেসের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান। তার বছর খানেকের ভেতর মায়েরও মৃত্যু হয়। গঞ্জালেসও তার বাবার একমাত্র ছেলে। ভাইবোন নেই। মা-বাবার মৃত্যুর পর ঠাকুরদাই তাকে মানুষ করেছেন।

'ওই যে বাড়িটা দেখছেন—' বীচের ধার ঘেঁষে পয়সাওলা বড়লোকদের যে পড়ো বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে তার একটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে গঞ্জালেস বলল, 'ওটা আমার ঠাকুরদা তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই সৌখিন মানুষ। ভিড়, হই-হট্টগোল একদম পছন্দ করতেন না। সমুদ্রের ধারে এই নিরালা জায়গাটা ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। আমার লেখাপড়া শেষ হলে তিনি আমাকে আমাদের পারিবারিক বিজনেসে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মেইন সিটিতে ছিল আমাদের অফিস। ঠাকুরদার একটা প্রকাণ্ড ফোর্ড গাড়ি ছিল। সেটায় চড়ে আমরা অফিসে যেতাম। সন্ধেবেলা ওই গাড়িতেই ফিরে আসতাম।'

আমি শুনেই যাচ্ছি। কোনও কথা বলছি না।

হঠাৎ গঞ্জালেসের চোখেমুখে চাপা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে। সে বলল, 'কিছুক্ষণের জন্যে আপনি কিন্তু আবার আমাকে দেখতে পাবেন না।' সঙ্গে সঙ্গে ভরসাও দিল, 'ভয় নেই।'

গঞ্জালেসের শরীরের অংশগুলো খুলে গিয়ে পেঁজা তুলোর মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। মিনিট কয়েক বাদে দেখতে পেলাম, আগের জায়গাতেই সে বসে আছে। একটু হেসে বলল, 'পুরনো চেহারাটা ফিরে পেতে ভীষণ কষ্ট হয়। যাক সে কথা। বাকিটা শুনুন—'

গঞ্জলেস নতুন করে শুরু করল। পৃথিবীতে কেউ অমর নয়। স্বাভাবিক নিয়মেই ঠাকুরদা আর ঠাকুমাও মারা গেলেন। গঞ্জলেস বিয়ে করে নি। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

অফিস আর বাড়ি, এই করেই কাটছিল। কিন্তু যখন তার বয়স তেষট্টি, হঠাৎ নানা কঠিন রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল গঞ্জালেস। অসুস্থ হবার পর বেশিদিন বাঁচেনি। দু-আড়াই মাসের মধ্যে মারা যায়। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে পারিবারিক ব্যবসা উঠে গেছে। ঠাকুরদার তৈরি শখের বিল্ডিংটা ভেঙেচুরে এখন পড়ো বাড়ি হয়ে উঠেছে। চারদিক আগাছায় বোঝাই। সেটা পোকামাকড় বিছে এবং বিষধর সাপের আস্তানা।

আমার সাহসের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। গঞ্জালেসকে মনে করিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'আপনাদের বংশের পুরনো হিস্ট্রি শোনা গেল, কিন্তু আমাকে কী করতে হবে সেটা এখনও বলেন নি।'

গঞ্জালেস বলল, 'এইবার বলছি।' সে যা শোনালো তা এইরকম। একদল পাজি লোকের নজর এসে পড়েছে তাদের ওই বাড়িটার ওপর। ওটা দখল করে, পুরোপুরি ভেঙে ওখানে তারা একটা বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি বানাতে চায়। তাদের মতলব হল, ফ্ল্যাটগুলো বেচে প্রচুর টাকা কামানো। তা ছাড়া, ওই বাড়ির গোপন কুঠুরিতে তাদের বংশের এক হাজার

সোনার টাকা আছে। আছে বাড়ির দলিল। বদমাশ লোকগুলো যা ফন্দি এঁটেছে তাতে বাড়িটা তো যাবেই, সোনার টাকাগুলোরও ওরা খোঁজ পেয়ে যাবে। পারিবারিক সম্পত্তি হাতছাড়া হবে, এটা কোনওভাবেই সে হতে দেবে না।

গঞ্জালেস ব্যাকুলভাবে বলল, 'মিস্টার মল্লিক, দয়া করে আমাদের বাড়িটাড়ি রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন।'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। বলে কি লোকটা? হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে একসময় বললাম, 'চাকরি করতে বম্বেতে এসেছি। কোথায় গিয়ে কাকে ধরলে বজ্জাত লোকগুলোকে টিট করা যাবে, কিছুই জানি না। কীভাবে আমি আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করব?'

'তার একটা উপায় আছে।'

'কী উপায়?'

'আপনাকে বলেছি আমার ঠাকুরদারা দুই ভাই। ছোটভাই বদ সঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ঠাকুরদার বাবা তাকে দূর করে দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?'

'পড়ছে।' আমি ঘাড় কাত করলাম।

গঞ্জালেস বলতে লাগল, 'আমার বখে যাওয়া ছোট ঠাকুরদার নাম অ্যান্টনি গঞ্জালেস। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। তিনি কোথায় থাকতেন, জানতাম না। আমার মৃত্যুর কয়েক দিন আগে খবর পেয়েছি, অনেক কাল আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছিল এক ছেলে আর এক মেয়ে। সম্পর্কে এরা আমার কাকা আর পিসি। তারাও কেউ বেঁচে নেই। এদের ছেলেমেয়েদের হদিস পাই নি। তবে জানতে পেরেছি কাকার এক নাতি এখন থাকে আটাশ নম্বর হিল রোডের একটা চাওলে (বড় ধরনের বস্তি)। হিল রোডটা কোথায় জানেন কি?'

বললাম, 'জানি। বান্দ্রা বলে একটা জায়গায়।'

'হ্যাঁ। আমার ওই কাকার নাতির নাম জোহান গঞ্জালেস। দু'বেলা ভাল করে ওদের খাওয়া জোটে না। খুব খারাপ অবস্থায় আছে। জোহানকে আমার কাছে আপনাকে ধরে আনতে হবে। দয়া করে না বলবেন না।'

গঞ্জালেসের মনোভাব বুঝতে পারছিলাম। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি জোহানকে সোনার টাকা আর বাড়ির দলিল দিতে চান?'

গঞ্জালেস বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনার ঠাকুরদার বাবা তো অ্যান্টনি গঞ্জালেসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলের নাতিকে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই গঞ্জালেস বলে উঠল, 'ছোট ঠাকুরদা অন্যায় করেছিলেন, কিন্তু জোহানের তো কোনও দোষ নেই। তা ছাড়া, কতকগুলো খারাপ লোকের হাতে বাড়িটাড়ি যাওয়ার চাইতে যদি বংশেরই একজন সেগুলো পায়, সেটা কি ভাল নয়?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি নিজেই তো হিল রোডে গিয়ে জোহানকে ডেকে এখানে নিয়ে আসতে পারতেন?'

গঞ্জালেস জানালো, অত দূরে গিয়ে তার নিজস্ব পুরনো চেহারাটা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যাওয়া হয় নি।

খানিক ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তো বললেন, চল্লিশ বছর আগে মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এতগুলো বছরে এই বীচে আমি ছাড়া অন্য কেউ কি আসে নি যাকে দিয়ে জোহানকে খবর দিতে পারেন?'

গঞ্জালেস বলল, 'অনেকেই এসেছে, কিন্তু নিজের চোখে তো আপনি দেখেছেন খুব তাড়াতাড়ি মানুষের চেহারা ফিরে পাই না। ধীরে ধীরে হাত-পা, নাক-মুখ জোড়া লাগে। সেই দৃশ্য দেখামাত্র লোকে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই আর চেষ্টা করি নি। আজ আপনাকে দূর থেকে মনে হয়েছিল, হয়তো অন্যদের মতো ততটা ভীতু আপনি নন। তাই—'

একটু চুপচাপ।

তারপর গঞ্জালেস শুরু করল, 'এই কাজটা করে দিলে আপনারও কিছু লাভ আছে।'

বললাম, 'কী লাভ?'

'পঞ্চাশটা সোনার টাকা আপনাকে দেব। সেগুলো বিক্রি করলে কম করে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন।'

গঞ্জালেস আমাকে লোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু সেটা ছাপিয়ে উঠেছে আমার কৌতূহল। সত্যিই কি বান্দ্রার হিল রোডে গিয়ে ডেরেকের খোঁজ পাব?' বললাম, 'ঠিক আছে, নেক্সট রবিবার আমি হিল রোডে যাব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'যদি জোহানের দেখা পাই, ধরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব। তাকে না পেলে কিন্তু আর এখানে আসব না।'

'নিশ্চয়ই ওকে পাবেন।'

গঞ্জালেসের শরীরটা ধীরে ধীরে আলগা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের রবিবার সকালে বান্দ্রার হিল রোডে গিয়ে জোহান গঞ্জালেসকে খুঁজে বার করলাম। ওরা যে 'চাওল'টায় থাকে সেটা ব্যারাকের মতো বাড়ি। সারি সারি চল্লিশ পঞ্চাশটা খুপরি। মাথায় টালির চাল। চারপাশ ভীষণ নোংরা। লোকজনের চেহারা দেখে মনে হয়, তারা খুব গরিব।

জোহানের বয়স পঞ্চাশ বছর। রোগা, হাড় বার-করা চেহারা। চোখ গর্তে ঢোকানো। ভাঙা গালে চার-পাঁচ দিনের দাড়ি। মাথায় উষ্কখুষ্ক কাঁচাপাকা চুল। পরনে ময়লা তালিমারা ঢলঢলে ফুল প্যান্ট আর ঢলঢলে সস্তা ছিটের শার্ট। তাকে মাইকেল গঞ্জালেসের কথা জানাতে দুই চোখ চক চক করে উঠল। আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'তুমি ঠিক বলছ তো মিস্টার?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই ঠিক। আমার সঙ্গে গেলে নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন। বাড়ি, প্রচুর সোনার টাকা পেয়ে যাবেন। আপনাদের আর কষ্ট থাকবে না। এখনই আমার সঙ্গে যেতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

জোহানকে সঙ্গে করে সাবার্বন ট্রেনে চড়ে শহরতলির সুদূর স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে বীচের সেই পড়ো বাড়িটার সামনে পৌঁছতেই মাইকেল গঞ্জালেস হাত-পা জোড়া লাগিয়ে হাওয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। দেখে জোহানের ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। পড়েই যাচ্ছিল। তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ঘাবড়াবেন না।' তারপর মাইকেল গঞ্জালেসের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম।

মাইকেল খুব খুশি। জোহানকে বলল, 'সম্পর্কে তুমি আমার নেফিউ। তোমাকে দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তুমি না এলে আমাদের বংশের সব সম্পত্তি বেহাত হয়ে যেত।'

গঞ্জালেসের পিছু পিছু জোহান আর আমি পড়ো বাড়িটার ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। সে আমাদের মাটির তলায় একটা চোর কুঠুরিতে নিয়ে গেল। সেখানে এক কোণে একটা স্টিলের বড় বাক্স রয়েছে। সেটা দেখিয়ে জোহানকে বলল, 'এর ভেতর সোনার টাকা আর দলিল আছে। বাক্সটা নিয়ে যাও। মিস্টার মল্লিক আমাদের অনেক উপকার করেছেন। পঞ্চাশটা সোনার টাকা ওঁকে দেবে।'

জোহান বলল, 'নিশ্চয়ই।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'পঞ্চাশটার দরকার নেই। একটা দিলেই হবে। এখানকার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সারা জীবন সেটা আমার কাছে থাকবে।'

মাইকেল গঞ্জালেস আর কিছু বলল না। একটু হাসল শুধু। তারপর ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

বম্বে থেকে বহু বছর আগে আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি। কিন্তু সেই সোনার টাকাটা এখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গোয়েন্দা গল্প

জোড়া গোয়েন্দা

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে দোতলার ড্রইং রুমে বসে রেডিও থেকে হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত টেপ করে নিচ্ছিল বিনু। রবীন্দ্রনাথের গান তার দারুণ প্রিয়। আর সেই গান যদি হেমন্তর গলায় শোনা যায় তো কথাই নেই।

বিনুর ছোট কাকা আমেরিকায় থাকেন। ফি বছর দু'মাসের ছুটিতে কলকাতায় আসেন। কোনো বার বিনুর জন্য আনেন ক্যামেরা, কোনো বার ইলেকট্রনিক ঘড়ি লাগানো ফাউন্টেন পেন, কোনো বার বা দামী জিনসের প্যান্ট আর শার্ট। দেড় মাস আগে এবার যখন এসেছিলেন, বিনুকে চমৎকার একটা টেপ রেকর্ডার দিয়ে গেছেন। ছোট, চৌকো, চ্যাপ্টামতো রেকর্ডারটা ন'ইঞ্চি লম্বা আর দু'ইঞ্চি চাওড়া। অনেকটা বাচ্চাদের টিফিন বক্সের মতো দেখতে। ছোট হলে কি হবে, ভীষণ পাওয়ারফুল। পঁচিশ-তিরিশ ফিট দূরের যে কোনো শব্দ হুবহু ধরে নিতে পারে।

বিনু পড়াশোনায় বেশ ভাল। একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। পড়শোনা আর গান ছাড়াও নানা ব্যাপারে তার প্রচুর উৎসাহ। বিশেষ করে ডিটেকটিভ গল্প পেলে সে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। শার্লক হোমস থেকে আরম্ভ করে ব্যোমকেশ, কিরীটী আর ফেলুদার সমস্ত কীর্তিকলাপ তার মুখস্থ। ইদানীং আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসগুলোও সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে। অবশ্য এই ব্যাপারটায় তার একটি জুড়িদার আছে। সে হল রাজা—বিনুর সঙ্গে এক স্কুলে, এক ক্লাসে এবং এক সেকশানে পড়ে। রাজাও গোয়েন্দা গল্পের একটি পোকা।

ডিটেকটিভ গল্প পড়ে পড়ে দুই বন্ধুর মাথায় ঢুকে গেছে যে তারাও শার্লক হোমস কি হারকুল পয়রোর মতো যে কোনো খুনী কি ডাকাতকে তিন দিনে তুড়ি মেরে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু বড়ই আফসোসের ব্যাপার, এখন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক রবারি বা হত্যা রহস্যের জট ছাড়িয়ে দিতে কেউ তাঁদের কাছে আসেনি। তবে দু'জনেই তক্কে তক্কে আছে, কোনো একটা কেস টেস পেলে লালবাজারকে দেখিয়ে দেবে, গোয়েন্দাগিরি কাকে বলে।

তেমন একটা কেস যে দুম করে আজই হাতে এসে পড়বে আর তাদের গোয়েন্দাগিরির হাতে খড়িটা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

হেমন্তর গানটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ দক্ষিণ দিকের একটা ঘর থেকে মায়ের চেঁচামেচি শোনা যায়। মা এমনিতে খুব ঠাণ্ডা, ভালমানুষ। কোনো দিন গলা চড়িয়ে কথা

বলেন না। কী এমন হয়েছে যে তিনি এত রেগে গেলেন! বিনু হকচকিয়ে যায়, টেপটা বন্ধ করে উঠে পড়ে।

বিনুর ঠাকুরদা অমরনাথ সেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় অফিসার ছিলেন, বছর তিনেক হল রিটায়ার করেছেন, ঠাকুমা নিরুপমা সেন একটা কলেজে ফিজিক্স পড়ান। তার মা-বাবার নাম সুচরিতা আর চারুব্রত। বাবা হাইকোর্টের বড় অ্যাডভোকেট, মা মেয়েদের একটা কলেজে ফিলজফির লেকচারার।

কাজের লোক সবসুদ্ধ তিন জন। সীতা, লক্ষ্মণ আর সহদেব। সীতা আর লক্ষ্মণ বছর পনেরোর বেশি বিনুদের বাড়িতে আছে। সহদেব নতুন, মাস দুই হল কাজে লেগেছে। সহদেব আর লক্ষ্মণ সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে একতলায় বাবার চেম্বারে গিয়ে শোয়। সীতার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে দোতলাতেই, ডাইনিং রুমের একধারে।

টেপ রেকর্ডারটা বসার ঘরে ফেলে রেখে এক দৌড়ে মায়ের ঘরে চলে আসে বিনু। মা সমানে কাঁদছেন আর বলে যাচ্ছেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। এখন আমি কী করি!'

মায়ের চেঁচামেচি শুনে ঠাকুমা ঠাকুরদাও বিনুর মতো মা-বাবার ঘরে ছুটে এসেছেন। ঠাকুমা কলেজ থেকে সাত দিন ছুটি নিয়েছেন। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। আর ঠাকুরদার দু'পায়ে বাতের যন্ত্রণা, তিনি পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোন নাম। মা অবশ্য কলেজে গিয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ, সীতা এবং সহদেবও হাতের কাজ ফেলে চলে এসেছে। তারা অবশ্য ঘরে ঢোকেনি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকুমা, বিনু আর দাদু একসঙ্গে প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

মা একেবারে ভেঙে পড়েন। কাঁপা, জড়ানো গলায় যা বলেন, তা এইরকম। কাল তাঁর এক সহকর্মীর মেয়ের বিয়ে। বিয়েবাড়িতে যাবার জন্য আজ কলেজে যাবার পথে ব্যাঙ্কের লকার থেকে হার আর চুড়ি টুড়ি বার করে নিয়েছিলেন। তারপর কলেজে গিয়ে চারটে ক্লাস নিয়ে খানিকক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছেন। গয়নাগুলো ছিল তাঁর ব্যাগে। ব্যাগটা বিছানায় রেখে তিনি গিয়েছিলেন অ্যাটাচড্ বাথরুমে। ফিরে এসে দেখেন, ব্যাগটা পড়ে আছে কিন্তু গয়নাগুলো নেই।

ঠাকুরদা ভীষণ অস্থির মানুষ। বলেন, 'কেউ নিশ্চয়ই চুরি করেছে। দাঁড়াও, এক্ষুণি পরমেশকে ফোন করছি।' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যান।

পরমেশ বড়াল বিনুদের এলাকার থানার ওসি, তার বাবার দারুণ বন্ধু। বিনু তাঁকে বলে পরমেশকাকু। সে আর রাজা যে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা হবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সে খবরটা রাখেন তিনি। এই নিয়ে একটু আধটু মজাও করেন।

এ বাড়িতে আগে কখনও চুরি হয়নি। চুরিটা করবেই বা কে? সীতা আর লক্ষ্মণ খুবই বিশ্বাসী। তার জন্মের আগে থেকে রয়েছে। সহদেব যদিও নতুন এসেছে কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। কিছু বললে গরুর মতো তাকিয়ে থাকে। বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয়ও না।

দাদু ফোন করে ফিরে আসেন। বলেন, 'পরমেশ এক্ষুণি আসছে। নন্টুকেও ফোন করেছি। ও যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে।' নন্টু বিনুর বাবার ডাক নাম।

চারদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ রাজার কথা মনে পড়ে যায় বিনুর। রাজাকে গয়না চুরির খবরটা দিতে হবে। ফোন তুলে ডায়াল করতে একবারেই রাজাকে পাওয়া যায়। তাকে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে বিনু বলে, 'এই চান্সটা ছাড়া ঠিক হবে না। চোরকে আমাদের ধরতেই হবে। তুই কী বলিস?'

রাজা বলে, 'নিশ্চয়ই।'

বিনু বলে, 'তা হলে সুরমা মাসিকে বলে এক্ষুণি চলে আয় তুই।' সুরমা রাজার মা।

রাজা বলে, 'না রে, আজ যেতে পারব না। মা আজ দাঁত তোলাতে যাবে। মায়ের সঙ্গে ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে।'

একটু ভেবে বিনু বলে, 'তা হলে—তা হলে—কাল শনিবার, আমাদের ছুটি আছে। চলে আসবি, সারাদিন থাকবি। চোর ধরার একটা প্ল্যান করতে হবে।'

'কাল তো তোদের বাড়ি যাবার কথাই আছে। আমি সকালেই যাব।'

বিনুর মনে পড়ে যায়, প্রতি শনিবার রাজা তাদের বাড়ি আসে। বাড়ির পেছন দিকে রেল লাইনের ধারে যে টানা বিরাট বস্তিটা রয়েছে সেখানে গরিব ছেলেদের পড়ানোর জন্য একটা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল বসানো হয়েছে। নানা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা পালা করে সেখানে পড়িয়ে আসে। বিনু আর রাজা শনিবার ক্লাস নিতে যায়।

ঘণ্টাখানেক বাদে পরমেশকাকু জিপে করে দুই কনস্টেবল সুদ্ধু এসে হাজির। প্রথমে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেন, প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালান, তারপর দাদু ঠাকুমা মায়ের সঙ্গে কথা বলে, কাজের লোকেদের জেরা করে, ফিরে যাবার মুখে বিনুকে বলেন, 'কী ব্যাপার শার্লক হোমস সাহেব, বাড়িতে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, মায়ের গয়নাগুলো উদ্ধার করতে তো হবে।'

বিনু বলে, 'তা তো হবেই।'

'চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'সেইরকমই ইচ্ছে।'

পরমেশ চলে যাবার পর খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বিনু। ভাবে কাল সকালে রাজা আসবে। তার সঙ্গে পরামর্শ করে আসল কাজে নামতে নামতে অনেকটা দামী সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তার ভেতর চোর বা চোরের দল এমন কিছু করে বসবে যাতে ইমপর্টান্ট সব ক্লু হাতছাড়া হয়ে যাবার-সম্ভাবনা। তাই খানিকটা কাজ আজই এগিয়ে রাখা ভাল। এখন কী করতে হবে, মনে মনে ঠিক করে নিয়ে সোজা মায়ের ঘরে চলে আসে সে।

মা হাঁটুতে মুখ রেখে বিছানায় বসে আছেন।

বিনু আস্তে আস্তে মায়ের পাশে গিয়ে বসে। খানিকক্ষণ তাঁকে লক্ষ করে। তারপর বলে, 'আচ্ছা মা—'

মা যেমন ছিলেন তেমনি বসে থাকেন। বিনুর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলছিস?'

'একটা জিনিস খুব ভাল করে মনে করতে চেষ্টা কর। ভুল করে গয়নাগুলো অন্য কোথাও রেখে দাও নি তো?'

'কোথায় রাখব?'

'সেটাই তো মনে করতে বলছি।'

'না না, গয়না ব্যাগেই ছিল।'

একটু চিন্তা করে বিনু এবার জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি ওগুলো ব্যাগে রেখেই তুমি বাথরুমে ঢুকেছিলে। যখন বাথরুমে ছিলে, এ ঘরে কেউ এসেছিল?'

মা বলেন, 'কী করে বলব? বাথরুমের দরজা বন্ধ। কেউ এলে কি দেখা যায়?'

'পায়ের শব্দ টব্দ শুনতে পাওনি?'

'বাথরুমে কল খুলে দিয়েছিলাম। কিছুই শোনা যায়নি।'

'ঠিক আছে।'

পরের দিন সকালে রাজা আসতেই দু'জনে কনফারেন্সে বসে গেল। গয়না চুরির ব্যাপারে খুঁটিনাটি সব দিক নিয়ে তারা আলোচনা করল। তারপর বিনু জিজ্ঞেস করে, 'তোর কী মনে হয়?'

রাজাও দেখা গেল তার সঙ্গে একমত, বাইরের কেউ এসে চুরিটা করেনি। সে বলে, 'বাড়ির কাজের লোকেদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

বিনু জানায় লক্ষ্মণ আর সীতা অনেকদিন এ বাড়িতে আছে, ভীষণ বিশ্বাসী, সহদেবটা এক নম্বরের গবেট। এদের দিয়ে আর যাই হোক, চুরিটা হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু রাজা কোনো কথাই শুনল না। সে বলল 'কখন কার মাথায় লোভ চাগিয়ে উঠবে এবং তার ফলে কী করে বসবে, তা বলা যায় না। অনেক ভালমানুষও হাতের কাছে হঠাৎ প্রচুর টাকাপয়সা দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।'

তাই ঠিক হল, তিনটি কাজের লোকের ওপর নজর রাখতে হবে। কনফারেন্সের পর বিনু আর রাজা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে খুব সতর্কভাবে ওদের হাবভাব লক্ষ করতে লাগল। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই বোঝা গেল না।

পাঁচটা বাজলে লুচি তরকারি সন্দেশ খেয়ে বিনু আর রাজা রেল লাইনের ধারের বস্তিতে পড়াতে চলে গেল। সেখানে আড়াই ঘণ্টা পড়াবার পর স্কুল ছুটি হলে রাজা আর বিনু যখন বেরিয়ে আসছে সেই সময় পেছন থেকে তাদের ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসে কার্তিক। বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

এই বস্তির পড়ুয়াদের ভেতর সবচেয়ে চৌকস হল কার্তিক। দারুণ চালাক চতুর, লেখাপড়াতেও বেশ ভাল।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় দেখা গেল, কার্তিকের চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে কার্তিক? ডাকলে কেন?'

চারদিকে বস্তির প্রচুর লোকজন। কার্তিক বিনুদের সঙ্গে করে একটু ফাঁকা মতো জায়গায় নিয়ে যায়। নিচু গলায় বলে, 'বিনুদা, শুনলাম তোমাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে।'

বিনু বলে, 'হ্যাঁ।'

এদিক সেদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে কার্তিক এবার বলে, 'একটা খবর দিচ্ছি, কাউকে বলবে না।'

'না না, তুমি বল।'

'আমাদের এই বস্তিটা আগে ভাল ছিল। এখন অন্য জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে নানারকম খুনী ডাকাত আর বদমাইসেরা এখানে এসে লুকিয়ে আছে।'

এই খবরটা আগেই কার কাছে যেন শুনেছিল বিনু। সে স্থির চোখে কার্তিকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কার্তিক থামেনি, 'মোহন সিং নাম একটা লোক ক'মাস ধরে এখানে আছে। শুনেছি, তিনটে খুন করেছে সে। আর—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সে।

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারায় চুপ করে থাকতে বলে কার্তিক। একটা অদ্ভুত চেহারার ঢ্যাঙা লোক, গাল পর্যন্ত জুলপি, লম্বা মুখ, পরনে চোঙা প্যান্ট আর শার্ট, পায়ে চটি, বিনুদের পাশ দিয়ে বস্তির ভেতর চলে যায়।

কার্তিক বলে, 'জানো বিনুদা রাজাদা, এই লোকটা কাল থেকে আমাদের বস্তিতে ঘোরাঘুরি করছে। মনে হয়, ব্যাটার খারাপ কোনো মতলব রয়েছে।'

রাজা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হুঁ—'

বিনু আসল ব্যাপারটা ভোলেনি। সে কার্তিককে বলে, 'মোহন সিংয়ের কথা কী যেন বলছিলে?'

কার্তিক বলে, 'ও হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে নতুন যে কাজের লোকটা এসেছে, তার নাম যেন কী?'

বিনু বলে, 'সহদেব। কেন বল তো?'

কার্তিক বলে, 'ওই লোকটা মাঝে মাঝে মোহন সিংয়ের কাছে আসে। পাঁচ দশ মিনিটের বেশি থাকে না। ও এলেই মোহন সিং দরজা বন্ধ করে দেয়।'

বিনু আর রাজা চমকে ওঠে। রাজা বলে, 'হাইলি সাসপিসাস।'

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'এর মধ্যে সহদেব এসেছিল?'

কার্তিক জানায়, 'আমি দেখিনি।'

বিনু বলে, 'একটু লক্ষ রেখো। বস্তিতে আবার ওকে দেখলেই আমাকে খবর দেবে।'

'আচ্ছা।'

'আমরা এখন চলি।'

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বিনু বলে, 'কার্তিক যা বলল, এ তো আমি ভাবতেই পারি

না। দেখে তো মনে হয় সহদেবটা রাম ইডিয়ট। মোহন সিংয়ের মতো একটা মার্ডারারের কাছে ওর কী দরকার?'

রাজা বলে, 'সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

বিনু বলে, 'সারাদিনই তো লোকটা বাড়িতে থাকে। রাত্তিরে লক্ষ্মণদার সঙ্গে নিচে বাবার চেম্বারে শুতে নামে। এর মধ্যে বস্তিতে যায় কী করে?'

'আমার কী মনে হয় জানিস?'

'কী?'

'কার্তিককে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, ডেফিনিটলি সহদেব রাত্তিরে যায়। লক্ষ্মণদা ঘুমিয়ে পড়লে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে।'

বিনু আস্তে মাথা নাড়ে, 'দিস ইজ পসিবল।'

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর দুই বন্ধু একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে প্ল্যান করতে থাকে। বিনু রাজার মাকে জানিয়ে দিয়েছে আজকের রাতটা রাজা এখানে থেকে কাল বাড়ি ফিরবে। কার্তিকের কাছে যে খবরটা পাওয়া গেছে তাতে সহদেব যে মায়ের গয়না চুরির সঙ্গে জড়িত, এতে কোনো সন্দেহ নেই বিনুর। রাজারও তা-ই ধারণা। কিন্তু মুখে বললেই তো হবে না যে সহদেব চোর। সাক্ষ্য প্রমাণ চাই। এর জন্য ফাঁদ পাততে হবে।

নানা দিক থেকে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত মাঝরাতে ওরা নিখুঁত একটি পরিকল্পনা ছকে ফেলে। তখনই শক্ত ব্রাউন পেপারের ভেতর কিছু পুরে একটা ছোট্ট প্যাকেট বানিয়ে রেখে দেয়। সব যদি প্ল্যান অনুযায়ী চলে, চোর বাছাধনকে তাদের ফাঁদে পড়তেই হবে। খুব খুশি হয়ে দুই বন্ধু এবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে সেই প্যাকেটটা নিয়ে বিনু আর রাজা সোজা বস্তিতে চলে আসে। কার্তিককে রেল লাইনের ওধারে একটা নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। কেউ যেন টের না পায়।'

কার্তিক বলে, 'কেউ টের পাবে না। তোমরা শুধু বল কী করতে হবে।'

'তার আগে একটা কথা জানতে চাই।'

'কী?'

'মোহন সিং কি সারা দিনরাতই ঘরে থাকে? একবারও বেরোয় না?'

'একবার মোটে বেরোয়। তবে কখন বেরুবে, ঠিক নেই।'

সেই প্যাকেটটা এবার কার্তিকের হাতে দিয়ে বিনু বলে, 'এটা লুকিয়ে যে কোনো ভাবে মোহন সিংয়ের ঘরের ভেতর এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে লোকটা বুঝতে না পারে। পারবে?'

ঠোঁট কামড়ে, কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে নেয় কার্তিক। তারপর বলে, 'পারব।'

'কী করে?'

'আমাদের এখানে সবই ভাঙাচোরা টিনের চালের নিচু নিচু ঘর। মোহন সিংয়ের ঘরটার ওপর দিয়ে জামরুল গাছের মোটা ডাল চলে গেছে। ডালটায় উঠে চালের ফাঁক দিয়ে তোমাদের জিনিসটা ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

'গাছের ডালে উঠলে বস্তির লোকেরা তো দেখে ফেলবে।'

'মোহন সিংয়ের ঘরটা যেদিকে, সেখানে লোকজন খুব একটা যায় না। সন্ধের পর লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক কাজ সেরে ফেলব। তোমরা ভেবো না। আর কী করতে হবে?'

'নজর রাখবে সহদেব কবে, কখন যায়। ও মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর প্যাকেটটা নামিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে। অন্য কাউকে দেবে না। মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে যায়। এর মধ্যে রোজই কার্তিক এসে খবর দিয়ে গেছে, সহদেব আর বস্তিতে যায়নি। বিনু একটু হতাশই হয়।

এদিকে মায়ের গয়না চুরির পর থেকে পরমেশ রোজই একবার করে তাদের বাড়ি আসছেন। মা বাবা দাদু ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলার পর বিনুকে জিজ্ঞেস করেন, 'তারপর শার্লক হোমস সাহেব, হারকুল পয়রো আর তোমার ইনভেস্টিগেশন কিরকম এগুচ্ছে?' রাজাকে তিনি হারকুল পয়রো বলেন।

পরমেশকাকু যেন রোজই একবার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি, তবু বিনু দমে যায় না। বলে, 'আপনারা কতদূর এগুলেন?'

কৌতুকে ভুরু নাচিয়ে পরমেশকাকু বলেন, 'দু-চার দিনের ভেতর সমস্যার সমাধান করে ফেলব।'

একটু চমকে ওঠে বিনু। বলে, 'আমরাও চেষ্টা করছি। মনে হয়, ওই টাইমের মধ্যে আমরাও প্রবলেমটা সলভ্ করতে পারব।'

'বেস্ট অফ লাক। দেখা যাক, কারা আগে পারে।'

চতুর্থ দিন সকালে, সবে-ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে বিনুর, কার্তিক এসে হাজির। আড়ালে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই ব্রাউন পেপারের প্যাকেটখানা ফেরত দিতে দিতে সে বলে, 'কাল রাত্তিরে তোমাদের সহদেব মোহন সিংয়ের কাছে গিয়েছিল।'

কার্তিকের পিঠে একখানা হাত রেখে বিনু বলে, 'তুমি যে কী হেল্প করেছ, বলে বোঝাতে পারব না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এখন বাড়ি যাও, পরে তোমাকে খবর দেব।'

কার্তিক চলে যাবার পর প্যাকেটটা নিয়ে বিনু নিজের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর তার উল্লসিত চিৎকার শোনা যায়, 'হুর-রে-এ—'

এত জোরে বিনু চেঁচিয়েছে যে মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমা দৌড়ে আসেন। বলেন, 'কী হয়েছে রে বিনু?'

বিনু চটপট প্যাকেটটা বইয়ের আলমারিতে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে, 'দারুণ একটা ব্যাপার।' বলে দৌড়ে ড্রইং রুমে গিয়ে প্রথমে রাজাকে ফোন করে বলে, 'কার্তিক সেটা দিয়ে গেছে। আমরা যা ভেবেছিলাম তাই। সব প্রমাণ পেয়ে গেছি। সুরমা মাসিকে বলবি, বিকেলে স্কুল ছুটির পর আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসবি।'

রাজা বলে, 'ওকে। দারুণ থ্রিলিং লাগছে।'

রাজার সঙ্গে কথা বলার পর থানায় পরমেশকে ফোন করে বিনু বলে, 'রহস্যটা কিন্তু আপনাদের আগেই আমরা ভেদ করে ফেলেছি কাকু।'

'কী আশ্চর্য, তোমাকে ফোন করে এই খবরটাই তো দিতে যাচ্ছিলাম।' পরমেশ বলেন, 'আমরাও মিস্ট্রিটা সলভ করে ফেলেছি।'

'কবে?'

'আজই। চোরেদের ধরাটাই যা বাকি।'

'আমরাও তো আজই সলভ্ করেছি।'

'স্ট্রেঞ্জ!' বলে একটু থামেন পরমেশ, তারপর ফের শুরু করেন, 'তোমাদের বাড়িতে আমি বিকেলে যাচ্ছি। তখন দেখা যাবে কারা কিভাবে সমস্যার সমাধান করেছে। মা বাবা দাদু ঠাকুমাকে বলে রেখো, আমার সঙ্গে ছ-সাত জন থাকবে। ভাল চাইনিজ ডিশের ব্যবস্থা করতে বলো।'

'বলব।'

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিনুদের দোতলার ড্রইং রুমে জমজমাট আসর বসে গেল। ভেতরে দাদু ঠাকুমা মা বাবা বিনু রাজা এবং কার্তিক রয়েছে। সীতা সহদেব এবং লক্ষ্মণকেও থাকতে বলা হয়েছিল, তারা একধারে বসে আছে। তাদের ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে। মনে হয়, খুব ভয় পেয়েছে। ঘন ঘন ঘাম মুছছে তারা। আর আছেন পরমেশকাকু। তাঁর সঙ্গে দু'জন আর্মড কনস্টেবল এসেছিল। তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া বাবার দু-তিনজন বন্ধু আর বিনুদের পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক ভদ্রলোকও এসেছেন।

পরমেশ একটা সোফায় বসে ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন, শুনে সুখী হবেন, বৌদি মানে শ্রীমতী সুচরিতা সেনের দামী গয়না কারা চুরি করেছে আমরা জানতে পেরেছি। তাদের আজই অ্যারেস্ট করা হবে। আর গয়নাগুলো উদ্ধারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।' একটু থেমে ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে ফের বলতে থাকেন, 'এই প্রসঙ্গে আরো একটা খবর আপনাদের দিতে চাই। পুলিশের তরফ থেকে আমি আর আমার সহকর্মীরা চুরির কেসটায় তদন্ত চালাচ্ছিলাম। পাশাপাশি, একেবারে আলাদাভাবে আমার দুই তরুণ বন্ধু শ্রীমান বিনু এবং

এবং শ্রীমান রাজাও ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা দাবি করছে, চুরি রহস্যের সমাধান ওরাও করে ফেলেছে। এখন আমি কাউকে না দেখিয়ে গোপনে একটুকরো কাগজে চোরেদের নাম লিখে মেসোমশায় অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেনের হাতে দেবো। শ্রীমান বিনু বা শ্রীমান রাজাও ঠিক একই ভাবে নাম লিখে মেসোমশায়কে দেবে। মেসোমশায় মিলিয়ে দেখবেন, আমরা একই নাম লিখেছি কি না।' বলে একটু দূরে গিয়ে কাগজে কিছু লিখে এনে ভাঁজ করে দাদুর হাতে দেন। বিনুরাও তাই করে।

পরমেশ এবার দাদুকে বলে, 'নামগুলো দেখুন কিন্তু এখন কাউকে বলবেন না। যদি মিলে যায় মাথা নেড়ে জানিয়ে শুধু দেবেন।'

দাদু ভাঁজ-করা কাগজ দুটো খুলে মাথা নাড়েন—মিলেছে।

পরমেশ এগিয়ে গিয়ে বিনু আর রাজাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'কনগ্রাচুলেশনস। কিন্তু কীভাবে ধরলে বল তো?'

বিনু বলে, 'আগে আপনার প্রসেসটা বলুন, তারপর আমাদেরটা শুনবেন।'

পরমেশ বলেন, 'ঠিক হ্যায়।' বলে একজন কনস্টেবলকে হুকুম দেন, 'পান্নালালকে ডেকে আনো।'

একটু পরেই যে লোকটা ড্রইং রুমে এসে ঢোকে তাকে দেখে চমকে ওঠে রাজা আর বিনু। সেই অচেনা ঢ্যাঙা লোকটা, যে কিনা ক'দিন ধরে সন্দেহজনক ভাবে বস্তিতে ঘোরাফেরা করছিল। একে চোর চোট্টা খুনে ডাকাত, কত কী-ই না ভেবেছে বিনুরা।

পরমেশ বলেন, 'এই পান্নালাল হল আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটি রত্ন। বৌদির গয়না চুরি হবার পর একে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। চারদিকে ঘুরে ঘুরে পান্নালাল আসল অপরাধীদের খোঁজ পায়। তারপর তাদের ওপর দিন রাত নজর রাখা হয়। জাল ফেলে রেখেছি, আজই মহাপুরুষদের মাছের মতো টেনে তোলা হবে।' বিনুদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এবার তোমাদের প্রসেসটা বল।'

বিনু আর রাজা কার্তিককে ধরে এনে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিনু সেই ব্রাউন রঙের প্যাকেটটা আগেই নিয়ে এসেছিল। সেটার ভেতর থেকে ছোটকাকার দেওয়া পাওয়ারফুল টেপ রেকর্ডারটা বার করে বলে, 'আমাদের বন্ধু কার্তিকের হেল্প নিয়ে আর সেই টেপটা কাজে লাগিয়ে চোরেদের খোঁজ পাই।' বলে কিভাবে মোহন সিংয়ের ঘরে কার্তিককে দিয়ে টপ রেকর্ডারটা রেখে প্রমাণ যোগাড় করেছে, জানিয়ে দিতে দিতে বোতাম টিপে ওটা চালিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে।

প্রথম জন : 'ঘাবড়াও মাত সহদেব। মোহন সিং তোমাকে সাহারা (আশ্রয়) দিয়েছে। ঠিক যেমন বোকা বুদ্ধু সেজে আছ, ওইরকমই থাকবে। কেউ সন্দেহ করবে না।'

দ্বিতীয় জন : 'মোহন সিংজি, রোজ পুলিশ আসছে। ওদের বাড়ির ছেলে বিনু এই বস্তিতে পড়াতে আসে। যদি টের পায় গয়নাগুলো এখানে তোমার কাছে আছে—'

প্রথম জন : 'আমি কি গরু না বকরী যে ওই চোরাই মাল নিজের কাছে রেখে দেবো। ওগুলো পার্ক সার্কাসে সেলিমের কাছে পাচার করে দিয়েছি। ঘাবড়াও মাত। যে পাড়ায়

আছ সেখানে অনেক পয়সাওলা লোক থাকে। তাদের বাড়ি গিয়ে টাকা, সোনা, জহরতের খবর নেবে ...।'

টেপ থামিয়ে দিয়ে বিনু পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুঝতে পারলেন কাকু?'

পরমেশ প্রচণ্ড তারিফের গলায় বলেন, 'ফাইন ফাইন। একেবারে সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে তদন্ত চালিয়েছ। কোর্টে যখন কেসটা উঠবে ওই টেপটা এভিডেন্স হিসেবে দারুণ কাজে লাগবে। শাবাশ।'

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটে যায়। টেপটা যখন চলছিল সবার চোখ গিয়ে পড়েছিল সহদেবের ওপর। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে দরজা দিয়ে পালাবার জন্য দৌড় লাগায়। কিন্তু কনস্টেবলরা ওত পেতেই ছিল, খপ করে তারা তাকে ধরে ফেলে।

পরমেশ বলেন, 'শয়তানকে হ্যান্ড-কাফ পরিয়ে নিচে ভ্যানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখো। লক্ষ রাখবে, পালাতে যেন না পারে।' সহদেবকে নিয়ে যাবার পর ঘড়ি দেখে বলেন, 'এখন ছ'টা বাজে। এতক্ষণে পার্ক সার্কাসের বস্তিতে সেলিম আর মোহন সিং ধরা পড়ে গেছে। মোহন আজ সকালে ওখানেই গেছে। পালের গোদা দুটোকে এক জায়গায় পাওয়া যাবে, এই খবরটা পেয়ে কাল রাত থেকেই সাদা পোশাকের পুলিশ সেলিমদের বস্তিটাকে ঘিরে রেখেছিল।' বিনুর মাকে বলেন, 'সে যাক। বৌদি, দু'চার দিনের ভেতর আপনার গয়নাগুলো ফেরত পেয়ে যাবেন। এখন বলুন আমাদের চাইনিজ রেডি আছে তো?'

মায়ের মুখে হাসি ফোটে। তিনি বলেন, 'একদম রেডি।'

'এবার আমাদের জোড়া গোয়েন্দার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যাক। থ্রি চিয়ার্স ফর—'

ঘরসুদ্ধ সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'বিনু অ্যান্ড রাজা।'

ছেঁড়া খাবারের বাক্স

এই প্রথম মুম্বাইতে বেড়াতে এসেছে রাহুল। সে কলকাতার একটা নাম করা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সব দিক থেকে চৌকস। স্ট্যান্ড না করলেও লেখাপড়ায় বেশ ভাল। পরীক্ষায় এইট্টি পারসেন্টের মতো মার্কস পায়। দারুণ ক্যারাটে লড়ে। আন্ডার-সিক্সটিন গ্রুপে তাকে বাদ দিয়ে বেঙ্গলের ক্রিকেট টিমের কথা ভাবাই যায় না। এ ছাড়া রাহুলের একটা বড় হবি হল ডিটেকটিভ বই পড়া। গোয়েন্দা গল্পের সে পোকা। এক-এক সময় ভাবে, শার্লক হোমস হতে পারলে কেমন হয়।

গত জুলাইতে পনেরোয় পা দিয়েছে রাহুল। এর মধ্যেই হাইট পাঁচ ফিট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। লম্বাটে মুখ, চওড়া কপাল, গায়ের রং বাদামি, চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ। সব মিলিয়ে ঝকঝকে চেহারা।

রাহুলের ছোট মেসো অরুণেশ দত্তচৌধুরি একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। এতদিন কলকাতায় ছিলেন। বছর তিনেক হল প্রোমোশন পেয়ে মুম্বাইতে এসেছেন। মাসির নাম পারমিতা। তাঁদের একমাত্র ছেলে অয়ন রাহুলের থেকে এক বছরের ছোট। ওরা থাকে প্রপার মুম্বাই থেকে কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার দূরে—বান্দ্রার হিল রোডে। একটা প্রকাণ্ড হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের তেরো তলায়। কোম্পানি থেকে তাদের পনেরো শ' স্কোয়ার ফিটের মস্ত একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে।

বান্দ্রা শহরতলি হলেও মূল শহরের সঙ্গে এতটুকু তফাত নেই। সেখানকার মতোই চারদিকে বিশাল বিশাল হাই-রাইজ, কংক্রিটে বাঁধানো ঝাঁ-চকচকে রাস্তা, অফিস, ব্যাঙ্ক, চোখধাঁধানো এয়ার-কনডিশনড মার্কেট, সিনেমা হল, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ইত্যাদি।

ছোট মাসি, ছোট মেসো আর অয়ন মুম্বাইতে আসার পর থেকে রাহুলকে বেড়িয়ে যাবার জন্য অনবরত ফোন করে যাচ্ছিল। শুধু তাকেই না, তার বাবা মা এবং দিদিকেও। রাহুলের বাবা কলকাতার একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, মা স্টেট গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর। দিদি লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে পড়ে। ইংরেজিতে অনার্স। নানা কারণে সবার একসঙ্গে মুম্বাইতে আসা সম্ভব হচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, এ-বছর রাহুল একাই আসবে। ক'দিন আগে মা বাবা আর দিদি ওকে হাওড়া থেকে মুম্বাই মেলে তুলে দিয়েছিল। ছোট মেসোরা দাদার স্টেশন থেকে তাকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। দাদার থেকে বান্দ্রা খুব দূরে নয়।

সেপ্টেম্বর মাস শেষ হয়ে এসেছে। এবার পুজো অক্টোবরের গোড়ায়। রাহুলদের স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। পুরো ছুটিটা অয়নদের কাছে কাটাবে সে। দশমীর পর ছোট মেসোরা তাকে অজন্তা ইলোরা পুনে মহাবালেশ্বর আর গোয়ায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। ভাইফোঁটার আগে আগে কলকাতায় ফিরে যাবে সে।

মাসতুতো ভাই অয়নের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে রাহুলের দারুণ ভাব। কলকাতায় একই পাড়ায়, খুব কাছাকাছি ওরা থাকত। রাহুলরা ল্যান্সডাউন রোডে আর অয়নরা লেক প্লেসে। দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। এতদিন বাদে রাহুলকে পেয়ে অয়ন দারুণ খুশি।

মুম্বাইতে পুজোর ছুটি খুব কম। এখনও অয়নদের ছুটি পড়েনি। স্কুলে কয়েক ঘন্টা কোনও রকমে কাটিয়ে বাকি সময়টা অয়ন রাহুলের গায়ে লেপটে থাকে। যতদিন না ছোট মেসো গোয়া-টোয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন, রাহুলকে মুম্বাই শহরটা দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছে সে।

তিন দিন হল রাহুল মুম্বাইতে এসেছে। পাকা গাইডের মতো এ ক'দিন তাকে শহরের নানা জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে রাহুল। মালাবার হিলস, হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, জুহু বীচ, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, এসেল ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি। পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ-ছোঁয়া বিরাট বিরাট বাড়ি, অগুনতি ফ্লাইওভার, সব মিলিয়ে মুম্বাই সত্যিই ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান সিটি।

আজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে কিছু খেয়েই রাহুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অয়ন। বলল, 'আজ তোমাকে ব্যান্ড স্ট্যান্ডে নিয়ে যাব।'

রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কোথায়?'

'কাছেই।'

হিল রোডে যেখানে অয়নরা থাকে, সেই রাস্তাটা পশ্চিম দিকে সোজা সমুদ্রের গায়ে গিয়ে যেখানে থেমেছে সেটাই ব্যান্ড স্ট্যান্ড। মসৃণ, চওড়া রাস্তার একধারে পাহাড়ের ঢালে উঁচু উঁচু বাড়ি। একেবারে চূড়ায় বিখ্যাত মাউন্ট মেরি চার্চ। নিচের রাস্তায় মানুষের ভিড়, গাড়ির স্রোত। লাইন দিয়ে রেস্তোরাঁ, বড় হোটেল, ফাস্ট ফুডের দোকান, আইসক্রিম, ভেলপুরি, বাটাটা পুরির দোকান। আর কত যে নারকেল গাছ তার সীমাসংখ্যা নেই।

রাস্তার একদিকে পাহাড়। অন্যদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে উঁচু উঁচু পাথরের চাঁই। তারপর যতদূর চোখ যায়—আরবসাগর। এমনিতে বর্ষা ঋতু বাদ দিলে বছরের বাকি সময়টা এই সমুদ্র শান্ত থাকে। আজ কী হয়েছে কে জানে। বিপুল জলরাশি উত্তাল হয়ে উঠেছে। বিরাট বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরের চাঁইগুলোর ওপর।

হিল রোড থেকে যে-রাস্তাটা সমুদ্রের কাছে এসে পড়েছে সেটার বাঁ-দিকে ব্যান্ড স্ট্যান্ড। সেই রাস্তাই ডান ধারে সমুদ্রে গা ঘেঁষে ঘেঁষে অনেক দূর চলে গেছে। রাহুল সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওপাশে কী আছে?'

অয়ন জানাল, ব্যান্ড স্ট্যান্ডের মতো ওদিকটা তেমন জমজমাট নয়। বেশ কিছু বাড়ি-টাড়ি অবশ্য আছে, তবে লোকজন কম। বাড়িগুলোর পর জেলেপট্টি। সারাদিন সমুদ্রে মাছ ধরার পর ঝাঁকে ঝাঁকে ট্রলার সন্ধের আগে আগে ফিরে আসে।

অয়ন বলল, 'কত যে মাছ রোজ দিন ধরা পড়ে, তুমি ইমাজিন করতে পারবে না। রোজই দু-চারটে হাঙরও জেলেরা ধরে আনে। এখনই ট্রলারগুলো ফিরে আসবে। যাবে নাকি রাহুলদা?'

মাছ ধরা দেখতে ভীষণ ভাল লাগে রাহুলের। তবে আজ সেই সম্ভাবনা নেই। কেননা ট্রলারগুলো অনেক আগেই মাঝ সমুদ্রে চলে গিয়েছিল। এখন তাদের ফেরার পালা। ধরা না যাক, মাছ তো দেখা যাবে।

রাহুল উৎসাহের সুরে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব—'

ব্যান্ড স্ট্যান্ড পেছনে ফেলে দু'জনে সমুদ্রের ধার উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করে।

এই অঞ্চলটা সত্যিই নির্জন। ব্যান্ড স্ট্যান্ডের মতো জমজমাট নয় ভিড়ও নেই। বাঁ পাশে টিলার পর টিলা। অনেক নতুন বাড়ি উঠলেও পুরনো বাংলো ধরনের বাড়িই বেশি। সেগুলোর বয়স পঞ্চাশ ষাট কি সত্তর বছর। মনে হল, কয়েকটায় লোক থাকে না।

মুম্বাইতে কলকাতার তুলনায় সূর্যোদয় হয় অনেক দেরিতে। সূর্যাস্তও সেই একই নিয়মে। অর্থাৎ সাতটার আগে এখানে সন্ধে নামে না।

এখন ছ'টার মতো বাজে। বহুদূরে, সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সূর্যটা সেখানে স্থির হয়ে আছে। সেটা এখন রক্তবর্ণ। সমুদ্রের রংও টকটকে লাল। সূর্য যেন আবির ঢেলে দিয়েছে।

গল্প করতে করতে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ অনেকগুলো কুকুরের কানফাটানো তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে ডান পাশে তাকাল। বিশাল কমপাউন্ডের ভেতর আদ্যিকালের পুরনো তেতলা একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় কঙ্কালসার। বাইরে থেকে যেটুকু চোখে পড়ে তা হল, বেশির ভাগ ঘরেরই দরজা জানালা নেই, দেওয়ালের পলেস্তারা আর ছাদের কার্নিস ভেঙে পড়েছে। সারা গায়ে পুরু শ্যাওলা। দেওয়াল ভেদ করে বট-অশ্বত্থ এবং নানা ধরনের আগাছা জাঁকিয়ে বসেছে।

গোটা বাড়িটা পাথরের উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই দেওয়ালের মাথা নানা জায়গায় ভেঙে গেছে। রাস্তার দিকে লোহার পাল্লা-বসানো মস্ত গেট। গেটে পাঁচ-ছ'টা প্রকাণ্ড তালা। সেগুলো জং-ধরা। গেটের জরাজীর্ণ পাল্লা ফুটো ফুটো। কয়েক জায়গায় বড় ক'টা ফোকর। গেটের গায়ে কমপাউন্ড ওয়ালে আধভাঙা পাথরের ফলকে লেখা : হ্যাপি ভিলা। রুসি কনট্রাক্টর। এম এ, বি এল। ১৮৯৫।

বাড়িটার বয়স একশ' বছরেরও বেশি। রুসি কনট্রাক্টর নামে কোনও এক বড়লোক পার্শি শখ করে বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন। কবে ফেলে রেখে চলে গেছেন, কে জানে। এতদিনে নিশ্চয়ই মারা গেছেন। তাঁর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি হয়তো কেউ নেই। থাকলেও ওই বাড়ি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

কুকুরের চেঁচামেচি গেটের ওধার থেকে ভেসে আসছিল। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। হয়তো রাস্তার কুকুরেরা বেওয়ারিশ বাড়ি পেয়ে ভেতরে ঢুকে নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়েছে।

রাহুল আর অয়ন হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, গেটের ফোকর গলে একটা বাদামি রংয়ের কুকুর বেরিয়ে আসছে। সেটার মুখে পিচবোর্ডের আধ-ছেঁড়া

বাহারি বাক্স। ভাল হোটেল বা বড় রেস্তোরাঁ থেকে যে-ধরনের বাক্সে লাঞ্চ বা ডিনার প্যাক করে দেয় ঠিক সেইরকম।

বাদামি কুকুরটার পেছন পেছন আরও তিনটে কুকুর অবিকল একই ধরনের বাক্স কামড়ে ধরে বেরিয়ে এল। আর তাদের তাড়া করে এল পুরো একটা দঙ্গল। যাদের মুখে খাবারের প্যাকেট ছিল বাহিনীটা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল হুলস্থুল কাণ্ড। যে-যুদ্ধটা বাড়ির ভেতর চলছিল সেটাই এখন তুমুল হয়ে উঠেছে। খেয়োখেয়ি, কামড়াকামড়ির শেষ নেই।

রাহুল লক্ষ করল, বাক্সগুলোর ভেতর কিছু কিছু খাবার রয়ে গেছে। চারটে বাক্স দেখে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত চারটে লোকের খাবার ছিল ওগুলোতে। তারা পুরোটা খেতে পারেনি; বাকিটা বাক্সসুদ্ধ ফেলে দিয়েছে।

বিদ্যুৎচমকের মতো রাহুলের মাথায় কী যেন খেলে যায়। তার মস্তিষ্কে কোনও এক গোপন কুঠুরিতে শার্লক হোমস ঘুমিয়ে ছিল। আচমকা জেগে উঠে তার কানে ফিস ফিস করে যেন বলল, ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।

রাহুল জিজ্ঞেস করে, 'এদিকে আর কখনও এসেছিস?'

অয়ন বলল, 'অনেক বার।'

'এই 'হ্যাপি ভিলা'য় কোনও লোকজন দেখেছিস?'

'নো। নেভার। লোকে বলে এটা হন্টেড হাউস। ভূতের বাড়ি। শুনেছি পঞ্চাশ-ষাট বছরের ভেতর এ-বাড়িতে নাকি কেউ থাকেনি। ফাঁকা পড়ে আছে।'

'তাই যদি হবে, একটা কথার উত্তর দে—'

'কী?'

'ওই কুকুরগুলো কী নিয়ে ঝগড়া করছে?'

'কী আবার! খাবারের বাক্স।'

'বাক্সগুলো ওরা ভেতর থেকে নিয়ে এসেছে। রাইট?'

'রাইট।'

'চারটে বাক্স যখন, চারজন লোক খেয়ে ওগুলো ফেলে দিয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই এ-বাড়িতে থাকে।'

অয়নের চোখেমুখে উত্তেজনা খেলে যায়। সে বলে, 'তাই তো। না থাকলে খাবারের বাক্সগুলো কুকুরেরা বাড়ির ভেতর থেকে টেনে আনত না।'

রাহুল বলল, 'আমার কী মনে হয় জানিস?'

'কী?'

'যারা এরকম ভুতুড়ে বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে তারা লোক ভাল নয়।'

অয়ন তার মাসতুতো দাদাটিকে খুব ভাল করেই জানে। টের পাচ্ছে, ছেঁড়া খাবারের বাক্সগুলো রাহুলের মাথায় ভর করেছে। তার কপাল কুঁচকে গেছে। অনবরত নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, ভেতরে ভেতরে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করছে।

অয়ন জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ রাহুলদা?'

রাহুল বলল, 'ব্যাপারটা জানতে হবে। লোকগুলো কারা, খোঁজ নেওয়া দরকার।'

'তুমি কি ধরেই নিয়েছ, ওই বাড়িটায় লোক আছে?'

'এই মোমেন্ট আছে কি না, বলতে পারব না। তবে থাকে। অনেকদিন নয়, অল্প কিছুদিন ধরে আছে।'

'অল্প দিন আছে, কী করে বুঝলে?'

'বেশিদিন থাকলে হোটেল থেকে খাবার কিনে এনে খেত না। নিজেরা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করত।'

একটু চুপচাপ।

অয়ন এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি বললে, লোকগুলোর খোঁজ নেবে। তা হলে তো বাড়ির ভেতর ঢুকতে হয়।'

রাহুল বলল, 'তা তো ঢুকতেই হবে।'

অয়ন ভীতু নয়। 'হ্যাপি ভিলা'য় সত্যিই যদি কিছু লোক আস্তানা গেড়ে থাকে আর তারা যদি খারাপ হয়, সে এবং রাহুল ভেতরে ঢুকলে নিশ্চয়ই খুশি হবে না। অকারণে বিপদ ডেকে আনার মানে হয় না। কিন্তু এসব বলতে গেলে কানেই তুলবে না রাহুল। তার এই দাদাটি ভীষণ একগুঁয়ে। একবার কিছু একটা মাথায় চাপলে, শেষ না দেখে ছাড়ে না।

রাস্তা থেকে উঁচু বাউন্ডারি ওয়ালের যতটা দেখা যায়, ভাল করে লক্ষ করল রাহুল। এতকালের দেওয়াল, কিন্তু মাথার দিকে সামান্য একটু-আধটু ভাঙলেও প্রায় অটুটই আছে। বেশ উঁচুও। মই ছাড়া পার হওয়া মুশকিল। লোহার গেটটাও খুঁটিয়ে দেখল। পাল্লায় যে-সব ফোকর রয়েছে সেগুলো দিয়ে কুকুর-বেড়াল যাতায়াত করতে পারে। মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আয়ন বলল, 'কীভাবে ঢুকবে? পাঁচিল পেরিয়ে?'

রাহুল হাসল, 'না রে। রাস্তায় কম হলেও কিছু লোক আছে। দেখে ফেললে জেরা করে করে জিভ বার করে ফেলবে। পুলিশও ডাকতে পারে।'

'তা হলে?'

'আমার ধারণা এ-বাড়িতে ঢোকার অন্য রাস্তা আছে। যে-লোকগুলো এখানে থাকে, সেই পথেই তারা যাওয়া-আসা করে। চল, চারদিক ঘুরে দেখি।'

প্রায় এক বিঘের মতো চৌকো জায়গা ঘিরে পাঁচিল। পাঁচিলের বাইরের দিক দিয়ে খুব সতর্কভাবে চারপাশ লক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলল রাহুল। তার পেছনে অয়ন। নানা রকম আগাছা আর ঝোপঝাড়ে বোঝাই জায়গাটা। সে-সব ঠেলে ঠেলে চলতে হচ্ছে। নাঃ, শুধু নিরেট দেওয়ালই। কোথাও ফাঁক-ফোকর নেই।

দু'টো দিক দেখার পর বাড়ির পেছনে আসতেই রাহুলের চোখ উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে। এখানে দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা পাওয়া গেল। ধারে কাছে অন্য কোনও বাড়ি নেই। অনেকটা দূরে উঁচু টিলার মাথায় পেল্লায় একটা হাই-রাইজ। সেখানে যাবার অন্য

রাস্তা রয়েছে। জায়গাটা নির্জন। বড় বড় ঝাঁকড়া গাছপালায় বোঝাই। এদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে কারও চোখে পড়ার ভয় নেই।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কী ভেবে একটু ঠেলা দিল রাহুল। জং-ধরা কবজায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে সেটা খুলে গেল। তার মানে ভেতর দিকে খিল বা ছিটকিনি আটকানো নেই।

খোলা পাল্লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভেতরটা দেখতে লাগল রাহুল আর অয়ন। মূল বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। দরজার পর থেকে বুক-সমান উঁচু বুনো ঘাসের ঘন জঙ্গল। তা ছাড়া রয়েছে ডালপালাওলা বড় বড় ক'টা গাছ। ঘাসের বন খানিকটা সাফ করে বাড়ি পর্যন্ত সরু পথ বানানো হয়েছে।

খুব চাপা গলায় রাহুল বলল, 'লোকগুলো এখান দিয়েই যাতায়াত করে।' বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল অয়নের। বলল, 'এখন কী করবে?'

রাহুল মজার গলায় বলল, 'এতদূর এসেছি। লোকগুলোর চেহারা না দেখতে পেলে ভীষণ খারাপ লাগবে। আয় আমার সঙ্গে। ওই পথটা দিয়ে যাব না। ওরা যদি ভেতরে থাকে, দেখে ফেলবে।'

দরজা পেরিয়ে অয়নকে নিয়ে ঘাসবনে ঢুকে পড়ল রাহুল। কয়েক পা এগুতেই বাইরে থেকে মানুষের গলা ভেসে এল। কথা বলতে বলতে কারা দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

রাহুল অয়নের কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। নিজেও তার পাশে বসে পড়ল।

ঘাসবনের ভেতর ডুবে আছে তারা। নিশ্বাস বন্ধ করে।

লম্বা লম্বা ঘাঁসের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, চারটে লোক কথা বলতে বলতে দরজা দিয়ে ভেতরে সরু পথটা ধরে মূল বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তিনজন বেশ লম্বা, ছ'ফিটের কাছাকাছি হাইট। অন্য লোকটা তুলনায় কিছুটা খাটো। পাঁচ ফিট চার কি পাঁচ। সবারই নিরেট স্বাস্থ্য। চওড়া কাঁধ, শক্ত চোয়াল। মুখেচোখে কেমন একটা নিষ্ঠুরতা যেন ফুটে আছে। একজনের চুল দাড়ি গোঁফ কিছুই নেই, সব পরিষ্কার করে কামানো। দু'জনের কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফ নেই। চার নম্বর লোকটার চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। গালে দু-তিন দিনের না-কামানো দাড়ি। তিনজনের পরনে জিনসের ফুল প্যান্ট আর হাতাগুটানো শার্ট। বাকি লোকটা পরেছে চাপা, রঙিন পাজামা আর লম্বা ঝুলের পাঠান কুর্তা। চারজনের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, পৃথিবীতে এমন কোনও কুকাজ নেই যা ওরা পারে না।

ওদের টুকরো টুকরো দু'একটা কথা শুনতে পাচ্ছিল রাহুলরা। জুয়েলার— হোঁশিয়ারিসে—দোপহর দো বাজে—। জুয়েলারটা ছাড়া বাকি সবই হিন্দি। সব মিলিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না।

লোকগুলো একসময় বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না।

জোরে শ্বাস টেনে অয়ন বলল, 'আমাদের লাক ভাল। বুনো ঘাসগুলো ছিল। তাই লুকোতে পেরেছি। ওরা দেখে ফেললে কী যে হতো, ভাবতে পারছি না।'

মজার গলায় রাহুল বলল, 'কী আর হতো, ওরা আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে কোলে বসিয়ে গুলাবজামুন খাওয়াত।'

মজা-টজা এই মুহূর্তে ভাল লাগছিল না অয়নের। সে বলল, 'গুলাবজামুন খাওয়াত! লোকগুলোর যা মার্ডারারের মতো চেহারা। এতক্ষণে আমাদের ডেডবডি এখানে পড়ে থাকত। এখন কী করতে চাও? ফিরে যাবে?'

হোঁশিয়ারিসে, দোপহর—মাথার ভেতর এই শব্দগুলো পাক খাচ্ছিল রাহুলের। সে বলল, উঁহু। লোকগুলো কিছু একটা মতলব আঁটছে। সেটা না জেনে আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না। এক কাজ কর, তুই বাড়ি চলে যা।'

'তোমাকে একা ফেলে চলে যাব! এত কাওয়ার্ড আমি নই।'

'গুড।'

'ঘাসবনের ভেতর কতক্ষণ বসে থাকব?'

রাহুল বলল, 'বাড়িটার ওপর নজর রাখ। আমিও রাখছি। লোকগুলোকে দেখা গেলে আমাকে বলবি।'

অয়ন বলল, 'দেখতে পেলে কী করবে?'

'ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট। যা বলছি তাই কর। একদম বকবক করবি না।'

মিনিট পাঁচেক বাদে লোকগুলোকে দেখা গেল। রাহুলরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে কোনাকুনি, মূল বাড়িটার দোতলায় একটা ঘরে এদিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে তারা। ঘরটার জানালাগুলোর পাল্লা ভাঙা। মোটা মোটা লোহার গরাদগুলো অবশ্য এখনও অটুট।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে অয়ন কী বলতে যাচ্ছিল, তার মুখটা চকিতে চেপে ধরে রাহুল বলল, 'চুপ! একটুও শব্দ করবি না।'

কিছুক্ষণ লোকগুলোকে লক্ষ করল রাহুল। কী একটা আলোচনায় ওরা মশগুল হয়ে আছে। একবারও এদিকে মুখ ফেরাচ্ছে না। এ-বাড়িতে তারা ছাড়া অন্য কেউ যে নেই, সে ব্যাপারে লোকগুলো খুব সম্ভব একশ' ভাগ নিশ্চিত।

ওদের দিক থেকে নজর সরিয়ে এধারে-ওধারে তাকাতে লাগল রাহুল। কিছু একটা ফন্দি যে ওরা আঁটছে, সে-ব্যাপারে তার মনে কোনও সংশয় নেই। আর সেটা তাকে জানতেই হবে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ওই ঘরটার পাশ দিয়ে উঠে গেছে। পুরনো আমলের বাড়িতে সুইপারদের জন্য এই ধরনের সিঁড়ি কলকাতাতেও দেখা যায়।

রাহুল আন্দাজ করে নিল, ওই সিঁড়ি দিয়ে দোতলা পর্যন্ত উঠলে ঘরের ভেতরের লোকগুলোকে দেখা যাবে, কিন্তু ওরা জানালার কাছে না এলে তাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। কোনও কারণে যদি লোকগুলো টের পায়, নির্ঘাত তাদের তাড়া করবে। ঘোরনো সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামা মুশকিল। ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

রাহুলের নজর চরকির মতো চারদিকে ঘুরছিল। এবার সে দেখতে পেল, কমপাউন্ড ওয়ালের বাইরের একটা মস্ত গাছের মোটা ডাল লোকগুলো যে ঘরটায় বসে আছে, তার কাছাকাছি চলে গেছে। প্রচুর বড় বড় পাতা গাছটায়। গাছে উঠে ডাল বেয়ে বেয়ে ঘর পর্যন্ত যেতে পারলে ঘন পাতার আড়ালে থেকে ওদের কথাবার্তাও শোনা যাবে, কী করছে

তাও দেখা যাবে। গাছের ডালে বসে কেউ তাদের গতিবিধি লক্ষ করছে, লোকগুলো বুঝতেও পারবে না।

রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'তুই গাছে চড়তে পারিস?'

এরকম একটা প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল অয়ন, 'গাছে চড়তে যাব কেন?'

কারণটা বুঝিয়ে দিল রাহুল।

মুখটা করুণ করে অয়ন বলল, 'না রাহুলদা—'

'তা হলে তুই সমুদ্রের ধারের রাস্তায় গিয়ে ওয়েট কর। আমি ওদের ব্যাপারটা জেনে পনেরো-কুড়ি মিনিটের ভেতর চলে আসছি।'

অয়ন কিছুতেই রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দু'জনেই খুব সাবধানে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওপরে উঠবে। জুতো পরে গেলে শব্দ হতে পারে, তাই খালি পায়েই সিঁড়ি বাইবে।

সরু পথটার ওধারেও ঘাসবন। রাহুল আর অয়ন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওপাশের ঘাসবনে ঢুকে পড়ল। তারপর জুতো খুলে নিঃশব্দে সিঁড়িতে গিয়ে উঠল। সামনে রাহুল, পেছনে অয়ন।

দোতলা বরাবর পৌঁছুতেই দেখা গেল, চারটে ফোল্ডিং চেয়ারে লোক চারটে বসে আছে। তাদের সামনে একটা মাঝারি ফোল্ডিং টেবল। টেবলের ওপর বড় কাগজের শিটে কী সব আঁকা আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হল, লম্বা একটা রাস্তা, এবং সেটার দু'পাশে অনেকগুলো বড়িঘরের স্কেচ। পাঠান কুর্তা পরা লোকটা আঙুল দিয়ে স্কেচের একটা জায়গা দেখিয়ে হিন্দি উর্দু ইংরেজি মিশিয়ে বলল, 'এহী হ্যায় জুয়েলারি শপ। ভেরি বিগ শপ। স্যাটারডে, দো বাজে। অপারেশনকা প্ল্যান রাতকো কর লেঙ্গে—'

অন্যেরা মাথ নেড়ে সায় দিল, 'ঠিক হ্যায়—'

যে-লোকটার চুল-দাড়িটাড়ি পরিষ্কার কামানো সে একটা সুটকেস তুলে স্কেচের কাগজটার পাশে রাখল। সেটা খুলে প্রচুর নকল চুল দাড়ি গোঁফ বার করে বলল, 'আচ্ছাসে দেখ লে—'

তিনজন চুল-দাড়ি দেখতে লাগল। রাহুল লক্ষ করল, যাত্রাদলে বা থিয়েটারে যেমন পরচুল-টুল লাগে হুবহু সেই রকম। সে ভীষণ অবাক হচ্ছিল। নকল চুল-দাড়ি দিয়ে এরা কী করবে, বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যটা ভাল নয়।

লোক তিনটে তারিফের সুরে বলল, 'বহুত আচ্ছা—'

'কাম চলেগা?'

'জরুর।'

ফের সুটকেসে পুরে পাঠানকুর্তাওলা উঠে পড়ল। বলল, 'চল। পিস্তল রাইফেলগুলো আরেক বার চেক করে নিই।'

অন্য লোকগুলোও উঠে দাঁড়ায়। তারপর চারজন একসঙ্গে ভেতর দিকের কোনও ঘরে চলে যায়। তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে।

অয়ন জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে রাহুলদা?'

রাহুল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একটু চমকে উঠে বলল, 'এখানে আর কিছু করার নেই।' সিঁড়ির নিচে এসে জুতো পায়ে দিয়ে ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে পেছন দিকের সেই দরজা পেরিয়ে সমুদ্রের দিকের রাস্তায় চলে এল ওরা।

সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু এখনও আবছা একটু আলো সমুদ্রে, চারদিকের নারকেল বনে এবং এধারের বাড়িঘরের গায়ে আলগাভাবে লেগে আছে। অবশ্য কখন রাস্তায় বা বিল্ডিংগুলোতে আলো জ্বেলে উঠেছিল, রাহুলদের খেয়াল নেই।

অয়ন বলল, 'সন্ধে হয়ে গেছে। আজ আর জেলেপাড়ায় যাব না রাহুলদা। কাল ক্লাসে ম্যাথসের টেস্ট। বাড়ি গিয়েই বই টই নিয়ে বসতে হবে।'

রাহুল বলল, 'ঠিক আছে। বাড়িই চল।'

হিল রোডের শেষ মাথায় অয়নদের বাড়ি। এখান থেকে অনেকটা দূর। মিনিট তিনেক হাঁটার পর একটা ফাঁকা অটো পেয়ে ওরা উঠে পড়ল।

রাহুলের মাথায় সেই চিন্তাটা অবিরল পাক খাচ্ছিল। ওই বদমাশ লোক চারটের মতলব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এক শনিবার কোনও একটা বড় জুয়েলারি শপে তারা হানা দেবে। সঙ্গে থাকবে উদ্যত রাইফেল এবং পিস্তল। কেউ বাধা দিলে তাকে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু মুম্বাই শহরে কয়েক শ' জুয়েলারি শপ আছে। কোন শপে, কোন শনিবার ওই দলটা লুটপাট চালাবে, সেটা ওদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়নি।

পরদিন শুক্রবার। রাহুলের ইচ্ছা ছিল, 'হ্যাপি ভিলা'য় অরেক বার যায়। মুম্বাই শহরের কোন কোন দোকানে ওরা হানা দেবে, সেটা যদি জানতে পারা যায়।

কিন্তু প্রতি শুক্রবার বিকেলে অয়নের প্রাইভেট টিউটর আসেন। তিনি ওকে ইংরেজি পড়ান। সে স্কুল থেকে ফিরে আসার মিনিট পনেরো পর তিনি এসে গেলেন।

সমুদ্রের ধারে সেই পুরনো বাড়িটায় রাহুল একাই চলে যেতে পারে। কোনও অটোওলাকে বললেই সে তাকে 'হ্যাপি ভিলা'র সামনে পৌঁছে দেবে। কিন্তু অয়নকে ফেলে যদি যায়, সে ভীষণ রেগে যাবে।

অয়নের টিউটর পড়ানো শেষ করে যখন গেলেন তখন পৌনে আটটা। আর 'হ্যাপি ভিলা'য় যাবার প্রশ্নই নেই। রাত্তিরে ছোট মাসিরা তাদের বেরোতে দেবেন না।

পরের দিন শনিবার।

শনি-রবি দু'দিন অয়নের স্কুলে ছুটি। ছোট মেসোর অফিসেও তা-ই।

রাহুল ভেবেছিল, আজ সকালে অয়নকে নিয়ে সে 'হ্যাপি ভিলা'য় ঘুরে আসবে। কিন্তু তাও সম্ভব হল না। ছোট মেসোর এক বন্ধু ভারসোভায় থাকেন। বান্দ্রা থেকে জায়গাটা পঁচিশ-ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে।

বন্ধুটি মারাঠি। নাম অরবিন্দ চাপেকার। তিনি অনেকদিন আগে ছোট মেসোদের নেমন্তন্ন করে রেখেছিলেন। আজ সেখানে যেতে হবে। সারাদিন চাপেকারদের সঙ্গে হই হই করে কাটিয়ে একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ছোট মেসোরা বাড়ি ফিরবেন।

ছোট মেসো ভীষণ ব্যস্তবাগীশ মানুষ। ন'টা বাজতে না বাজতেই সবাইকে তাড়া দিয়ে স্নান-টান করিয়ে ওদের টাটা সুমো গাড়িতে তুলে ফেললেন। নিজেই ড্রাইভ করে তিনি নিয়ে যাবেন।

রাহুলের যাবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তার মনটা 'হ্যাপি ভিলা'তেই পড়ে আছে। কিন্তু ছোট মেসোদের কাছে বেড়াতে এসেছে সে। ওঁরা কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে 'না' বলা যায় না। তবু ছোট একটা ওজর তুলে যাওয়াটা আটকাতে চেয়েছিল রাহুল, 'তোমাদের নেমন্তন্ন করেছেন। আমি গেলে ওঁরা কিছু ভাববেন না তো?' ছোট মাসিদের রান্নার লোক আছে। ফ্ল্যাটে থেকে গেলে তার কোনও অসুবিধা হতো না। আসল উদ্দেশ্যটা হল, 'হ্যাপি ভিলা'য় আরেক বার যাওয়া। কিন্তু ছোট মেসোরা তার আপত্তি কানেই তোলেননি। বলেছেন, 'তুমি গেলে ওরা ভীষণ খুশি হবে।'

দশটার মধ্যেই রাহুলরা ভারসোভায় পৌঁছে গেল।

জায়গাটা চমৎকার। একটা বড় খেলার মাঠ আর কমিউনিটি হল ঘিরে নতুন নতুন অগুনতি হাই রাইজ। সব মিলিয়ে বিশাল কমপ্লেক্স।

অরবিন্দ চাপেকারেরা একটা বাড়ির ন'তলার মস্ত ফ্ল্যাটে থাকেন। পুব দক্ষিণ পশ্চিম, তিনটে দিকই খোলা। প্রচুর হাওয়া, প্রচুর আলো।

অরবিন্দ চাপেকার এবং তাঁর স্ত্রী মাধুরী চাপেকার দারুণ ভালমানুষ। ওঁদের একমাত্র ছেলে সঞ্জয়। সে রাহুলেরই বয়সী। ক্লাস নাইনেই পড়ে। সবাই ভীষণ মিশুকে। হুল্লোড় করতে ভালবাসে। খুব মজা করতে পারে। কথায় কথায় তাদের হাসি। মুহূর্তে রাহুলকে তারা আপন করে নিল।

পুরি, তরকারি, তিন-চার রকমের মিষ্টি এবং চা খাওয়ার পর সঞ্জয় রাহুল আর অয়নকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। লিফটে করে নিচে নেমে এই কমপ্লেক্সেরই আরও ষোল-সতেরোটা ছেলেকে ডেকে এনে প্রথমে রাহুলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপর দু'টো টিম করে মাঝখানের মাঠে ক্রিকেটের আসর বসিয়ে দিল।

একটা পর্যন্ত খেলার পর চাপেকারদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে ফের মাঠে ফিরে এল রাহুলরা। নতুন করে আবার ক্রিকেট। সেটা চলল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। দিনের আলো নিভে এলে যখন ভাল করে বল দেখা যাচ্ছে না, খেলা শেষ হল। সঞ্জয় রাহুল আর অয়নকে নিয়ে তাদের ফ্ল্যাটে চলে এল।

এতক্ষণে ক্রিকেট খেলেছে ঠিকই কিন্তু 'হ্যাপি ভিলা'র সেই খুনী চেহারার লোকগুলোকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না রাহুল। কোনও এক শনিবার মুম্বাইয়ের একটা জুয়েলারি শপে তারা হানা দেবে। কিন্তু কোন শনিবার? শহরের কোন এলাকায়?

হঠাৎ রাহুলের খেয়াল হল, আজও তো শনিবার। আজই যদি ওই বন্দুকবাজেরা কিছু করে বসে?

ওপরে এসে দেখা গেল, সঞ্জয়দের বিশাল ড্রইং রুমে জোর আড্ডা চলছে। অরবিন্দ চাপেকার, তাঁর স্ত্রী এবং ছোট মেসোরা তো আছেনই, খুব সম্ভব এই বিল্ডিংয়ের অন্য

ফ্ল্যাটের কয়েক জনকেও ডেকে আনা হয়েছে। কফি, পকোড়া কেক ডালমুট ইত্যাদির সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প হচ্ছিল। সিনেমা। টিভি সিরিয়াল। ফ্যাশন। রাজনীতি। দেশের হালচাল। এই সব।

একধারে একটা চমৎকার নিচু ক্যাবিনেটের মাথায় টিভি চলছিল। সেদিকে কারও খেয়াল নেই।

রাহুলরা ড্রইং রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে সন্ধেবেলার ইংরেজি নিউজ শুরু হল। এবার সেদিকে সবার নজর চলে গেল। খবরটা মোটামুটি সবাই শুনতে চায়।

অরবিন্দ চাপেকার উঠে গিয়ে টিভির সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিলেন। দিল্লির নানা রাজনৈতিক খবর দেবার পর সংবাদ-পাঠিকা পড়তে লাগলেন, আজ দুপুর দু'টোয় লিঙ্কিং রোডের মীরচন্দানি জুয়েলার্সের শো-রুমে ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে। চার বন্দুকবাজ গুলি চালিয়ে তিনজনকে হত্যা করে। দোকানের মালিক রমেশ মীরচন্দানিকে গুরুতর আহত অবস্থায় নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাকাতদের তিনজন বেশ লম্বা, ছ'ফিটের মতো হাইট, একজনের উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ ফিট চার-পাঁচ ইঞ্চি। তারা প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার জড়োয়া গয়না নিয়ে একটা জিপ গাড়িতে চড়ে পালিয়ে যায়। চারজনের মাথাতেই ছিল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ঘন চুল। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। পরনে জিনসের টাইট ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট। এই রকম চেহারায় সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তিকে দেখতে পেলে অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করতে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

খবরটা শুনতে শুনতে মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল রাহুলের। সকাল থেকেই আবছাভাবে তার মনে হচ্ছিল, লুটেরারা আজই যদি হানা দেয়? আর আজকেই ঘটনাটা ঘটে গেল। নকল চুলদাড়ির রহস্যটাও এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজেদের আসল চেহারা গোপন রাখার জন্য ওগলো কাজে লাগানো হয়েছে।

সংবাদ-পাঠিকা ডাকাতির ব্যাপারটা জানিয়ে এবার অন্য খবর পড়তে শুরু করেছেন।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোট মেসোর কাছে চলে এল রাহুল। বলল, 'লিঙ্কিং রোডে, মানে যেখানে মীরচন্দানি জুয়েলার্সের শো-রুমে ডাকাতি হয়েছে সেই জায়গাটা কোথায়?'

রাহুলের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন ছোট মেসো, অর্থাৎ অরুণেশ। বললেন, 'আমাদের বাড়ির খুব কাছে। কেন?'

'ওখানকার থানাটা?'

'হিল রোডে। আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে।'

'আমাকে এক্ষুনি সেখানে নিয়ে চলুন—'

ঘরের সবাই হতভম্ব। অয়ন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। বলল, 'হ্যাঁ বাবা, চল—'

অরুণেশের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। বললেন, 'থানায় যাব কেন? কী হয়েছে?'

'এখন একদম সময় নেই। যেতে যেতে বলব—'

একরকম টানতে টানতেই ড্রইং রুম থেকে অরুণেশকে বার করে নিয়ে গেল রাহুল। অয়নও তাদের সঙ্গে ছাড়ল না।

'হ্যাপি ভিলা'য় তারা যা যা দেখেছে, রাস্তায় অরুণেশকে জানিয়ে দিল রাহুল। বান্দ্রা থানায় এসেও অবার সে-সব বলতে হল।

ওসি নবীন সরদেশাইয়ের সঙ্গে অরুণেশের পরিচয় আছে। তিনি বললেন, 'ইমিডিয়েটলি আমরা হ্যাপি ভিলা রেইড করব। মাস্টার রাহুল, মাস্টার অয়ন, তোমরা যা করেছ ঝানু গোয়েন্দারাও তা অনেক সময় পারে না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' অরুণেশকে বললেন, 'আপনি ওদের বাড়ি নিয়ে যান। কাছেই তো থাকেন। কী হল না-হল, কালই জানিয়ে আসব।'

রাহুল বলল, 'সরদেশাই আঙ্কল, রেইডের সময় আপনারা আমাকে সঙ্গে নিন?'

সরদেশাই বললেন, 'নো। গোলাগুলি চলতে পারে। তোমাদের মতো বাচ্চাদের ওসবের ভেতর না যাওয়াই ভাল।'

থানা থেকে বেরিয়ে রাহুল আর অয়ন ভারসোভায় গেল না। অরুণেশ অনেক বার বললেন, কিন্তু রাহুল শুনল না। বন্দুকবাজগুলোর ব্যাপারে ভেতরে ভেতরে তার তীব্র টেনশন চলছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না।

রাহুল যাবে না। তাই অয়নও গেল না। নিজেদের ফ্ল্যাটে ওদের রেখে অরুণেশ ভারসোভায় চলে গেলেন। ফিরলেন বেশ রাত করে।

পরদিন রবিবার।

আগের রাতটা ভাল করে ঘুমোতে পারেনি রাহুল। বন্দুকবাজগুলো ধরা পড়ল কি না, কে জানে। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে তার।

ওসি নবীন সরদেশাই তাঁর কথা রেখেছেন। দশটা নাগাদ ফোনে খবরটা দিলেন। 'হ্যাপি ভিলা'য় অভিযান চালিয়ে চার বন্দুকবাজকেই ধরা গেছে। এমনকি মীরচন্দানি জুয়েলার্স-এর সব গয়নাই উদ্ধার করতে পেরেছেন। আরেকটা সুখবর, মীরচন্দানি জুয়েলার্স-এর মালিকের বিপদ কেটে গেছে। তিনি বেঁচে যাবেন।

রাহুলের সঙ্গেই বেশিক্ষণ কথা বললেন নবীন সরদেশাই। 'অনেক, অনেক ধন্যবাদ ইয়াং ম্যান। তোমার জন্যেই ডাকাতের দলটা ধরা পড়ল। খুব শিগগিরই একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করব।' এই সুখবর দিয়ে রাখি। মুম্বাই পুলিশ আর 'মীরচন্দানি জুয়েলার্স'-এর তরফ তোমাকে আর অয়নকে ভাল পুরস্কার দেওয়া হবে।'

সংকেত

রজত তার ঘরে খাটে শুয়ে মশগুল হয়ে একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিল। সে গোয়েন্দা কাহিনীর পোকা। কোনান ডয়েল থেকে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত সবার গল্প তার ঝাড়া মুখস্থ।

সে একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। সেখানে ইংরেজির মতো বাংলার ওপরেও সমান জোর দেওয়া হয়।

আনোয়ার শা রোড থেকে বেরিয়ে যে-রাস্তাটা দূরদর্শন কেন্দ্রের দিকে গেছে তার ওপরে রজতদের ছিমছাম দোতলা বাড়ি। চারপাশে খোলামেলা অনেকটা জায়গা। পেছন দিকে বাগান, গ্যারাজ, ইত্যাদি।

বাবা মা ঠাকুমা দাদা আর সে নিজে—সব মিলিয়ে রজতরা পাঁচজন। এ ছাড়া রয়েছে দু'টি কাজের মেয়ে। তারা অবশ্য এ-বাড়িতে থাকে না। সকাল বিকেল দু'বার এসে কাজ করে চলে যায়। একজন বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর সাফ করে। আরেক জনের কাজ হল রান্না। আর আছে দশরথ। তার বয়স পঞ্চাশ। তিন কুলে কেউ নেই। তিরিশ বছর সে এ-বাড়িতে কাটিয়ে দিল। অত্যন্ত বিশ্বাসী। বাজার করা, ওষুধ কেনা, ব্যাঙ্ক কি পোস্ট অফিসে ছোটা, সবার সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখা—এমনি নানা দায়িত্ব তাকে সামলাতে হয়। দশরথ না থাকলে এ-বাড়ির সবাই চোখে অন্ধকার দেখবে।

একতলায় কিচেন, খাবার ঘর, গোটা তিনেক বেড-রুম। একটা বেড-রুমে দশরথ শোয়। বাকি দু'টো তালাবন্ধ থাকে। গেস্ট টেস্ট কেউ এলে খুলে দেওয়া হয়।

দোতলায় বড় হল-ঘর ঘিরে চারখানা বেড-রুম। তার একটা রাহুলের, একটা তার দাদার, একটা ঠাকুমার, একটা মা-বাবার। হল-ঘরটা দু-সেট সোফা, সেন্টার-টেবল দিয়ে সাজানো। এ ছাড়া রয়েছে টিভি, ঠাকুরদার আমলের একটা পিয়ানো, মিউজিক সিস্টেম, র‍্যাক বোঝাই ক্যাসেট।-পিয়ানোটা কেউ বাজায় না। মোটা কভার দিয়ে বারোমাস সেটা ঢেকে রাখা হয়।

রজতের মর্নিং স্কুল। আটটায় সে বেরিয়ে যায়। ফেরে সাড়ে বারোটায়। স্কুল-বাস তাকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায়। নামিয়েও দেয় সেইখানেই।

এখন দু'টোর মতো বাজে। বাড়িটা একেবারে নিঝুম। ঠাকুমা তাঁর ঘরে ঘুমোচ্ছেন। বাবা-মা দু'জনেই চাকরি করেন। তাঁরা তাঁদের অফিসে। দাদা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। সে

তার কলেজে। নিচের তলায় দশরথ কী করছে, কে জানে। তবে সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচলের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিন্তু সে-সব শুনতেই পাচ্ছে না রজত। যে-গল্পটা সে পড়ছে তার ডিটেকটিভ একটা ক্লু পেয়ে খুনীদের ডেরায় হানা দিয়েছে। একেবারে লোম খাড়া-করা পরিস্থিতি। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার।

হঠাৎ কাছেই কোথায় যেন ফোন বেজে উঠল। গল্পের বইতে রজত এতটাই তন্ময় যে প্রথমটা খেয়াল করেনি। কিন্তু ফোনটা বেজেই চলেছে, একটানা।

এবার যেন হুঁশ ফিরল রাজতের। তার ঘরের দরজটা খোলা। এধারে ওধারে তাকাতে সে বুঝতে পারল, হল-ঘরে একটা নিচু ছোট টেবলের ওপর তাদের যে-ফোনটা রয়েছে সেটা বেজে যাচ্ছে।

ঠাকুমা ঘুমোচ্ছেন। দশরথ একতলায়। ওপরে আর কেউ নেই যে ফোনটা ধরবে। অগত্যা হাতের বইটা বিছানায় রেখে খাট থেকে নেমে পড়তে হল রজতকে। গল্পের রোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে যখন ডুবে আছে তখন ফোনটা আসায় সে খুবই বিরক্ত। রাগও হচ্ছিল।

হলঘরে চলে এল রাহুল। টেলিফোন তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই শান্তনুর গলা শোনা গেল, 'কাল বাংলার পিরিয়ডে শরৎচন্দ্রের 'ছিনাথ বহুরূপী' পিসটা থেকে ক্লাস টেস্ট হবে, না রে?'

রজত অবাক। শান্তনু তাদের ক্লাসের সেরা ছাত্র। ফার্স্ট বয়। কবে কোন সাবজেক্টের ক্লাস টেস্ট হয়, সব তার মুখস্থ। তবু 'ছিনাথ বহুরূপী'র কথা জানতে চাইল কেন? তা ছাড়া, আরও একটা ব্যাপার খট করে কানে লেগেছে। কথা বলার সময় তার গলাটা ভীষণ কাঁপছিল। উত্তেজনায়, নাকি ভয়ে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রজত বলল, 'স্ট্রেঞ্জ। কাল নয়, পরশু 'ছিনাথ বহুরূপী'র ওপর ক্লাস টেস্ট। তোর তো এরকম ভুল হয় না। কী হয়েছে রে, গলা এত কাঁপছে কেন?'

রজতের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অধীরভাবে শান্তনু বলতে লাগল, 'ওই যে রে, যেটার ভেতর ইন্দ্রনাথ ক্যারেক্টারটা আছে। ভীষণ ডেসপারেট—'

হতভম্ব ভাবটা বেড়েই চলেছে রজতের। ইন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে 'ছিনাথ বহুরূপী' ভাবাই যায় না। তবু বিশেষভাবে ওই নামটার ওপর জোর দিল কেন শান্তনু?

রজত কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ত্রস্তভাবে শান্তনু এবার বলে ওঠে, 'ওই যে রে ইন্দ্রনাথ—লাল খাতায়—'

তার কথা শেষ হবার অগে। আচমকা ঘস্‌স্‌ করে একটা শব্দ হল। কিছু ছিঁড়ে গেলে যে ধরনের আওয়াজ হয়, অনেকটা সেই রকম।

রজত চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই শান্তনু—এই—'

অন্যদিকে থেকে কোনও রকম সাড়াশব্দ নেই। রজত ফের বারকয়েক ডায়াল করে। শান্তনুদের লাইন একেবারে ডেড।

আজকাল টেলিফোনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। লাইন খারাপ হয় না বললেই চলে। কী এমন ঘটতে পারে যাতে শান্তনুদের ফোনটা ডেড হয়ে গেল! সব কেমন যেন গুলিয়ে যায় রজতের। হাতের ফোনটা নিঃশব্দে নামিয়ে রাখতে রাখতে মনে পড়ল, লাল খাতার কথা বলেছিল শান্তনু।

লাল খাতা! লাল খাতা! রজতের সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। নিশ্চয়ই শান্তনুরা ভয়ঙ্কর কোনও বিপদে পড়েছে। দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যায় সে। চোখের পলকে পোশাক পালটে, তার জমানো টাকা থেকে দশ টাকার পাঁচটা নোট নিয়ে একতলায় নেমে আসে।

দশরথ দুপুরে ঘুমোয় না। খাবার ঘরে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ জিরোয়।

ডাইনিং রুমের দরজায় সামনে এসে মুখ বাড়িয়ে রজত ব্যস্তভাবে বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি। তুমি বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিও—'

ধড়মড় করে উঠে বসে দশরথ, 'এই দুকুরবেলা কোথায় চললে ছোটদা?' সে রজত ছোটদা বলে আর রজত দাদাকে বড়দা।

রজতের দাঁড়াবার সময় নেই। সে বলল, 'শান্তনুদের বাড়ি।'

শান্তনুকে খুব ভাল করেই জানে দশরথ, পছন্দও করে। প্রায়ই সে এ-বাড়িতে আসে। রজতও ওদের বাড়ি যায়। দু'জনেই তাদের মা-বাবাদের জানিয়ে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু দুপুরবেলা রজতের মা-বাবা বাড়িতে নেই। সে একা একা যাবে, সেটা দশরথের মনঃপূত নয়। বলল, 'চল, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রজত চমকে ওঠে। শান্তনুদের বাড়ি যাবার কথা দশরথকে বলেছে বটে, কিন্তু আসলে সে তো এখন সেখানে যাচ্ছে না। আগে তাকে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে। তারপর শান্তনুদের বাড়ি। দশরথকে তা জানালে কিছুতেই বেরোতে দেবে না। চট করে ভেবে নিয়ে রজত বলল, 'ঠাকুমা একা থাকবে। হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয়, তখন কে দেখবে, তা ছাড়া, আর্জেন্ট ফোনও আসতে পারে। তোমার যেতে হবে না।'

রজত ঠিকই বলেছে। বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়। তবু দশরথ খুঁত খুঁত করতে লাগল, 'মা-বাবা বাড়ি ফিরলে তাদের কারও সঙ্গে গেলে হতো নি?'

'না। দেরি হয়ে যাবে। শান্তনুর কাছে থেকে একটা পড়া জেনে আসতে হবে।'

'ফোন করে জেনে নাও না—'

দশরথ যে কোনও ভাবে আটকাতে চাইছে। কিন্তু হাতে একদম সময় নেই। তার যেতে দেরি হলে হয়তো শান্তনুদের সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাবে। 'ওদের ফোন খারাপ হয়ে গেছে—' দশরথকে বাধা দেবার এতটুকু সুযোগ না দিয়ে রজত দৌড়ে সদর দরজা এবং সামনের বাগান পেরিয়ে রাস্তায় চলে এল। দশরথ পিছু পিছু কী যেন বলতে বলতে ছুটে এসেছিল, কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকাল না সে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রজতকে এখন থানায় পৌঁছতে হবে। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করল। কিন্তু আশেপাশে ট্যাক্সির চিহ্নমাত্র নেই। প্রাইভেট বাস আর মিনিবাস

অবশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো থেমে, থেমে প্যাসেঞ্জার তুলতে তুলতে কতক্ষণে যে থানার সামনে হাজির হবে, কে জানে।

আনোয়ার শা রোডের দিকে খানিকটা এগোলে সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড। রজত উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে গিয়ে একটা রিকশায় উঠে বলল, 'থানায় পৌছে দাও—'

রিকশাওলাটা অনেক দিনের চেনা। উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে দাদাবাবু? থানায় কেন?'

রজত তাড়া লাগাল, 'পরে শুনো। জোরসে চালাও। কুইক—'

রিকশাওলা কী ভাবল, কে জানে। আর একটি কথাও বলল না। তার যানটাকে ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

দশ মিনিটও লাগল না, তারা থানায় চলে আসে।

ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, বাধা পড়ল। গেটের মুখে দু'জন সেন্ট্রি দাঁড়িয়েছিল। হাতে রাইফেল। তারা বজতের পথ আটকে দাঁড়াল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী চাই ?'

ব্যগ্র সুরে রজত বলল, 'ওসি'র সঙ্গে দেখা করব।'

সেন্ট্রিটা অবাক হল। একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কেন দেখা করতে চায়, বুঝতে না পেরে বলল, 'তাঁর কাছে কী দরকার?'

'সেটা আমি তাঁকেই বলব—'

সেন্ট্রিটা রজতকে পাত্তা দিল না, 'ওসি-র সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি ব্যস্ত আছেন।'

রজত অনেক কাকুতি মিনতি করল, কিন্তু কাজ হল না। সেন্ট্রিরা কিছুতেই তাকে ওসি'র কাছে যেতে দেবে না। অগত্যা এক কাণ্ডই করে বসে রজত। দুই সেন্ট্রির মাঝখান দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে থানার বিরাট বিল্ডিংটার ভেতর ঢুকে পড়ে। সেন্ট্রিরা প্রথমটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। তারপর হই হই করে তেড়ে আসে, 'এই—এই—এই ছেলে—'

রজত লম্বা করিডর ধরে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে থাকে, 'ওসি'র সঙ্গে আমি দেখা করবই, দেখা করবই।'

সেন্ট্রি দু'টো ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। হঠাৎ ডান দিকের একটা ঘর থেকে ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার বেরিয়ে এলেন। ছ'ফিটের ওপর হাইট। পেটানো স্বাস্থ্য। বেশ সুপুরুষ। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। একটা ঝকঝকে, স্মার্ট কিশোরকে দৌড়ে আসতে দেখে রীতিমতো অবাক হলেন। হাত তুলে দুই সেন্ট্রি আর রজতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, এত চেঁচামেচি কিসের?'

সেন্ট্রিরা জানাল, 'এই ছেলেটা স্যার, বারণ করা সত্ত্বেও থানায় ঢুকে পড়েছে। তাই—',

ভুরু কুঁচকে রাজতের দিকে তাকালেন অফিসার, 'কেন ঢুকেছ?'

'আমি ওসি'র সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলছি, খুব দরকার। ওরা আমার কথা শুনছেই না। তাই কায়দা করে ভেতরে ঢুকে পড়তে হল।'

অফিসারের বিস্ময় বাড়ছিল। সেন্ট্রিদের গেটে ফেরত পাঠিয়ে তিনি রজতকে বললেন 'আমিই ওসি। চল আমার কামরায়। কী জন্যে এসেছ, শোনা যাক।'

রজত বলল, 'আঙ্কল, বসার সময় নেই। আমার বন্ধু শান্তনুদের ভীষণ বিপদ। এক্ষুনি ক'জন আর্মড পুলিশ নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন—'

চোখ স্থির হয়ে গেল ওসি'র, 'কী বিপদ তোমার বন্ধুদের?'

'সেটা এগ্‌জাক্টলি বলতে পারব না। আর দেরি করবেন না আঙ্কেল, প্লিজ চলুন।' রজত জোর তাড়া লাগায়।

কী একটু ভাবলেন ওসি, তারপর একটা জিপে চারজন আর্মড কনস্টেবল আর রজতকে নিয়ে উঠে পড়লেন। ফ্রন্ট সিটে ড্রাইভারে পাশে বসেছেন তিনি আর রজত। ব্যাক সিটে কনস্টেবলেরা।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো কোথায় যেতে হবে—'

'লেক গার্ডেনসে।'

ওসি ড্রাইভারকে জায়গাটার নাম বলতেই সে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

ওসি এবার বললেন, 'এবার বল তো তোমার বন্ধুরা যে বিপদে পড়েছে, সেটা তুমি জানলে কী করে?'

রজত বলল, 'আমরা ক'জন বন্ধু যারা এই এরিয়ায় থাকি, ভেবে ভেবে একটা কোড ল্যাংগুয়েজ বানিয়েছি। কেউ বিপদে পড়লে ফোনে অন্যকে জানাতে চেষ্টা করি। সেটা আমরাই শুধু বুঝতে পারি। কিছুক্ষণ আগে ও আমাকে কোডটা বলেছে, সেই সময় ওদের লাইন হঠাৎ ডেড হয়ে গেল।'

কোড বলতে সংকেত লিপি বা সংকেত বাক্য। ওসি কৌতূহল বোধ করছিলেন। বললেন, 'কোডটা কী ধরনের?'

'বলতে সময় লাগবে। পরে আপনাকে শোনাব—'

'ঠিক আছে। তোমার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।'

'রজত দত্ত।'

'শোনো রজত, আমাকে তো থানা থেকে টেনে বার করে আনলে। লেক গার্ডেনসে গিয়ে যদি দেখি শান্তনুদের কিছু হয়নি, তোমাকে কিন্তু শাস্তি পেতে হবে।'

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে গেল রজত। পরক্ষণে বেশ জোর দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে আঙ্কল।' সে নিশ্চিত, শান্তনুর সংকেতে কোনও ভুল নেই।

শান্তনুরা থাকে লেক গার্ডেনসের মাঝামাঝি একটা বিরাট উঁচু বাড়ির পাঁচতলার চার কামরাওলা মস্ত ফ্ল্যাটে। ওরা দুই ভাইবোন। ওর দিদি পুনেতে হোস্টেলে থেকে পড়ে। এ ছাড়া আছেন বাবা মা ঠাকুরদা। শান্তনুর বাবার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিশাল বিজনেস।

দুপুরবেলা শান্তনুদের ফ্ল্যাটে তার মা, ঠাকুরদা আর সে ছাড়া অন্য কেউ থাকে না। তিনজন ঠিকে কাজের লোক আছে ওদের। তারা সকাল বিকেল দু'বার এসে কাজ করে চলে যায়।

রজত পথ দেখিয়ে জিপটাকে শান্তনুদের বিশাল বাড়িটার সামনে নিয়ে এল।

বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়িতে যেমন থাকে, এখানেও তেমনি সিকিউরিটির ব্যবস্থা। গেটে দারোয়ান ছাড়াও রয়েছে তিনজন উর্দি-পরা পাহারাদার। তাদের একজন গেট থেকে একটু দূরে একটা শেডের তলায় টেবলে বাঁধানো লম্বা খাতা আর পেন নিয়ে বসে থাকে। ভিজিটররা এলে তাদের নাম, ঠিকানা, কোন ফ্ল্যাটে কার সঙ্গে দেখা করবে, দেখা করার উদ্দেশ্য, ইত্যাদি খাতায় লিখিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়। বাইরের লোক কখন এল, তাও লেখা থাকে। আজকাল বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে। সে জন্য কড়া সিকিউরিটির বন্দোবস্ত না করলেই নয়।

রজতরা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছিল। পুলিশ দেখে সিকিউরিটির লোকজন হকচকিয়ে গেছে। তারা দৌড়ে আসে।

ওসি রজতের কাছ থেকে শান্তনুর বাবার নাম জেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার দিবানাথ মজুমদারদের ফ্ল্যাটে ডাকাতি টাকাতি বা অন্য কোনও সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটেছে?'

সিকিউরিটির লোকেরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তাদের মধ্যে যার বয়স সব থেকে বেশি, সে বলল, 'না স্যার, তেমন কিছু ঘটলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে থানায় খরব দিতাম।'

ওসির কপালে ভাঁজ পড়ল। কী চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার মজুমদারদের ফ্ল্যাটে দুপুরে কেউ কি এসেছিল?'

যে-লোকটি ভিজিটরদের আসা-যাওয়ার রেকর্ড রাখে, খাতা এনে সে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আধ ঘণ্টা আগে শান্তনুর মেসোমশাই আর তাঁর দুই ছেলে জলপাইগুড়ি থেকে ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়ির সবার তো বটেই, তাদের আত্মীয়স্বজনদের যাবতীয় খবর রাখে রজত। শান্তনুর একজনই মেসোমশাই এবং তাঁর দুই ছেলে। এই মাসতুতো দাদাদের একজন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে এম. এ পড়ে। আরেক জন বি. এস-সি'র ছাত্র। ওদের বাড়ি জলপাইগুড়িতেই।

রজত বেশ দমে গেল। ঢোক গিলে বলল, 'শান্তনুর মেসোমশায়ের আর মাসতুতো দাদাদের নামগুলো বলুন তো—'

রেকর্ডকিপার লোকটি জানিয়ে দিল, মেসোমশায়ের নাম ভবতোষ চৌধুরি এবং মাসতুতো দাদাদের নাম রঞ্জন আর দীপক।

ওসি রজতকে লক্ষ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, ঠিক বলেছে?'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দিল রজত। মিয়ানো গলায় বলল, 'হ্যাঁ'।

ওসি'র দৃষ্টি কড়া হয়ে উঠল, 'এভাবে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে আনার মানে কী?'

আচমকা কিছু মনে পড়ে গেল রজতের। বন্ধুদের কারও বাড়িতে কেউ এলে তারা পরস্পরকে জানিয়ে দেয়। আজও স্কুলে কয়েক ঘণ্টা সময় তাদের একসঙ্গে কেটেছে। একই স্কুল-বাসে তারা গেছে, ফিরেও এসেছে। কিন্তু মেসোমশাই এবং তাঁর ছেলেরা যে আসবে,

একবারও জানায়নি শান্তনু। অবশ্য এমনও হতে পারে, হঠাৎ কোনও দরকারে তাঁদের কলকাতায় আসতে হয়েছে। আর আসাই যখন হয়েছে, একবার শান্তনুদের সঙ্গে দেখা না করে গেলে কী হয়?

সবই ঠিক, তবু কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে রজতের। সে রেকর্ড কিপারকে জিজ্ঞেস করল, 'শান্তনুর মেসোমশাইরা কি চলে গেছেন?'

রেকর্ড কিপার বলল, 'না। এই তো সবে এসেছেন। এত তাড়াতাড়ি কি শান্তনুরা ছেড়ে দেবে?'

রজত ওসিকে বলল, 'আঙ্কল, এই মেসোমশাই আর তাঁর ছেলেদের একবার দেখা দরকার।'

ওসি বিরক্ত হলেন, 'নাম ঠিকানা-টিকানা মিলে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও দেখতে চাইছ কেন?'

রজত তাঁর কোনও কথা শুনল না। একরকম জোর করেই তাঁকে ধরে নিয়ে চলল।

উঁচু উঁচু বাড়িগুলোতে লিফ্‌ট ছাড়া চলে না। এই বিল্ডিংটাতেও দু'টো লিফ্‌ট রয়েছে।

ওসি আর আর্মড পুলিশের দলটাকে নিয়ে রজত একটা লিফ্‌টে করে পাঁচতলায় উঠে এল। তাদের সঙ্গে সিকিউরিটির দু'টো লোকও এসেছে।

মোক্ষম সময়ে তারা ওপরে পৌঁছে গেছে। ঠিক তখনই শান্তনুদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে মধ্যবয়সী একটা লোক। পরনে দামি শার্ট, ট্রাউজার্স। তার সঙ্গে জিনস-পরা দুই যুবক। বয়স্ক লোকটির হাত খালি। একটি যুবকের হাতে মাঝারি চামড়ার সুটকেস, অন্যটির হাতে অ্যাটাচি কেস। আচমকা পুলিশ আসতে পারে, তারা বোধ হয় ভাবতে পারেনি। লিফ্‌টের পাশ দিয়ে সিঁড়ি। ত্রস্তভাবে এক পলক দাঁড়িয়ে থেকে ওরা দিশেহারার মতো সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগায়।

চকিতে খাপ থেকে রিভলভার বার করে ফেলেছেন ওসি। সেটা উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন, 'স্টপ। এক পা নড়লে ঝাঁঝরা করে ফেলব। হাত তোল—'

তিনজনই হাত ওপর দিকে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে।

শান্তনুদের বাইরের দিকের দরজাটা খোলা ছিল। ওসি কনস্টেবলদের বললেন, 'রাসকেলগুলোকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

রাইফেলের বাঁট দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে তিন মূর্তিমান শয়তানকে ফ্ল্যাটে ঢোকানো হয়। দরজার পরই মস্ত ড্রইং কাম ডাইনিং হল। তার এক কোণে পুলিশের পাহারায় ওদের বসানো হল।

বাড়ির কাউকে দেখা যাচ্ছে না। উদ্বিগ্ন রজত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'শান্তনু—শান্তনু—'

কোনও সাড়াশব্দ নেই।

হল-ঘরটার একধারে সারি সারি বেড-রুম। পাগলের মতো দৌড়ে রজত প্রথমে শান্তনুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওসি'ও সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন।

দেখা গেল একটা চেয়ারে শান্তনুকে বসিয়ে হাত-পা শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। যাতে আওয়াজ করতে না পারে, তাই তার মুখে কাপড় গোঁজা।

বাঁধন খুলে দেওয়া হলে শান্তনু বলল, 'মা আর দাদুকেও ডাকাতগুলো আমার মতো বেঁধে রেখেছে। ওদের ঘরে চল।' ওসি'কে বলল, 'চলুন আঙ্কল—'

শান্তনুর ঠাকুরদা এবং মায়ের গা থেকে দড়ি টড়ি খুলে তাঁদের হল-ঘরে আনা হল। পুলিশ দেখেও তাঁদের ভয় কাটেনি। সোফায় বসে তাঁরা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে আছেন আর থরথর কাঁপছেন।

এদিকে ওসি, রজত আর শান্তনুও বসে পড়েছে। শান্তনু তিন ডাকাতকে দেখতে পেয়েছিল। বলল, 'স্কাউন্ড্রেলগুলো তা হলে ধরা পড়েছে?'

ওসি একটু হেসে রজতকে দেখিয়ে বলেন, 'সবই তোমার বন্ধুর জন্যে—' তারপর বললেন, 'এবার বল, কী হয়েছিল?'

শান্তনু যা জানালো তা এইরকম। স্কুল থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়া করে সে তার ঘরে শুয়েছিল। মর্নিং স্কুল তো। দুপুরে একটু ঘুমোতে না পারলে মাথায় যন্ত্রণা হয়। ওদিকে মা আর ঠাকুরদাও তার সঙ্গেই খাওয়া চুকিয়ে ওঁদের ঘরে শুয়ে পড়েছেন। তার মতো ওঁদের দু'জনেরও দিবানিদ্রার অভ্যাস।

শান্তনুর চোখ সবে জুড়ে এসেছে, সেই সময় কলিং বেলের আওয়াজ হল। শান্তনু উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চানতে চাইলেন, 'কে?'

দরজার বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল, 'আমাকে চিনবেন না, জলপাইগুড়িতে থাকি। ভবতোষ চৌধুরির প্রতিবেশী। আমি কলকাতায় আসছি শুনে আমার হাত দিয়ে আপনাদের জন্যে একটা জিনিস পাঠিয়েছেন। আমার ভীষণ তাড়া আছে। জিনিসটা দিয়েই চলে যাব।'

শান্তনুর মা সাদাসিধে সরল মানুষ। নিচে সিকিউরিটির লোকেদের কাছে যখন নাম ধাম জানিয়ে এসেছে তখন তাঁর মনে এতটুকু সন্দেহ দেখা দেয়নি। তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রৌঢ় লোক আর দু'টো যুবক ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পিস্তল বার করে। প্রৌঢ়টি বলে, 'টুঁ শব্দ করবেন না। আমরা যা-যা বলি, চুপচাপ তা করলে কোনও ভয় নেই।'

শান্তনু তার ঘর থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। লোকগুলো যে ভয়ঙ্কর টাইপের ক্রিমিনাল সেটা ওদের পিস্তল উঁচনো দেখেই টের পেয়েছিল। এই ফ্ল্যাটের সব কামরাতেই টেলিফোনের কানেকশন আছে। তক্ষুনি সে তার ফোনটা তুলে রজতের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাকে কথা বলতে দেখে একটা যুবক দৌড়ে এসে এক টানে ফোনের তার ছিঁড়ে ফেলে। তারপর শান্তনুদের তিনজনকে তাদের ঘরে বেঁধে জোর করে মায়ের কাছ থেকে আলমারির চাবি কেড়ে নিয়ে সেটা খুলে টাকা গয়না, যা-যা ছিল সব ব্যাগ-ট্যাগে ভরে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে যায়।

চোখ বড় বড় করে শুনে যাচ্ছিল রজত। কেন শান্তনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘস্‌স্‌ শব্দ করে লাইনটা কেটে গিয়েছিল, এতক্ষণে বোঝা গেল।

এদিকে সব শোনার পর ওসি এবার হল-ঘরে কোণে তিন ধুরন্ধরের দিকে তাকান। মাঝবয়সী লোকটাকে তীব্র গলায় বলেন, 'নিচে লিখে এসেছ তুমি নিজেই ভবতোষ চৌধুরি। আর ওই দুই হারামজাদা তোমার ছেলে। ওপরে এসে বলেছ, ভবতোষ চৌধুরি তোমাকে পাঠিয়েছেন। ফন্দিটা ভালই এঁটেছিলে।'

তিনজন মাথা হেঁটে করে বসে থাকে।

ওসি জিজ্ঞেস করেন, 'ভবতোষ চৌধুরির নাম, তাঁর সঙ্গে শান্তনুদের সম্পর্ক, এসব জানলে কী করে?'

কোনও উত্তর নেই।

ওসি বাঘাটে গলায় হুঙ্কার দিলেন, 'বলবে না, কেমন? থানায় নিয়ে আচ্ছা করে গুঁতো দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে।' কনস্টেবলদের বললেন, 'রাসকেলগুলোকে নিয়ে গাড়িতে তোল। আমি আসছি।'

তিন ডাকাতকে বন্দুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পুলিশের দলটা বেরিয়ে গেল।

ওসি উঠে পড়েছিলেন। শান্তনু আর রজতকে বললেন, 'সন্ধেবেলায় আমি আবার আসব। তোমাদের মা বাবাকে থাকতে বোলো। কোডের ব্যাপারটা শোনা হয়নি। তখন শুনে নেব। চলি—'

সন্ধেয় শান্তনুদের ফ্ল্যাটে বিরাট আসর বসল। শান্তনুদের বাড়ির সবাই তো রয়েছেই। রজত তার মা-বাবাকে নিয়ে এসেছে। এমন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে, জানার পর এই বিশাল বাড়িতে দারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও শান্তনুদের হল-ঘরে হাজির হয়েছেন। কিন্তু সেখানে এত লোকের জায়গা হয়নি। অনেকে দরজার বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছেন। সবার চোখেমুখে কৌতূহল।

ডাকাতদের হানা দেওয়া, তাদের ধরা পড়া, এসব নিয়ে অনেক কথা হল। তারপর ওসি রজতকে বললেন, 'এবার তোমাদের কোডের কথাটা বল—'

রজত বলল, 'আজকাল ডাকাতি-টাকাতি ভীষণ বেড়ে গেছে। তাই ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমরা, এই এরিয়ার ক'জন বন্ধু ভেবে ভেবে একটা প্ল্যান করেছি। এখানকার থানায় যখন যে ওসি আসেন তাঁর নামটা জেনে নিই।'

ওসি বললেন, 'তা না হয় জানলে। তাতে—'

তাঁর কথা শেষ হল না। তার আগেই রজত বলে ওঠে, 'সবটা শুনুন। তা হলে বুঝতে পারবেন।'

'বেশ, বল—'

'আমরা জানতে পেরেছি, আপনি এখানকার থানায় নতুন এসেছেন। আপনার নাম ইন্দ্রনাথ তরফদার। নামটা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক মাথা ঘামালাম। কীভাবে

নামটাকে কাজে লাগাব?' শেষ পর্যন্ত আইডিয়াটা এসে গেল। আমাদের বাংলা টেক্সট বইয়ে শরৎচন্দ্রের 'ছিনাথ বহুরূপী' পিসটা রয়েছে। ওটায় যে-সব ক্যারেক্টার আছে তাদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ হল সবচেয়ে ব্রাইট, সবচেয়ে দুর্দান্ত। এখন কারও বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে, সুযোগ করে নিয়ে ফোনে সে অন্য বন্ধুদের বলবে, ইন্দ্রনাথ ক্যারেক্টারটা কীভাবে বিশ্লেষণ করবে। শান্তনু আমাকে ফোন করে বলেছিল, 'ছিনাথ বহুরূপী' পিসটায় যাতে ইন্দ্রনাথ চরিত্রটা রয়েছে তার ওপর কাল ক্লাস টেস্ট হবে কি না। আমি প্রথমটা ঠিক ধরতে পারিনি। আসলে টেস্ট হবে পরশু দিন। তখন ও বললো, ওই যাতে ইন্দ্রনাথ আছে—লাল খাতায়। লাল খাতা বলতেই তক্ষুনি বুঝতে পারলাম ওরা বিপদে পড়েছে।'

ওসি অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'লাল খাতার রহস্যটা কী?'

'আমাদের চার বন্ধুর কাছে চারটে লাল খাতায় এই প্ল্যানটা ডিটেলে লেখা আছে। 'ছিনাথ বহুরূপী' বললে যদি বুঝতে না পারি, লাল খাতা বললে চট করে মনে পড়ে যাবে। বদমাসদের সামনে ফোন করলে তারা কিছু ধরতেই পারবে না। মনে করবে পড়ার কথা বলছে।'

ইন্দ্রনাথের দু'পাশে বসেছিল শান্তনু আর রজত। দু'হাতে তাদের পিঠে চাপড়ে দিয়ে তিনি তারিফের সুরে বললেন, 'শাবাশ—'

রজত এবার বলল, 'আপনি এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলে নতুন যিনি আসবেন তাঁর নাম নিয়েও ওই রকম প্ল্যান করে ফেলব।'

ইন্দ্রনাথ গলার স্বর উঁচুতে তুলে বললেন, 'ডবল শাবাশ।'

ছবি আঁকতে আঁকতে

শৌভিক চমৎকার ছবি আঁকতে পারে। তার কল্পনাশক্তি দারুণ। কোনও লোককে দেখলে পনেরো বছর আগে তার চেহারা কেমন ছিল, বা পনেরো বছর বাদে সেটা কিরকম দাঁড়াবে, ভেবে ভেবে সে এঁকে ফেলে। ভবিষ্যতে একজনকে কেমন দেখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তা তো বোঝার উপায় নেই। তবে কারও কম বয়সের পুরনো ফোটো থাকলে তার পাশে শৌভিকের আঁকা ছবি রাখলে দেখা যাবে, হুবহু এক। এমনটা হয়তো অনেকেই পারে কিন্তু সে আরও যা যা পারে তা চমকে দেবার মতো। কোনও মানুষ বা তার ফোটো দেখেই নয়, শুধু বর্ণনা শুনেই সে অনেকের ছবি এঁকেছে। সেগুলো পুরোপুরি মিলে গেছে।

শৌভিকের বাবার এক বিরাট পুলিশ অফিসার বন্ধু আছেন। অমরেশ দত্ত। সে বলে, 'অমরেশ কাকু'। যে অ্যালবামে অমরেশের মৃত মা-বাবার ফোটো ছিল সেটা হারিয়ে যায়। সে জন্য তাঁর ভীষণ দুঃখ। অমরেশ কাকুর মুখে তাঁর মা-বাবার চেহারার ডেসক্রিপশন শুনে মাত্র তিন দিনে শৌভিক দু'জনের আলাদা আলাদা ছবি এঁকে দেয়।

ছবি দেখে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলেন অমরেশ। শৌভিকের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'সুপার্ব। তুমি একটি জিনিয়াস।' তাঁর গলা ভারী হয়ে এসেছিল, 'এ দু'টো আমি বাঁধিয়ে রাখব। নইলে আমাদের পরের জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা জানতেই পারবে না তাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন দেখতে ছিলেন।'

এই ছবি আঁকতে আঁকতে একটা দুর্দান্ত কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল শৌভিক। কিন্তু সেটা জানানোর আগে ওদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

শৌভিকরা থাকে লেক গার্ডেনসের একটা চোদ্দশো স্কোয়ার ফিটের মস্ত ফ্ল্যাটে। তার বাবা পরিমল দত্তগুপ্ত একটা বিদেশি কোম্পানির টপ একজিকিটিভ। মা সুরেখা দত্তগুপ্ত আধা-সরকারি অফিসে ডেপুটি ডিরেক্টর। শৌভিকরা দুই ভাই। দাদা রোহিত এ বছরই আমেদাবাদে ম্যানেজমেন্ট পড়তে গেছে। শৌভিক পড়ে কলকাতারই একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, ক্লাস নাইনে। তার চোদ্দ চলছে।

শৌভিক লেখাপড়ায় বেশ ভালো। মেধাবী। মায়ের ধারণা ছবি আঁকার দিকে বড় বেশি ঝোঁকের জন্য রেজাল্ট যতটা ভালো হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না। বাবা অবশ্য খানিকটা আশকারাই দেন। বলেন, 'ছবি এঁকেও নাইনটি পারসেন্ট মার্কস পাচ্ছে। সেটা কম হল। তুমি বা আমি ক্লাস নাইনে কত পারসেন্ট পেতাম?'

মা অবশ্য তেমন খুশি হন না। বলেন, 'আমাদের সময় এত কম্পিটিশন ছিল? ভালো কলেজে পড়তে হলে ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর চাই। এখন থেকে তার বেস তৈরি না করলে চলে?'

বাবা ভরসা দিয়ে বলেন, 'হবে হবে, সব হবে। রঞ্জু বেস্ট কলেজেই পড়বে। চিন্তা কোরো না—।' রঞ্জু শৌভিকের ডাকনাম।

এ বছর পুজোর ছুটিতে মুম্বাইতে মামা-মামির কাছে বেড়াতে এসেছে শৌভিকরা। তার একমাত্র মামা সুনির্মল সেন একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। সল্ট লেকে একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে ছিলেন। বছর চারেক হল তাঁকে মুম্বাইতে বদলি করা হয়েছে। কোম্পানি থেকেই খার-এ, সমুদ্রের ধারে তাঁকে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে।

সুনির্মল শৌভিকের মা সুরেখার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। মামি কল্পনা সেনও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মামা-মামি একই অফিসে কাজ করেন। ওঁদের একমাত্র মেয়ে মিলি—যার ভালো নাম সুনয়না—মুম্বাই ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি নিয়ে এম.এ পড়ছে।

বদলি হবার পর থেকে সুনির্মল অনবরত বোন, ভগ্নীপতি আর ভাগনেদের ফোন করে যাচ্ছিলেন, একবার মুম্বাই এসে যেন তারা বেড়িয়ে যায়। 'আসছি, আসব' করেও আসা হচ্ছিল না। একদিকে সুরেখা আর পরিমলের অফিসের নানা দায়িত্ব, অন্যদিকে শৌভিক এবং রোহিত যতদিন আমেদাবাদে যায়নি, একজনের পরীক্ষা শেষ হয় তো সঙ্গে সঙ্গে আরেক জনের শুরু হয়ে যায়। 'এই যখন অবস্থা তখন কী করেই বা আসা যায়? এভাবে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছিল।

সুরেখা আর শৌভিকের পুজোয় ক'দিন ছুটি থাকলেও পরিমলের অফিসে মাত্র দু'দিনের ছুটি। অষ্টমী আর দশমীতে। সুনির্মলদের দিক থেকে এবার চাপটা এত বেশি দেওয়া হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সুরেখা আর শৌভিককে সঙ্গে করে মুম্বাই চলে এসেছেন পরিমল।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। সারাক্ষণ শুধু কাজ আর কাজ। একদম ফুরসত পাওয়া যায় না। কিন্তু শৌভিকরা আসায় মামা-মামি দু'জনেই কোম্পানির কর্তাদের ধরাধরি করে ক'দিনের ছুটি নিলেন। আর মিলি তো ইউনির্ভাসিটিতে যাওয়াই ছেড়ে দিল।

এম. এ পড়লে কী হবে, মিলির মধ্যে দারুণ এক ছেলেমানুষি রয়েছে। শৌভিক তার চেয়ে ন'বছরের ছোট। নিজের ভাই-বোন নেই মিলির। পিসতুতো ভাইটিকে পেয়ে সে একেবারে মেতে উঠল। শৌভিককে মুম্বাই ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্বটা সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাদের দু-দু'টো গাড়ি। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই দু'জনে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এলিফান্টা কেভ, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলস থেকে শুরু করে জুহু বিচ, নভী মুম্বাই—বিশাল মেট্রোপলিসের চতুর্দিক তারা চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। দুপুরে কোনও রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে। কিন্তু তারপরও কি জিরোবার উপায় আছে? মিলির অফুরন্ত এনার্জি। মুম্বাই আসার পর তার নতুন নতুন অনেক বন্ধু হয়েছে। এদের কেউ সিন্ধি, কেউ পার্শি, কেউ মারাঠি বা

গুজরাতি। সন্ধেবেলায় তাদের ডেকে শৌভিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া, তারপর ওয়েস্টার্ন মিউজিক চালিয়ে হই হই করে গান, নাচ, আড্ডা, হা হা, হি হি। ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা খাওয়া। সব মিলিয়ে তুমুল হল্লোড়।

ওদিকে সুনির্মলারাও হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে নেই। তাঁরাও বোন ভগ্নীপতিকে নিয়ে তাঁদের দু' নম্বর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন।

মুম্বাইতে সাত লাখেরও বেশি বাঙালি রয়েছে। শহরের নানা এলাকায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আর কে না জানে বাঙালি মানেই দুর্গাপুজো। মুম্বাইতে কম করে শ'দেড়েক বারোয়ারি পুজো হয়। এখানে অঢেল পয়সা। তাই পুজোয় জাঁকজমকও প্রচুর।

ঠিক হল, সপ্তমী-অষ্টমী মুম্বাইতে প্রতিমা দেখে নবমীর দিন পুনেতে বেড়াতে যাবে সবাই। সকালে গিয়ে রাতে ফিরবে। তারপর দশমী কাটিয়ে দু'দিনের জন্য গোয়া। গোয়া থেকে এসে শৌভিকরা কলকাতায় ফিরে যাবে।

শেষ পর্যন্ত শৌভিকদের পুনে বা গোয়া যাওয়াটা ক্যানসেল করে দিতে হল। ওরা এসেছিল মহালয়ার দু'দিন বাদে। তারপর দু'টো দিন চমৎকার কেটে গেছে। কিন্তু পঞ্চমীর দিন টিভিতে রাত্রিবেলার নিউজে সংবাদপাঠিকা জানালো সান্তাক্রুজ নামে শহরতলির এক অভিজাত এলাকায় এক মারাত্মক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। খুন হয়েছেন একজন বড় সিন্ধি বিজনেসম্যান। নাম হীরাচাঁদ আদবানি।

হীরাচাঁদ সান্তাক্রুজেরই এক প্রকাণ্ড বহুতল বাড়িতে থাকতেন। সপরিবার। অন্য দিনের মতো আজও সন্ধেবেলায় তাঁর অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

আজকাল মুম্বাইতে ক্রাইমের হার অনেক বেড়ে গেছে। খুনখারাপি হচ্ছে আকছার। তাই বড় বড় বিল্ডিংগুলোতে যেখানে পয়সাওলা লোকেরা থাকে, সিকিউরিটির ভীষণ কড়াকড়ি। ক্লোজড সারকিট টিভি সর্বক্ষণ চলে। কারও ভিজিটর এলে তাদের গাড়ি ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কে কার কাছে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তার নাম ঠিকানা, ফোন নাম্বার—সব রেকর্ড বুকে লিখলে তবেই এ বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করার ছাড়পত্র মেলে।

বাড়ির গেট সর্বক্ষণ বন্ধ থাকে। ফ্ল্যাট-ওনাররা কেউ এলে গেট-কিপাররা সেটা খুলে দেয়।

আজ সাতটা পঁয়ত্রিশে হীরাচাঁদের গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গেট-কিপাররা গেট খুলতে শুরু করেছে, আচমকা মাটি ফুঁড়েই যেন একটা জিপ হীরাচাঁদের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায় এবং সেটার ভেতর থেকে একটা মার্ডারার হীরাচাঁদকে রিভলবারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজনেসম্যানটির মৃত্যু হয়।

দেশের পশ্চিম প্রান্তে হওয়ায় মুম্বাইতে সূর্যাস্ত হয় দেরিতে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সাতটা, সোয়া সাতটায়। কাজেই সাতটা পঁয়ত্রিশ কোনও রাতই নয়। তখনও হালকাভাবে আকাশে একটু আলো আলো ভাব লেগে ছিল। তাছাড়া কর্পোরেশনের তেজী ভেপার ল্যাম্পগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। রাস্তায় রীতিমতো ভিড়। কিন্তু কেউ কিছু বোঝার বা খুনিদের ভালো করে দেখার আগেই জিপটা নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকা হয়। খুনির খোঁজে এলাকার রাস্তাঘাট, সব বাড়ি, মার্কেট, মল, হোটেল, রেস্তোরাঁ সমস্ত চষে ফেলা হয়। সেই সময় সেখানে যারা ছিল তাদের অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিন্তু এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি যা দিয়ে খুনি সম্পর্কে কোনও ধারণা করা যায়।

শুধু কাছাকাছি দু'টো বাড়ির দু'জন পলকের জন্য মার্ডারারটাকে দেখেছিল। এদের একজন হলেন বয়স্ক গুজরাতি মহিলা। অন্যটি এক প্রতিবন্ধী কিশোরী। তারা মারাঠি।

গুজরাতি মহিলাটি ভাসা ভাসা ভাবে খুনির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। বরং কিশোরীটি যা বলেছে তা থেকে আবছা একটা চেহারা আঁচ করে নেওয়া যায়। যতক্ষণ না অন্য ক্লু পাওয়া যাচ্ছে, পুলিশ সেটা ধরেই আপাতত এগুচ্ছে। তবে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটা তোলাবাজদের কাজ।

সারা দেশে, বিশেষ করে মুম্বাইতে, অপরাধ জগতের লোকেরা কোটিপতিদের ফোন করে হুমকি দেয়, এই তারিখের ভেতর এই অঙ্কের টাকা অমুক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। পুলিশকে জানালে তার ফল হবে মারাত্মক। প্রাণের ভয়ে শতকরা নিরানব্বই জন গোপনে টাকা দিয়ে দেয়। যারা দেয় না বা পুলিশে রিপোর্ট করে, হুকুম না মানার জন্য তাদের পেছনে বন্দুকবাজ লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এদের কাউকে বাঁচাতে পারে, কাউকে পারে না। হীরাচাঁদ আদবানির কেসটা সেই রকমই।

মস্ত ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এ ডিনার খেতে বসেছিল শৌভিকরা। একধারে একটা সুদৃশ্য ক্যাবিনেটের মাথায় টিভিটা চলছে।

খবর শুনতে শুনতে খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফাঁকে ফাঁকে মৃত হীরাচাঁদকে দেখানো হচ্ছিল। তাজা রক্তে সারা শরীর ভেসে গেছে। একটা বুলেট মাথায় লেগেছিল। খুলি ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। বীভৎস দৃশ্য।

সংবাদপাঠ একসময় থেমে গেল। এখন টিভির পর্দায় অন্য প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। খবরের সঙ্গে হই হই করে গল্প করার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

একসময় সুনির্মল বললেন, 'রোজ না হলেও প্রতি সপ্তাহেই মুম্বাইতে এরকম মার্ডার দু'তিনটে করে ঘটছে। আন্ডার ওয়ার্ল্ডের ক্রিমিনালরা যে কী ভয়ঙ্কর এই সব ঘটনায় তা টের পাওয়া যায়। এখানে যাদের পয়সা আছে তাদের মহাবিপদ। সব সময় তারা ভয়ে ভয়ে থাকে। কখন যে টাকার জন্যে হুমকি দিয়ে তাদের কাছে ফোন আসবে, কে জানে।'

পরিমল বললেন, 'শুধু মুম্বাইতেই নাকি, ইন্ডিয়ার সব জায়গায় এক হাল।'

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বন্দুকবাজরা যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এমন একটা জায়গা নেই যেখানে লুটপাট, ডাকাতি, অপহরণ, খুনজখম চলছে না। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিমলরা ভীষণ উদ্বিগ্ন।

কিন্তু বাবা-মা-মামা-মামিদের কোনও কথাই কানে ঢুকছিল না শৌভিকের। তার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তে হাত দু'টো বার বার মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। ইস, যদি হীরাচাঁদ আদবানির খুনিটার চেহারার ঠিকঠাক বর্ণনা পাওয়া যেত, সে তার ছবি এঁকে

ফেলতে পারত। একবার ভাবল মিলিকে নিয়ে কালই একবার সান্তাক্রুজ থানায় চলে যায়। যে পুলিশ অফিসারটি হীরাচাঁদের খুনের তদন্ত করছেন, টিভির সংবাদপাঠিকা তাঁর নাম জানিয়ে দিয়েছেন। দিবাকর সাঠে। শৌভিকের ইচ্ছা, দিবাকরের সঙ্গে দেখা করে বলবে তাকে যেন দুই প্রত্যক্ষদর্শী সেই গুজরাতি মহিলা আর প্রতিবন্ধী মেয়েটির কাছে নিয়ে যায়। ওরা খুনির যা ডেসক্রিপশন দিয়েছে সেটা আধাখ্যাঁচড়া। সে নিজে তাদের সঙ্গে কথা বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও কিছু জেনে নেবে। তার ফলে হয়তো পুরোপুরি নির্ভুল না হলেও তার কাছাকাছি একটা মুখের ছবি আঁকা সম্ভব হবে। সেটা দিয়ে পুলিশ মার্ডারারটার হদিস পেলেও পেতে পারে।

কিন্তু সুরেখা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান শৌভিক লুকিয়ে লুকিয়ে থানায় যেতে চাইছে, তাকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলবেন। থানা টানার ত্রিসীমানায় ছেলে ঘেঁষুক, মা একেবারেই চান না।

শৌভিকরা, বিশেষ করে সে মুম্বাইতে এসেছিল আনন্দ করতে, কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেছে।

কখনও মা-বাবা-মামা-মামিদের সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছে ঠিকই, কখনও মিলি তাকে নিয়ে বেরুচ্ছে, কিন্তু হীরাচাঁদ আদবানির রক্তাক্ত চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে বার বার। সারাক্ষণ অস্থির অস্থির ভাব। যে দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে আবছা আবছা বর্ণনা পাওয়া গেছে তাই দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, কিছুই দাঁড়াচ্ছে না।

নাঃ, কিছুই করার নেই।

হীরাচাঁদ খুন হয়ে যাবার পর দু'দিন কেটে গেল। তারপর একেবারে টেলিপ্যাথির বাবা। শৌভিক যা চাইছিল ঠিক সেটিই ঘটে গেল।

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পর সবাই বেরুবার তোড়জোড় করছে, এই সময় সুনির্মলের কাছে ফোন এল। কিছুক্ষণ কথা বলে তিনি জানালেন, এখন বাইরে যাওয়া চলবে না। দিবাকর সাঠে নামে সান্তাক্রুজ থানার একজন পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, আধঘন্টার ভেতর তিনি খার-এ সুনির্মলের ফ্ল্যাটে চলে আসছেন। হঠাৎ তাঁদের এখানে আসার কারণ কী হতে পারে, জিগ্যেস করায় দিবাকর নাকি বলেছেন, সামনাসামনি বসে সমস্ত জানাবেন। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি।

দিবাকর সাঠের নামটা টিভির সংবাদপাঠিকার মুখে আগেই শুনেছে শৌভিক। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে তাঁর নাম হীরাচাঁদ হত্যার রিপোর্টের সঙ্গে সব খবরের কাগজেও বেরিয়েছে। তিনি আসছেন জানার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি শতগুণ বেড়ে যায় তার। কেন জানি মনে হয়, ওই খুনের প্যাঁচালো রহস্যের মধ্যে সেও জড়িয়ে যাবে।

ফোনটা আসার পর সময় আর কাটতে চাইছে না। ঘড়ির কাঁটা নড়ছে না, এক জায়গায় যেন স্থির হয়ে আছে।

ড্রইং রুমে সবাই দমবন্ধ করে বসে ছিল। তীব্র উত্তেজনায় পুরো ফ্ল্যাটটা থমথম করছে। খুনের ঘটনা নিয়ে যিনি তল্লাশি চালাচ্ছেন তিনি কী উদ্দেশ্যে এখানে আসতে চান, সেটা বুঝতে না পেরে অদ্ভুত এক অস্বস্তি সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

আধঘন্টা নয়, তেইশ মিনিটের মধ্যে দিবাকর সাঠে এসে গেলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। ছ'ফিটের কাছাকাছি হাইট। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল বেশির ভাগই কালো, মাঝে মাঝে সাদা ছোপ। পেটানো মজবুত চেহারা। নিখুঁত কামানো মুখ। পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম। হাতে ব্যাটন।

সাঠেকে ড্রইং রুমে এনে বসিয়ে সুনির্মল এবং পরিমল মুখোমুখি বসলেন। শৌভিক বসল মামার গা ঘেঁষে। সুরেখা, কল্পনা আর মিলি এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সবার চোখ দিবাকরের দিকে।

দিবাকর হেসে হেসে বললেন, 'আপনারা খুব অবাক হয়ে গেছেন তাই না? ভাবছেন আপনাদের নাম-ঠিকানা কী করে পেলাম?'

সুনির্মল বললেন, 'এগ্‌জাক্টলি। আমরা সত্যিই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। কলকাতা পুলিশের অফিসার অমরেশ দত্ত আমার একজন ভালো বন্ধু—' দিবাকর বলতে লাগলেন, কয়েক বছর আগে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে ইনভেস্টিগেশনের জন্য অমরেশ মুম্বাইতে এসেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর কোনও কারণে তিনি এই শহরে এলে দিবাকরের সঙ্গে দেখা করেন। দিবাকরও কলকাতায় গেলে অমরেশের অফিসে বা বাড়িতে যান। দু'জনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

হীরাচাঁদ আদবানির হত্যার ঘটনাটা টিভিতে দেখেছেন অমরেশ। মুম্বাই পুলিশ খুনির খোঁজে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে জানতে পেরে কাল রাতে দিবাকরকে ফোন করে জানিয়েছেন, তাঁর বন্ধু পরিমল দত্তগুপ্ত স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে মুম্বাই বেড়াতে গেছেন। উঠেছেন ওঁদেরই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র বাড়িতে। পরিমলের ছেলেটি জিনিয়াস। কারও চেহারার ডেসক্রিপশন শুনে সে নির্ভুল ছবি এঁকে ফেলতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিবাকর যেন ওঁদের সঙ্গে দেখা করেন। অমরেশের ধারণা, এতে কাজ হবে।

পরিমলরা দূরে কোথাও গেলে সেখানকার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার অমরেশকে দিয়ে আসেন। তাই দিবাকরের পক্ষে সুনির্মলদের ঠিকানা-টিকানা পেতে অসুবিধে হয়নি।

কথা বলতে বলতে বার বার দিবাকরের চোখ চলে যাচ্ছিল শৌভিকের দিকে। এবার সোজাসুজি তাকে বললেন, 'ইউ মাস্ট বি শৌভিক—'

সে যে শৌভিক সেটা বোঝার জন্য খুব একটা বুদ্ধির দরকার হয় না, ড্রইং রুমে সে-ই একমাত্র অল্প বয়সের ছেলে। বাকি সবাই বয়স্ক মানুষ। মিলির বয়স কম হলেও সে তো আর ছেলে নয়।

শৌভিক আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

দিবাকর বললেন, 'তোমার সাহায্য যে আমাদের খুব দরকার মাস্টার শৌভিক—'

শৌভিক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ত্রস্ত গলায় সুরেখা বলে ওঠেন, 'না না মিস্টার সাঠে, খুনখারাপির ভেতর দয়া করে ওকে জড়াবেন না।'

দিবাকর হকচকিয়ে গেলেন।—'আপনি?'

সুনির্মল বললেন, 'ও, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। ওর নাম সুরেখা, শৌভিকের মা, আমার বোন—' ড্রইং রুমে অন্য যারা রয়েছে সাঠের সঙ্গে তাদেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

দিবাকর সুরেখাকে বললেন, 'মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনার ওইটুকু ছেলেকে কি আমরা খুনি ধরার কাজে লাগাব? ও শুধু দু'জন আই-উইটনেসের সঙ্গে কথা বলে যদি পারে একটা ছবি—'

সাঠেকে শেষ করতে দিলেন না সুরেখা। জোরে জোরে হাত আর মাথা নাড়তে লাগলেন, 'মুম্বাইয়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ডের লোকেরা ভীষণ ডেঞ্জারাস। ওরা যদি টের পায় আমার ছেলে ছবি এঁকেছে, বুঝতেই পারছেন—'

শৌভিকের বুকের ভেতর একসঙ্গে পঞ্চাশটা হাতুড়ি পেটার মতো শব্দ হচ্ছিল। উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটি ধড়াস ধড়াস করছে। চ্যালেঞ্জ নিয়ে সে ছবিটা আঁকতে চায়। কিন্তু সুরেখা যেভাবে পাগলের মতো কাণ্ড করছেন তাতে ব্যাপারটা বোধহয় শেষ অব্দি ভেস্তেই যাবে।

তবে দিবাকর সাঠে একগুঁয়ে নাছোড়বান্দা লোক। তিনি কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। কথা দিলেন যেখানে খুন হয়েছে শৌভিককে তার ধারে-কাছে নিয়ে যাবেন না। যে গুজরাতি মহিলা এবং মারাঠি মেয়েটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া হবে না। মুম্বাইয়ের অন্য জায়গায় ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন। শৌভিকের আসল পরিচয়ও ওদের কাছে গোপন রাখা হবে।

সমস্ত শোনার পর পরিমল এবং সুনির্মলও বললেন, এতে বিপদের কারণ নেই। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে সুরেখাকে রাজি করানো হল। যদিও তাঁর ভয়টা পুরোপুরি কাটল বলে মনে হয় না।

ঠিক হল, আজ বিকেলে দিবাকর সাঠে ফের এসে শৌভিককে পালি হিল বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন। সঙ্গে পরিমল আর সুনির্মলও যাবেন। সেখানে দুই আই-উইটনেসের সঙ্গে দেখা হবে।

পালি হিলের নাম আগেই অনেক শুনেছে শৌভিক। খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনেও পড়েছে। এখানে হিন্দি ফিল্মের বিখ্যাত আর্টিস্টরা ছাড়াও বড় বড় বিজনেসম্যান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরাও থাকেন।

পালি হিলের উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় এবং ঢালে দারুণ দারুণ সব বাড়ি। বেশির ভাগই বাংলো ধরনের। ফাঁকে ফাঁকে বিশাল বিশাল আকাশ ছোঁয়া হাই-রাইজ।

বিকেলে এসে শৌভিকদের নিয়ে একটা বহুতল বাড়ির ফাঁকা ফ্ল্যাটে চলে এলেন দিবাকর। মস্ত ড্রইং রুমে সবাই বসলেন। ফ্ল্যাটটা কার কে জানে। তবে সেটা চমৎকার সাজানো-গোছানো। খুব সম্ভব যাঁরা কিনেছেন তাঁরা এখনও আসেননি।

শৌভিকরা পৌঁছুবার কিছুক্ষণ বাদে একজন মহিলাকে নিয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। দু'জনেই মাঝবয়সী। মহিলা খুব ফর্সা, গোলাকার মুখ, ভারী চেহারা। চোখে বাইফোকাল চশমা। শাড়ি পরার ধরন দেখে বোঝা যায়—গুজরাতি। তাঁর সঙ্গীটির পরনে অবশ্য শার্ট আর ট্রাউজার্স। শৌভিকদের সঙ্গে ওঁদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। মহিলার নাম মীরাবেন পারেখ, তাঁর সঙ্গী হলেন গোকুলদাস পারেখ। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী।

পরিচয়ের সময় শৌভিক এবং তার মামা আর বাবার সঠিক নাম মীরাবেনদের জানালেন না দিবাকর। শৌভিক হল আনন্দ। শৌভিক বার বার মীরাবেনের দিকে তাকাচ্ছিল। ওঁকে দেখেই সে আন্দাজ করে নিয়েছিল ইনি খুনের ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। মীরাবেনও তাকে লক্ষ করছিলেন। নিশ্চয়ই দিবাকর তার কথা ওঁকে আগেই বলেছেন।

কিছুক্ষণ মামুলি কথাবার্তার পর দিবাকর শৌভিক আর মীরাবেনকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে বসিয়ে ড্রইং রুমে ফিরে গেলেন। ভিড়ের ভেতর শৌভিকের হয়তো অসুবিধা হবে। তাই আলাদাভাবে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিলেন।

মীরাবেন ভালো ইংরেজি জানেন। প্রশ্ন করে করে তাঁর কাছ থেকে যেটুকু বার করা গেল তা এইরকম। নিহত হীরাচাঁদ আদবানি যে মাল্টি স্টোরিড বাড়িটায় থাকতেন, তার নাম 'স্কাইলার্ক'। 'স্কাইলার্ক'-এর ডান পাশের বাড়ি 'গগনদীপ'-এর পাঁচতলার একটা ফ্ল্যাটে মীরাবেনরা থাকেন। ঘটনার সময় রাস্তার দিকের একটা ঘরের জানালার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় তাঁর চোখে চশমা ছিল না। পাঁচতলার হাইট থেকে মার্ডারারকে স্পষ্ট দেখতে পাননি। লোকটার মুখ লম্বা কি গোল, চুল চোখ কপাল কেমন, জোর দিয়ে বলতে পারবেন না। তবে খুনিটা বেশ ঢ্যাঙা আর গালে অল্প অল্প দাড়ি আছে।

মীরাবেন পুলিশকে যা জানিয়েছিলেন তাই বললেন। শৌভক স্কেচপেন, পেন্সিল এবং কাগজ নিয়ে এসেছিল। মীরাবেনের বিবরণ অনুযায়ী কাগজে একটু আধটু লাইন টাইন টানল, কিন্তু না, খুনিটার স্পষ্ট কোনও ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠছে না।

মীরাবেনকে নিয়ে ড্রইং রুমে ফিরে এল শৌভিক।

মীরাবেনদের কষ্ট দিয়ে পালি হিলে টেনে আনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাঁদের বিদায় দিয়ে সেল ফোনে দু' নম্বর প্রত্যক্ষদর্শীর বাবাকে ধরলেন দিবাকর। বোঝা যাচ্ছে, আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। মীরাবেনদের পর ওঁদের ডাকা হবে।

কিছুক্ষণ বাদে বেশ সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক এলেন। সঙ্গে তেরো চোদ্দ বছরের সালোয়ার কামিজ পরা সুশ্রী এক কিশোরী। তার ডান পা'টা কোনও কঠিন অসুখে সরু হয়ে গেছে। তাই ক্রাচে ভর দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়।

মেয়েটি আর তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন দিবাকর। রোহিণী সুরকার আর মহেশ্বর সুরকার। রোহিণী একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। তার বাবা মহেশ্বর মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের একজন বড় অফিসার। শৌভিকদের আসল নামগুলো জানানো হল না, মীরাবেনদের যা বলা হয়েছিল ওঁদেরও তাই বলা হল।

খানিক আগে দিবাকর মীরাবেন আর শৌভিককে যে ঘরটায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এবার সেখানেই শৌভিক আর রোহিণীকে মুখোমুখি বসিয়ে দিয়ে ড্রইং রুমে ফিরে গেলেন।

দু'জনের মাঝখানে একটা টেবল। সেটার ওপর কাগজ, স্কেচপেন, রঙের বাক্স, তুলি-টুলি সাজিয়ে নিয়ে কাজের কথায় চলে গেল শৌভিক। শুরুতেই জেনে নিল হীরাচাঁদ আদবানিদের 'স্কাইলার্ক' বিল্ডিংটার বাঁ পাশের বাড়িটা রোহিণীদের। সেটাও একটা হাই-রাইজ। নাম 'মেরিগোল্ড'। 'মেরিগোল্ড'-এর তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে তারা থাকে।

এবার আরম্ভ হল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। রোহিণী চটপট উত্তর দিতে থাকে। সে জানায়, ঘটনার সময় সে তাদের ফ্ল্যাটের রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে কাঠের পাটাতন লাগানো একটা দোলনার বসে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছিল। (মহারাষ্ট্রে অনেক বাড়িতে এই ধরনের দোলনা আছে।)

হীরাচাঁদ আদবানিরা রোহিণীদের প্রতিবেশী তো বটেই, সে তাঁকে আঙ্কল বলে, তাঁর স্ত্রীকে আন্টি। ওঁদের ছেলেমেয়েরা তার বন্ধু।

দোল খেতে খেতে রোহিণী দেখতে পায় হীরাচাঁদের গাড়ি ওঁদের 'স্কাইলার্ক' বিল্ডিংয়ের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গেট-কিপার যাতে গেট খুলে দেয় সেজন্য শোফার সমানে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এইসময় একটা জিপ হীরাচাঁদের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

এই সব খবর টিভির সংবাদপাঠিকা সেদিনই জানিয়ে দিয়েছেন। শৌভিক বলল, 'এ সব আগেই শুনেছি। তুমি মার্ডারারটা সম্বন্ধে বল—'

রোহিণী বলতে লাগল। তখন এলাকাটা গমগম করছে। চারদিকে প্রচুর আলো। সে দেখতে পায়, একটা লোক জিপে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে। হীরাচাঁদ তাঁর গাড়ির যে ধারে বসে ছিলেন সেদিকের জানালা খোলা ছিল। আচমকা জিপের লোকটা তার জিনসের পকেট থেকে রিভলভার বার করে হীরাচাঁদকে পর পর পাঁচবার গুলি করে।

তেতলার ব্যালকনিটা চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচুতে। রোহিণী সেখান থেকে খুনিটাকে দেখতে পেয়েছিল। বসে ছিল বলে তার হাইট বোঝা যাচ্ছিল না। তবেই লম্বাই হবে।

শৌভিক বলল, 'হাইটের দরকার নেই। বয়স কত হতে পারে?'

'ম্যাক্সিমাম চল্লিশ-বেয়াল্লিশ।'

'ঠিক আছে। পুলিশকে তুমি লোকটার ডেসক্রিপশন দিয়েছ। তবু জিগ্যেস করছি। মুখটা কেমন? লম্বা ধরনের, না গোল? তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ভেবে ভেবে বল—'

চোখ বুজে, ঠোঁট টিপে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে রোহিণী। তারপর বলে, 'চৌকো টাইপের।'

'গাল?'

'ভাঙা। অল্প অল্প দাড়ি আছে।'

দাড়ির কথা মীরাবেনও বলেছেন। শৌভিক বলল, 'নাকটা কেমন?'

রোহিণী বলল, 'থ্যাবড়া। দু'পাশে অনেকটা ছড়ানো।'

আরও জানা গেল, খুনিটার জোড়া লোমশ ভুরু, পুরু কালচে ঠোঁট, চাড়া দেওয়া গোঁফ। কপালটা উঁচু, ঢিবির মতো। চোখ ভেতরে ঢোকানো, সে দু'টোর তলার হাড় ঠেলে উঠেছে।

চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করতে থাকে শৌভিকের। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রোহিণীর কাছ থেকে যা বার করা গেছে তা দিয়ে একটা ছবি দাঁড় করানো যেতে পারে। রোহিণী আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে অ্যাটাচড বাথ থেকে মগে করে জল নিয়ে এল সে। তারপর স্কেচপেন দিয়ে কাগজের ওপর রোহিণীর বর্ণনা অনুযায়ী খুনির মুখটা আঁকতে লাগল।

রোহিণী টেবলের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তার চোখ গোল হয়ে গেছে। আসলে খুনিটার চেহারা তার পরিষ্কার মনে আছে। তার সঙ্গে শৌভিকের ছবির অনেকটাই মিল রয়েছে।

শৌভিক জিগ্যেস করল, 'কি, ঠিক, হচ্ছে?'

রোহিণী বলল, 'অলমোস্ট। তবে নাকটা আরেকটু ফ্ল্যাট হবে, কপাল আরও উঁচু—ও হ্যাঁ, ওপরের ঠোঁটটার মাঝখানটা লম্বালম্বি কাটা, তাই দু ফাঁক হয়ে আছে। আর ডান কানের লতিটা নেই—' মনে করে করে বেশ কিছু খুঁটিনাটি জানিয়ে দিতে লাগল।

রোহিণী বলে যাচ্ছে আর শৌভিক ছবিটায় অদলবদল করে চলেছে।

আধঘন্টার মধ্যে মুখের স্কেচটা হয়ে গেল। তারপর তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে সেটা রং করে ফেলল শৌভিক।

শুনে শুনে কেউ যে এভাবে ছবি আঁকতে পারে, দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না রোহিণীর। শৌভিক জানতে চাইল, 'এবার হয়েছে?'

রোহিণী অবাক। তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজিত। প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে সে, 'পারফেক্ট—'

'চল, ও ঘরে যাই।'

ড্রইং রুমে এসে ছবিটা দিবাকরের হাতে দিতে তিনি একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন। বিস্ময় কেটে এলে বললেন, 'এর মধ্যে হয়ে গেল!'

হাসিমুখে শৌভিক বলল, 'হল তো। রোহিণী আমাকে খুব হেল্প করেছে, নইলে আঁকতে পারতাম না। ওর স্মৃতিশক্তি আর অবজারভেশন পাওয়ার দারুণ। খুনিটার চেহারার ডিটেলস ও মনে করে রেখেছে।'

রোহিণী লাজুক একটু হাসল শুধু। কিছু বলল না।

ছবিটার দিকে চোখ রেখে দিবাকর বলতে লাগলেন, 'আজ থেকেই লোকটার খোঁজ শুরু করা হবে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ক্রিমিনালদের ফোটো থাকে। দেখব এর কোনও ফোটো টোটো আছে কিনা। থাকলে নাম-টাম, তার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি, সব জানতে পারব। একবার হদিস পেলে, আশা করি, ওকে ধরে ফেলা যাবে।'

দিবাকরের কাছ থেকে ছবিটা চেয়ে নিলেন সুনির্মল। তাঁর হাত থেকে সেটা পরিমল আর মহেশ্বরের হাত ঘুরে ফের দিবাকরের কাছে চলে আসে।

দিবাকর পরিমলকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা তো মুম্বাইতে ছুটি কাটাতে এসেছেন। কাছাকাছি আর কোথাও যাবার প্ল্যান আছে কি?'

পরিমল বললেন, 'ভেবেছিলাম গোয়া আর পুনেটা ঘুরে আসব। কিন্তু—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দিবাকর বললেন, 'এবার গোয়া টোয়া থাক। পরে কখনও ওখানে ঘুরতে যাবেন। কবে কলকাতায় ফিরতে হবে?'

'দশমীর পরের পরদিন।'

'এই কটা দিন আপনারা মুম্বাইতেই থাকুন। হয়তো একটা সুখবর দিতে পারব।'

'কী সুখবর?'

'এখন বলছি না। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সবাই উঠে পড়ল।

তারপর সময় কেটে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে। মামা-মামিদের সঙ্গে মুম্বাইয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অব্দি ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখতে লাগল শৌভিকরা। স্নান-টান করে দশটা সাড়ে-দশটায় তারা বেরিয়ে পড়ে। ফিরতে ফিরতে রাত দুপুর। খাওয়া দাওয়া বাইরে। অষ্টমীর দিন তো তারা ফিরলই না। শিবাজী পার্কে সেদিন সারারাত গানের ফাংশান ছিল। মুম্বাইয়ের নাম-করা গায়ক-গায়িকারা তো ছিলেনই, কলকাতা থেকেও বাংলা গানের আর্টিস্টদেরও প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

চারদিকে এত যে ছোটাছুটি, কিন্তু শৌভিকের মাথায় একটাই চিন্তা। মা-বাবা-মামা-মামি, এমনকি মিলিদিরও পকেটে বা ব্যাগে সেল ফোন রয়েছে। সে ভাবে, এই বুঝি দিবাকরের ফোন এল। মাঝে মাঝেই ফোনগুলো বেজে ওঠে, কিন্তু যাঁরা ফোন করেন তাঁদের কেউ দিবাকর সাঠে নন।

·

একসময় ছুটি ফুরিয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে এল শৌভিকরা। তাদের স্কুলে ছুটিছাটা খুব কম। লক্ষ্মীপুজোর পরই ক্লাস শুরু হয়ে গেল। লেখাপড়া, স্কুল, প্রাইভেট টিউশন, ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু ক্রিকেট—এইভাবেই চলতে লাগল। সেই ভাবনাটা অবশ্য মাথায় চেপে বসে আছে। দিবাকর সাঠে এখনও কোনও খবর দেননি। তার আঁকা ছবিটা নিয়ে কী করলেন, তাও জানা গেল না। মামা-মামিদের সঙ্গে সপ্তাহে কম করে ফোনে তিন দিন তার কথা হয়। দিবাকর নাকি ওঁদেরও কিছু জানাননি।

চোখের পলকে দু'টো মাস কেটে গেল। ক'দিন বাদেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। এখন আর কোনও দিকে নজর নেই শৌভিকের। সারাক্ষণ শুধু পড়া আর পড়া।

একদিন সন্ধেবেলায় প্রাইভেট টিউটর সবে একগাদা অঙ্ক কষিয়ে চলে গেছেন, মাথা টনটন করছে, সেই সময় মুম্বাই থেকে মামার ফোন এল। দারুণ খুশি, দারুণ উচ্ছ্বসিত তিনি। বললেন, 'দিবাকর সাঠে একটু আগে আমাকে জানিয়েছেন, তোর ছবিটা পাওয়ার পর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে খোঁজ করে সেই খুনিটার ফোটো পায়। সে ভাড়াটে খুনি। টাকা নিয়ে সে খুন করে। এটাই তার পেশা। হীরাচাঁদ আদবানিকে মার্ডার করে সে মুম্বাই থেকে পালিয়ে যায়। দিবাকররা তাকে ধরার জন্য চারদিকে জাল পাতেন। কিন্তু ক্রিমিনালটা এক

জায়গায় থাকছিল না। কখনও নাগপুর, কখনও পুনে, কখনও শোলাপুর, এই করে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নাসিকে সে ধরা পড়ে। মামা আরও জানান, লোকটার নাম মজিদ। তাকে কাজে লাগিয়েছিল মুম্বাই অপরাধ জগতের এক শাহানশা— অম্বালাল পাতিল। তার কাজ হল বড় বড় বিজনেসম্যানদের হুমকি দিয়ে, মৃত্যুভয় দেখিয়ে, লাখ লাখ টাকা আদায় করা। অম্বালালও তার গ্যাংসুদ্ধ ধরা পড়েছে।

মহারাষ্ট্র সরকার অনেকদিন ধরে অম্বালালের খোঁজ করছিল। তাকে ধরার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। শৌভিক মজিদের ছবিটা এঁকে না দিলে তার হদিসই পাওয়া যেত না। টাকার সঙ্গে একটা সোনার মেডেলও দেওয়া হবে শৌভিককে। ছবি আঁকায় সাহায্য করার জন্য রোহিণী পাবে পঁচিশ হাজার টাকা আর একটা মেডেল। সেটাও সোনার, তবে একটু ছোট।

মামা বলতে লাগলেন, 'কী সুখবর দিবাকর সাঠে দিতে চেয়েছিলেন, এবার বুঝতে পারছিস তো? কনগ্র্যাচুলেশন। তোর মাকে ফোনটা দে—'

সুরেখা আর পরিমলকেও সব জানিয়ে দিলেন মামা।

কথা শেষ হলে সুরেখা ছেলের দিকে তাকালেন। শৌভিক লক্ষ করল, মায়ের ভুরু কুঁচকে আছে কিন্তু ঠোঁটে হাসি। সে বুঝতে পারে, ওই হাসিটা গর্বের।

সুরেখা বললেন, 'পুরস্কার আর মেডেল পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেও না। আসল ব্যাপারটা যেন মাথায় থাকে। এবার অ্যানুয়ালে নাইন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস চাই।'

জাফরকে দেখার পর

স্বর্ণালী একটা নাম-করা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ক্লাস টেনে। বয়স পনেরো। ওর ডাক-নাম সোনু। ওরা থাকে বাই-পাসের ধারে একটা বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্সে। মস্ত সবুজ মাঠ ঘিরে সবসুদ্ধ চোদ্দটা সাততলা টাওয়ার। প্রতিটি টাওয়ারের গ্রাউন্ড ফ্লোর ফাঁকা। সেখানে গ্যারাজ। তার ওপর দোতলা থেকে সাত-তলা অব্দি সব ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট। অর্থাৎ একেকটা বিল্ডিংয়ে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা চব্বিশ। চোদ্দটা টাওয়ারে কতগুলো ফ্ল্যাট সেটা চব্বিশ দিয়ে গুণ করলেই বেরিয়ে পড়বে। তিনশো ছত্রিশ। এই হাউসিং কমপ্লেক্সটার নাম 'গ্রিনল্যান্ড পার্ক'।

মাত্র ছ'বছর হল, এই নতুন ঝাঁ-চকচকে আবাসনটায় এসেছে স্বর্ণালীরা। ওদের ফ্ল্যাটটা পাঁচ নম্বর টাওয়ারের চার তলায়। এখানে তার বয়সি বা কাছাকাছি বয়সের প্রচুর ছেলেমেয়ে রয়েছে। ওরা সবাই তার বন্ধু।

স্বর্ণালীর বাবা একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির বিরাট একজিকিউটিভ। মা চাকরি করতেন ব্যাঙ্কে। বছর খানেক আগে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট অর্থাৎ স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। ওরা দুই বোন। সে ছোট। দিদি রিমি, যার ভালো নাম ঈশিতা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি নিয়ে পড়ে। তার সেকেন্ড ইয়ার।

এখন স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। স্বর্ণালী তাদের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে কমপ্লেক্সের বড় মাঠটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ছেলেবন্ধুরা চারটে টিম করে মাঠের দু'ধারে হই হই করে ক্রিকেট খেলছে। আজকাল শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুধু ক্রিকেট। এই কমপ্লেক্সই বা বাদ যাবে কেন? এখানেও সারা বছর টেস্ট ম্যাচ কি ওয়ান-ডে সিরিজ। স্বর্ণালীর মেয়েবন্ধুরা মাঠের মাঝখানে খেলছে ব্যাডমিন্টন।

কিন্তু স্বর্ণালী যে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে মাঠে নেমে পড়বে, তার উপায় নেই। ক'দিন ধরেই ভাইরাল ফিভারে ভুগছে সে। আজ অবশ্য জ্বর অনেকটাই কম। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে-খেয়ে শরীর ভীষণ কাহিল। মা নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন, পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া অব্দি ফ্ল্যাট থেকে এক পাও বাইরে বেরুনো চলবে না। করুণ চোখে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছাড়া কী-ই বা করতে পারে স্বর্ণালী?

এখন ছ'টার মতো বাজে। সূর্য উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপারগুলোর ওধারে নেমে গেছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে চারিদিক। একটু পরেই ঝপ করে সন্ধে হয়ে যাবে।

নিচের টেস্ট ম্যাচ আর ব্যাডমিন্টন আজকের মতো বন্ধ হতে বেশি দেরি নেই। স্বর্ণালী আস্তে-আস্তে উঠে ফ্ল্যাটের ভেতর নিজের ঘরে চলে আসে।

তাদের ফ্ল্যাটে তিনটে বেডরুম। একটা মা-বাবার, একটা দিদির, একটা তার। প্রতিটি ঘরেই অ্যাটাচড বাথ। তা ছাড়া রয়েছে বিরাট একটা হল, যার একদিকে সোফাটোফা দিয়ে সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা, আরেক দিকে ডাইনিং টেবল। তা ছাড়া আছে কিচেন, স্টোর ইত্যাদি।

বাড়ির কাজের মেয়ে মমতামাসি এর মধ্যেই ঘরে ঘরে, মাঝখানের হল-এ আলো জ্বেলে দিয়েছে। তার তিন কুলে কেউ নেই। স্বর্ণালীদের কাছেই সে থাকে।

স্বর্ণালীর বেডরুমটা খাট, পড়ার টেবল, বইয়ের আলমারি, এইসব দিয়ে সাজানো। তা ছাড়া খাটের কাছাকাছি সরুমতো উঁচু টেবলে রয়েছে ছোট একটা টিভি। তার মামা এটা তাকে গিফট করেছেন।

স্বর্ণালী পড়াশোনায় বেশ ভালো। মেধাবী বলতে যা বোঝায় তাই। অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে দেখা যায় তার নাম প্রথম দু'জনের মধ্যে রয়েছে। স্কুলের টিচারদের আশা, মাধ্যামিক সে দারুণ কিছু একটা করবে। ব্যাডমিন্টন আর টেবল টেনিসটা চমৎকার খেলে। নানা বিষয়ে তার প্রচণ্ড কৌতূহল। টেক্সট বুক তো আছেই, হাতের সামনে যে বই পায়, পড়ে ফেলে। তবে ডিটেকটিভ গল্পের দিকে ঝোঁকটা একটু বেশি। সবদিক থেকেই সে ঝকঝকে, চৌকশ মেয়ে।

স্বর্ণালীর মামা অরিজিৎ মিত্র ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের ক'টি উপাজতি—মিকির, খাসিয়া, মিজো থেকে শুরু করে আসামের বিহু উৎসব, দণ্ডকারণ্যের বন্য প্রাণী, পাঞ্জাবের ভাংরা নাচ, পুরুলিয়ার ছৌ থেকে কলকাতার চিনা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এমন নানা বিষয়ে চল্লিশটার ওপর ছবি করেছেন। ছোট ছোট ছবি, যাকে বলা হয় ডকুমেন্টারি বা 'শর্ট ফিল্ম'। কোনওটা তিরিশ মিনিটের, কোনওটা চল্লিশ মিনিটের, কোনওটা বা এক ঘণ্টার।

স্বর্ণালীর মতামতের ওপর অরিজিতের গভীর আস্থা। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ছবির বিষয় ঠিক করেন। চিত্রনাট্য লেখা হলে তাকে শোনান। স্বর্ণালী কোনও অংশ বাদ দিতে বা বদলাতে বললে তক্ষুনি তা করে ফেলেন। শুটিং হবার পর যদি সে কোনও খুঁত ধরিয়ে দেয় সেটা শুধরে নেন। এর ফলে ছবিগুলোর স্ট্যান্ডার্ড অনেক ভালো হয়ে যায়। তার কথামতো অদলবদল করে তাঁর সাত-আটটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম জাতীয় পুরস্কার তো বটেই, বিদেশেও প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। অরিজিৎ তাই খুশি হয়ে ভাগনীকে দামি টিভি সেটটা উপহার দিয়েছেন।

ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে স্বর্ণালী। জ্বরের জন্য ক'দিন পড়াশোনা বন্ধ আছে। আজকের দিনটাও বইটই নিয়ে বসবে না। কাল থেকে উঠে পড়ে লাগতে হবে। সামার ভ্যাকেশনের পরেই হাফ-ইয়ারলি। তার চার মাস বাদেই টেস্ট।

শুয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ পড়ার টেবলে সেই ক্যাসেটটা চোখে পড়ল স্বর্ণালীর। সে জ্বরে পড়ার ঠিক আগে-আগে ওটা দিয়ে গিয়েছিলেন অরিজিৎ। কলকাতার নানা বস্তি এলাকা ঘুরে সেখানকার মানুষজন, তাদের অজস্র সমস্যা নিয়ে মামা একটা পঞ্চাশ মিনিটের ডকুমেন্টারি ছবি বানিয়েছেন, ওটা তারই ক্যাসেট।

অরিজিৎ বলেছিলেন, 'আমি ক'দিনের জন্যে তামিলনাড়ু যাচ্ছি। তুই ক্যাসেটটা দেখে রাখিস। ফিরে এসে তোর ওপিনিয়নটা জেনে নেব।'

ক্যাসেটটার কথা মাথাতেই ছিল না স্বর্ণালীর। সে ঠিক করল, আজ যখন পড়াই হচ্ছে না, জ্বরের দাপটও কমে গেছে, ওটা দেখেই ফেলা যাক।

বিছানা থেকে নেমে ক্যাসেটটা তার নিজস্ব টিভিতে ঢুকিয়ে চালিয়ে দিল স্বর্ণালী। স্ক্রিনে মিউজিকের সঙ্গে ছবি ফুটে উঠতে শুরু করল। বস্তির দম-আটকানো নোংরা পরিবেশ, চারপাশে আবর্জনার ডাঁই, জিলিপির প্যাঁচের মতো সরু-সরু প্যাচপেচে গলি, কর্পোরেশনের জলের কলের সামনে লম্বা লাইনে মেয়েমানুষদের তুমুল ঝগড়াঝাঁটি, চিৎকার, গালাগাল, অগুনতি বাচ্চাকাচ্চার মারপিট কান্নাকাটি, থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে বা বসে গুলতানি করা পুরুষমানুষগুলোর ক্ষয়াটে চেহারা, এমনি নানা দৃশ্য।

মিনিট দশেক চলার পর স্বর্ণালী দেখতে পেল, এক জায়গায় কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে থিকথিকে ভিড়। রাস্তার মাঝখানে উঁচু টুলের ওপর ক্যারম বোর্ড বসিয়ে ক'টি যুবক ক্যারম খেলছে। তাদের ঘিরে বিরাট জটলা; হইহই করে দর্শকরা খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। আরেক দিকে লাইন দিয়ে দোকানপাট। কোনওটা মুদিখানা, কোনওটা চায়ের দোকান, কোনওটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের, কোনওটা মুড়ি তেলেভাজার, কোনওটা মাংসের। দোকানগুলোর মাথায় ঝরঝরে অ্যাসবেস্টস কি টিনের ছাউনি।

চায়ের দোকানের সামনে একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে তিন চারটে লোক চা খাচ্ছে, সেই সঙ্গে কথাও বলে চলেছে অনর্গল। ওদের ভেতর একজনের মুখের ওপর চোখ আটকে গেল স্বর্ণালীর। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তামাটে রং। চৌকো মুখ। ডান গালে কাটা দাগ। গালে অল্প অল্প দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কপালের একধারে বাদামি আব। চোখের মণিদু'টো কটা।

খুব চেনা লাগছে স্বর্ণালীর। শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গেল তার। ক্যাসেট বন্ধ করে ফের নতুন করে চালাল। এভাবে বার পাঁচেক দৃশ্যটা দেখল সে। তারপর আচমকা মনে পড়ে গেল। মাস ছয়েক আগে আসানসোলে দুপুরবেলা ডাকাতের দল ওখানকার বিরাট একটা ব্যাঙ্কে হানা দিয়ে পনেরো লাখ টাকা লুট করে, গুলি চালিয়ে, বোমা ফাটিয়ে, পালিয়ে যায়। এমন দুঃসাহসিক এবং এত বড় মাপের ব্যাঙ্ক ডাকাতি আগে আর কখনও ওই এলাকায় হয়নি। এই নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ডাকাতদের হদিস তো পায়ইনি, একটা টাকাও উদ্ধার করতে পারেনি।

সেই সময় খবরের কাগজে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তিন ক্রিমিনালের ফোটো ছাপিয়েছিল। টিভিতেও তাদের ছবি দেখানো হয়েছিল। এরা দাগী আসামী। আগেও জেলটেল খেটেছে। পুলিশ এদের ফোটো তুলে দামি সম্পত্তির মতো নিজেদের মহাফেজখানায় রেখে দিয়েছে। পুলিশের ধারণা, ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা ওদেরই কাজ।

পুলিশের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, কেউ ওই অপরাধীদের সন্ধান দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কও দেবে পঞ্চাশ হাজার। যে খোঁজ দেবে তার পরিচয় গোপন রাখা হবে। কেননা এই ধরনের ক্রিমিনালরা ভীষণ হিংস্র। পরে হয়তো মারাত্মক প্রতিহিংসা নেবে।

স্বর্ণালীর মাথায় একটা কম্পিউটার বসানো আছে। তার মেমোরিতে ওই তিনটে ছবি থেকে গিয়েছিল। তাদেরই একজন কপালে আবওলা ওই লোকটা। কী যেন নাম? স্মৃতির ভেতর একটু হাতড়াতেই পাওয়া গেল—জাফর। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ক্রিমিনালটা তা হলে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে?

অরিজিৎ বলেছিলেন, নানা বস্তি ঘুরে তিনি এই ডকুমেন্টারির ছবি তুলেছেন। কলকাতায় কত যে স্লাম এরিয়া তার লেখাজোখা নেই। কত হতে পারে? পাঁচশো? সাতশো? হাজার, না তারও বেশি? স্বর্ণালীর জানা নেই। কোন বস্তির চায়ের দোকানের সামনে অরিজিতের ক্যামেরায় জাফর ধরা পড়েছে, কে বলবে। তামিলনাড়ু থেকে মামা না ফেরা অব্দি জানার উপায় নেই।

ক্যাসেটের বাকি অংশটা আর দেখল না স্বর্ণালী। টিভি থেকে সেটা বার করে টেবলে রেখে দিল। সে টের পাচ্ছিল তীব্র উত্তেজনা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছ'মাস ধরে পুলিশ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, অথচ স্বর্ণালী আচমকা, নিজের ঘরে বসে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতের খোঁজ পেয়ে গেল।

এখন কী করবে সে? কী করা উচিত? মা-বাবাকে বললে খুন করে ফেলবেন। স্বর্ণালী ডাকাত খুনিদের নিয়ে মাথা ঘামাক, তাঁরা একেবারেই তা চান না। এর আগেও দু-একটা ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছিল। বাবার এক বন্ধু সমরেশ বসাক লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে বড় অফিসার। প্রায়ই তাদের ফ্ল্যাটে বাবা এবং মায়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসেন। তবে স্বর্ণালীর সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ভালোবাসেন। কারণ সমরেশ বসাককে, যাকে সে সমরেশকাকু বলে, তিনটে বড় বড় চুরির ঘটনায় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিল। তারপর থেকে জটিল কোনও কেস হাতে এলে স্বর্ণালীর সঙ্গে আলোচনা করে যান। এই ব্যাপারটা মায়ের ভীষণ অপছন্দ। গম্ভীর মুখে বলেন, 'এটা ঠিক হচ্ছে না সমরেশদা। সোনু একটা মেয়ে। প্লিজ, ওকে এইসব মার্ডার-টার্ডারের দিকে টানবেন না।'

স্বর্ণালীর মায়ের নাম ভারতী। সমরেশ হেসে হেসে বলেন, 'সোনু শুধু মেয়ে নয় ভারতী বউদি, এক্সট্রা-অর্ডিনারি মেয়ে। ওকে তো আর ক্রিমিনালদের ধাওয়া করতে বলছি না। ঘরে বসে বুদ্ধি দিয়ে আমাকে হেল্প করছে। আর আমি পটাপট চোর-ডাকাত ধরে ফেলছি।'

মায়ের ভুরু কুঁচকে যায়। থমথমে মুখে বলেন, 'আপনি কী যে করেন সমরেশদা! আমরা সবসময় টেনশনে থাকি।'

সমরেশ বোঝান, 'সোনু কত বড় সোশাল ওয়ার্ক করছে, সেটা ভেবে দেখুন। ক্রিমিনালরা ধরা না পড়লে মানুষের আরও ক্ষতি হয়ে যাবে।'

স্বর্ণালীর বাবা বুদ্ধদেব সেনগুপ্তও প্রচুর আপত্তি জানান। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সমরেশ হেসে হেসে সমস্ত উড়িয়ে দেন।

স্বর্ণালী ভাবতে লাগল, জাফরের ব্যাপারটা মা-বাবাকে জানানো যাবে না। দিদিকে বলা না-বলা সমান। বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা আর পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা ছাড়া অন্য কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। তা ছাড়া যেটা মহা বিপদ তা হল ওর পেটে কথা থাকে না। কিছু একটা শুনলে ঢাকঢোল পিটিয়ে চেনাজানা সব্বাইকে জানিয়ে দেবে। প্রথমেই মা-বাবার কানে তুলবে। সমরেশকাকুকে অবশ্য ফোন করে বলা যায়।

স্বর্ণালীর নিজস্ব একটা মোবাইল ফোন রয়েছে। সেটা থাকে তার পড়ার টেবলের ড্রয়ারে। উঠে ফোনটা বার করতে যাবে, হঠাৎ খেয়াল হল, জাফর কোন বস্তিতে থাকে, ছবি দেখে তা বোঝার উপায় নেই। কেননা সব বস্তির চেহারাই প্রায় একরকম। কলকাতার শত শত বস্তির কোনটায় জাফরকে খুঁজতে যাবেন সমরেশকাকুরা? তাঁদের এ-বস্তি সে-বস্তি হাতড়ে বেড়াতে হবে। খবরটা কোনওভাবে জাফরের কানে পৌঁছুলে তক্ষুনি উধাও হয়ে যাবে সে।

না, এখন থাক। মামা ফিরে এলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, জাফর যেখানে আছে সেই বস্তিটা ঠিক কোথায়? সেটার নামই বা কী? ঠিকঠাক সমস্ত জানতে পারলে আচমকা পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে জাফরকে ধরে ফেলতে পারবে।

দিনসাতেক বাদে মামা অর্থাৎ অরিজিৎ তামিলনাড়ু থেকে ফিরে এলেন। এর মধ্যে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে স্বর্ণালী। মামার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল সে।

স্বর্ণালীর মামার বাড়ি উত্তর কলকাতায়। একসময় বিরাট বনেদি পরিবার ছিল। প্রচুর লোকজন। এখন কেউ নেই। দাদু-দিদা কবেই মারা গেছেন। অন্য যারা ছিল তারাও নেই। মস্ত সেকেলে বাড়িতে অরিজিৎ একা থাকেন। অবশ্য তাঁকে দেখাশোনার জন্য রয়েছে একটি আধবয়েসি লোক। যুধিষ্ঠির। মামার দেখাদেখি স্বর্ণালী তাকে বলে যুধিষ্ঠিরদা।

অরিজিৎ স্বর্ণালীর মায়ের একমাত্র ভাই। বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। কত হবে? চল্লিশ একচল্লিশ। বিয়েটিয়ে করেননি। শর্ট ফিল্ম করাটা তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সারা বছরই দেশের নানা জায়গায় ছুটে বেড়ান। যেটুকু সময় কলকাতায় থাকেন তার বেশির ভাগটাই স্বর্ণালীদের বাড়িতে কাটিয়ে যান। দারুণ আমুদে মানুষ। তিনি আসামাত্র হই হই শুরু হয়ে যায়।

এবারও তাঁকে পেয়ে সবাই ঘিরে বসল। প্রচুর খাবার এবং কফির সঙ্গে আড্ডা জমে উঠল। তামিলনাড়ুর নানা এলাকা ঘুরে এসেছেন। ওঁর ইচ্ছা, ওখানকার সুন্দর সুন্দর টুরিস্ট স্পটগুলো নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করবেন। তবে আরও দু-একবার সেখানে যেতে হবে। কিছু তথ্য জোগাড় করে এসেছেন, সে-সব যথেষ্ট নয়, আরও অনেক মালমশলা চাই। ঘোরাঘুরি করতে করতে অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন।

এদিকে উসখুস করছিল স্বর্ণালী। জাফরের ব্যাপারটা তাকে অনবরত খুঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মায়ের সামনে মুখ ফুটে তা বলার উপায় নেই। কেননা সে গোয়েন্দাগিরি বা ফিল্ম নিয়ে মাথা ঘামাক, তার মা ভারতী কোনওটাই পছন্দ করেন না। কিন্তু জাফর সম্পর্কে না জানলেই নয়। কথাটা কীভাবে তোলা যায়?

সুযোগটা মামাই করে দিলেন। জমজমাট আড্ডার ফাঁকে হঠাৎ স্বর্ণালীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কি রে, ক'দিন তো জ্বরে ভুগে উঠলি। তার মধ্যে স্লামের ওপর আমার সেই ডকুমেন্টারিটা দেখতে পেরেছিস? তোর ওপিনিয়নটা খুব দরকার।'

হালকা মেজাজে গল্পটল্প হচ্ছিল। তার ভেতর অরিজিৎ ফিল্ম টেনে আনায় ভারতী বিরক্ত হলেন। 'ওই এক সমরেশদা, সোনুটাকে গোয়েন্দা বানাতে চাইছে। এদিকে তুই ওর মাথায় সিনেমার পোকা ঢোকাচ্ছিস। তোকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি ফিল্মটিল্ম নিয়ে ওকে নাচাস না।'

সমরেশকে বকাবকি করলে মুখ কাঁচুমাচু করে যেন কতই না ভয় পেয়েছেন, এমন একটা ভঙ্গি করেন। কিন্তু অরিজিৎ দিদির কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বার করে দেন। বড় বোনকে তিনি তোয়াক্কাই করেন না। পালটা ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই থাম তো। সোনু একটা জিনিয়াস। ওর কথামতো চেঞ্জটেঞ্জ করে আমার ছবি কত ইমপ্রুভমেন্ট হয় জানিস! মেয়ে লেখাপড়া ছাড়া অন্য কিছু করবে না, এটাই তো তুই চাস! জানিস না ওয়ার্ল্ড কত পালটে গেছে। মেয়েরা কী না করছে, আজকাল। ঠাকুমা-দিদিমাদের মতো তোর যত সেকেলে ধ্যানধারণা। রাবিশ!—হ্যাঁ রে সোনু, স্লামের ছবিটা দেখা হয়েছে?'

ভারতীর দিকে চোখ রেখে ভয়ে ভয়ে স্বর্ণালী বলে, 'খানিকটা দেখেছি।'

অরিজিৎ বলেন, 'খানিকটা কেন? ছোট ফিল্ম। পুরোটা দেখতে কতক্ষণ আর লাগত! তোর কি ভালো লাগছিল না?'

মায়ের দিক থেকে চোখ সরায়নি স্বর্ণালী। ভাইয়ের দাবড়ানিতে ভারতীর মুখটা থমথমে হয়ে আছে। স্বর্ণালী মিনমিনে গলায় বলল, 'ভালো লেগেছে। তবে একটা সিন নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।'

'কোন সিনটা রে?'

'ক্যাসেট চালিয়ে সেটা না দেখালে বুঝতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। ক্যাসেটটা কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

অরিজিৎ দারুণ ব্যস্তবাগীশ। 'চল, এক্ষুনি সিনটা দেখব।' ভারতীদের বললেন, 'আমরা মিনিট পনেরোর ভেতর ফিরে আসছি। তোরা একটু বোস।' বলে স্বর্ণালীকে টানতে টানতে তার ঘরে নিয়ে গেলেন।

ক্যাসেট চালিয়ে জাফরের দৃশ্যটা আসামাত্র স্বর্ণালী জিগ্যেস করল, 'এই সিনটা কোন বস্তিতে তুলেছিলে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অরিজিৎ বললেন, 'কত জায়গায় শুটিং করেছি। পার্টিকুলার এই সিনটা কোথায় তুলেছিলাম, মনে পড়ছে না। এটা সম্বন্ধে জানতে চাইছিস কেন?'

স্বর্ণালী আগেই ঠিক করে রেখেছিল, মামাকে জাফরের কথাটা জানাবে না। জানালেই হুলস্থূল বাধিয়ে দেবেন। ক্যাসেটটা চলছিল। এখন টিভির পর্দায় পরপর অন্য সব দৃশ্য ফুটে উঠছে। ক্যাসেটটা বন্ধ করে সে বলল, 'খুব দরকার। এখন কিচ্ছু জিগ্যেস করো না। পরে বলব।'

কী দরকার তা নিয়ে জোরাজুরি করলেন না অরিজিৎ। বললেন, 'ভারি মুশকিল হল। সমস্ত বস্তির চেহারাই মোটামুটি একরকম। কোথায় যে—কোথায় যে—' স্মৃতির ভেতর হাতড়াতে লাগলেন তিনি।

অরিজিৎ যা বললেন অর্থাৎ সব বস্তি প্রায় একই ধাঁচের এটা আগেই ভেবেছিল স্বর্ণালী। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো তার মাথায় কিছু একটা খেলে যায়। সে বলে, 'মামা, তোমার শুটিং স্ক্রিপ্টে কবে কোথায় শুট কর, নিশ্চয়ই লেখা থাকে?'

'তা তো থাকেই।' বলতে বলতে চোখে আলোর ঝলক ফুটে ওঠে অরিজিতের। 'ঠিক বলেছিস, স্ক্রিপ্ট দেখলে বলতে পারব, ওই সিনটা কোন বস্তির।'

'আমাকে কবে জানাতে পারবে?'

'কাল তো আবার আসছি। তখন জানতে পারবি।'

'মা-বাবার সামনে কিন্তু বোলো না—'

'আরে না না। নিশ্চয়ই ওই সিনটায় কিছু একটা মিস্ট্রি আছে। মা-বাবা জানতে পারলে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, তাই না? ওকে, তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

পরদিন বিকেলে এসে সবার আড়ালে অরিজিৎ স্বর্ণালীকে জানিয়ে দিলেন, জাফরকে নিয়ে যেখানে দৃশ্যটা শুট করা হয়েছে সেটা পার্ক সার্কাসের একটা বস্তি। রেল লাইনের ধারে বিশাল এলাকা জুড়ে ওটা গড়ে উঠেছে। বস্তিটার মালিকের নাম সুলতান আলি মির্জা। লোকে বলে সুলতানসাহেবের বস্তি।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে তার নিজস্ব মোবাইল ফোনে সমরেশ বসাককে ধরে ফেলল স্বর্ণালী।

সমরেশ রীতিমতো অবাক। জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, এত রাতে ফোন করছিস! কিছু হয়েছে? এনি প্রবলেম?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে স্বর্ণালী বলল, 'জাফরকে তোমরা অ্যারেস্ট করতে চাও?'

'কে জাফর?'

আসানসোলে ছ'মাস আগে যারা ব্যাঙ্ক থেকে পনেরো লাখ টাকা লুট করেছিল সেই ডাকাতগুলোর একজন। কপালে আব আছে। তোমরা কাগজে তার ফোটো—'

স্বর্ণালীকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে ভীষণ উত্তেজিতভাবে সমরেশ বলে ওঠেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। এখনও করে যাচ্ছি। কিন্তু ওই ক্রিমিনালটা আর তার গ্যাং একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু তুই এই মহাপুরুষের খোঁজ পেলি কী করে?'

অরিজিতের ডকুমেন্টারি দেখে কীভাবে জাফরকে শনাক্ত করেছে, জানিয়ে দিল স্বর্ণালী।

অভিভূত সমরেশ বললেন, 'সোনু, তোর কী অবজারভেশন পাওয়ার রে! কী মেমোরি! তোর মতো মেয়ে ওয়ার্ল্ডে আর একটাও নেই।' স্বর্ণালীকে তিনি ওর মা-বাবার মতো সোনুই বলেন।

সমরেশের সঙ্গে স্বর্ণালীর সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। সে বলল, 'এত প্রেইজ করছ! আমার কান কিন্তু লাল হয়ে উঠেছে। প্লিজ আর আকাশে চড়িও না। এবার আসল কাজটা করো। জাফরের ঠিকানাটা লিখে নাও।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। কাগজ আর পেন হাতের কাছেই আছে।'

পার্কসার্কাসের সুলতানসাহেবের বস্তির ঠিকানাটা জানিয়ে স্বর্ণালী বলল, 'বদমাশটাকে ধরতে পারলে কি না, আমাকে জানিও।'

'নিশ্চয়ই।'

এক সপ্তাহ পর সকালে নিজের টেবলে বসে একটা কোশ্চেনের অ্যানসার লিখছিল স্বর্ণালী। মোবাইল ফোন বেজে উঠল। সেটা তুলে কানে ঠেকাতেই সমরেশের গলা ভেসে আসে। তিনি জানালেন, জাফর ধরা পড়েছে। বললেন, 'সন্ধেবেলা আমি যাচ্ছি। ডিটেলে বলব। বাড়ির সবাইকে থাকতে বলিস। তোর মামাকেও খবর দিস।'

স্বর্ণালী চমকে ওঠে, 'কিন্তু মা যে জেনে যাবে।'

সমরেশ জানে, ডাকাত ধরার ব্যাপারে স্বর্ণালী মাথা ঘামিয়েছে, এটা শোনামাত্র ভারতী বোমার মতো ফেটে পড়বেন। হেসে হেসে বললেন, 'মেয়ে কত বড় একটা কাজ করেছে সেটা তার মা-বাবার জানা উচিত। ডোন্ট ওয়ারি। ভারতী বউদিকে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

সন্ধেবেলায় সমরেশ এলেন। তাঁর হাতে বিরাট চার-পাঁচটা ক্যারি-ব্যাগ। সেগুলোর

ভেতর রয়েছে পেল্লায় সাইজের কেক, কাজু বাদাম, চকোলেট আর দু'টো পেস্তা-ভরা আইক্রিমের বার। এগুলো পেলে স্বর্ণালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়।

ড্রইং রুমে সবাই অপেক্ষা করছিল।

ভারতী সমরেশকে বললেন, 'আগে খবর দিয়ে তো কোনওদিন আসেন না। আজকের আগমনটা মনে হচ্ছে খুবই স্পেশাল।'

'এগ্‌জাক্টলি।' হাতের ব্যাগগুলো স্বর্ণালীকে দিয়ে বসতে বসতে বললেন, 'এগুলো তোর।'

ওই ধরনের ব্যাগ বা প্যাকেট আগেও বেশ কয়েকবার স্বর্ণালীকে দিয়ে গেছেন সমরেশ। ওগুলোর ভেতর কী থাকে, ভারতী জানেন। চোখ সরু করে বললেন, 'এত প্যাকেট ট্যাকেট যখন এসেছে, মনে হচ্ছে, এবারও সোনু চুপচাপ কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে।' সমরেশের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করেন, 'কেসটা কী?'

গাল চুলকোতে চুলকোতে হেসে ফেলেন সমরেশ। বলেন, 'ও একটা দারুণ সোশাল ওয়ার্ক করেছে বউদি। জাতীয় কর্তব্যও বলতে পারেন।'

'যখনই বাঁদর মেয়েটা কিছু একটা করে তখনই ওইসব লম্বা-চওড়া কথাগুলো আওড়ান। সোশাল ওয়ার্ক, জাতীয় কর্তব্য! এবার কী করেছে সেটা বলুন—'

'বলছি—বলছি—'

অরিজিতের ডকুমেন্টারিতে জাফরকে দেখে, কৌশলে তার ঠিকানা জোগাড় করে সমরেশকে জানিয়ে দেয় স্বর্ণালী। ফলে তাঁর পক্ষে কাজ সহজ হয়ে যায়। প্লেন ক্লথের পুলিশ সুতলতানসাহেবের বস্তিতে গিয়ে জাফরের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে থাকে। দিন তিনেক আগে ভোরবেলা বিরাট পুলিশ বাহিনী আচমকা রেইড চালিয়ে ক্রিমিনালটাকে ধরে ফেলে। জাফর তখন ঘুমোচ্ছিল। পালাবার বা বাধা দেবার কোনও সুযোগই পায়নি। ওকে কিছু পুলিশি দাওয়াই দেবার পর বাকি ব্যাঙ্ক ডাকাতদেরও হদিস পাওয়া যায়। তাদেরও তুলে আনা হয়েছে। লুট হওয়া পনেরো লাখের মধ্যে বারো লাখ উদ্ধার হয়েছে। বাকিটা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

চোখ গোল করে অরিজিৎ শুনে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'এই জন্যেই আমার ডকুমেন্টারিতে জাফরের সিনটা দেখার পর জায়গাটা কোথায়, জানার জন্যে সোনু অস্থির হয়ে উঠেছিল। মাথায় কী মতলব ঘুরছে, আমাকে বুঝতেই দেয়নি।' একটু থেমে সমরেশকে বললেন, 'ডাকাত ধরার ব্যাপারে আমারও সামান্য কনট্রিবিউশন আছে, তাই না?'

সমরেশ তক্ষুনি ঘাড় কাত করেন, 'অবশ্যই। নিজের অজান্তে একটা ভালো কাজ করে ফেলেছেন। ডকুমেন্টারিটা তৈরি না হলে জাফরকে কোনও দিনই হয়তো ধরা যেত না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ভারতীর দিকে তাকান সমরেশ। 'এবার সবচেয়ে জরুরি খবরটা দেওয়া যাক, গভর্নমেন্ট আর যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে তারা ঘোষণা করেছিল, ক্রিমিনালদের ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার, টোটাল এক লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। টাকাটা সোনুকে গোপনে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'না না—' হাত নাড়তে নাড়তে ভারতী বলেন, 'ওসব ডাকাত টাকাত ধরার জন্যে টাকা নিতে হবে না।'

স্বর্ণালী ভারতীর কাছাকাছি বসে ছিল। সে কাকুতিমিনতি করতে থাকে, 'না বোলো না মা। ওটা আমি নেব।'

ভারতী থ। তারপর ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'নিবি? কেন নিবি? যা চাইছ তোমার বাবা আর আমি তাই দিচ্ছি। তোমার অসুবিধেটা কী হচ্ছে যে ওই টাকাটা নিতে হবে!'

স্বর্ণালী বলল, 'নিজের জন্যে না, তোমার অরফ্যানেজে ওই এক লক্ষ টাকা দিয়ে দেব।'

ভারতী তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটা অনাথ আশ্রম চালান। সরকারি কিছু অনুদান পাওয়া যায়, বিদেশ থেকেও সাহায্য আসে। তবু আরও অনেক টাকা দরকার।

এবার ভারতীর মুখটা নরম দেখায়। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে ভারী গলায় বলেন, 'পাজি মেয়ে। কিন্তু এটাই শেষ। নতুন করে আর কোনও ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পোড়ো না।'

প্রতিবারই কোনও রহস্যের গিঁট খোলা হলে মা সাবধান করে দেন, এবারই শেষ। কিন্তু স্বর্ণালী জানে, তার মাথায় একটা অদৃশ্য পোকা আছে। নতুন রহস্যের গন্ধ পেলে সেটা কুটুস কুটুস কামড় বসায়। আর সে মায়ের নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভবিষ্যতেও পড়বে।

হিল রোডের সেই বাড়িটা

রাহুলকে মনে আছে? কয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। সেবার মুম্বাইতে মাসিদের কাছে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা আদ্যিকালের ভাঙাচোরা পোড়ো বাড়িতে ক'টা ছেঁড়া খাবারের বাক্স দেখে একদল দুর্ধর্ষ ডাকাতের দলকে ধরার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের বাঙালি ছেলে এত বড় কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাই নিয়ে সারা মুম্বাই জুড়ে তুমুল হইচই হয়েছিল। সব খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে। তাকে নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলোর কী কাড়াকাড়ি! মুম্বাই পুলিশ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যে বিশাল গয়নার দোকানে ডাকাতরা হানা দেওয়ার ছক কষেছিল সেই 'মীরচন্দানি জুয়েলার্স'-এর তরফ থেকে রাহুলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল আর মহারাষ্ট্র সরকার দিয়েছিল সোনার মেডেল।

গল্পটা যাদের পড়া হয়নি, তাদের রাহুল সম্পর্কে দু'একটা কথা জানানো দরকার। সে তখন পড়ত একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। পড়াশোনায় এবং খেলাধুলোয় চৌকশ। দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ক্যারাটে জানে। এসব ছাড়া তার বড় একটা 'হবি' হল ডিটেকটিভ গল্প পড়া। সে গোয়েন্দা গল্পের পোকা। এক-একসময় ভাবে শার্লক হোমস বা হারকুল পয়রো হতে পারলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে।

তার বাবা কলকাতার একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, মা স্টেট গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর। দিদি ইংরেজি অনার্স নিয়ে লেডি ব্র্যাবোর্নে পড়ছে।

রাহুলের ছোট মেসো অরুণেশ দত্তচৌধুরি একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ অফিসার। আগে কলকাতায় ছিলেন। কয়েক বছর হল প্রোমোশন পেয়ে মুম্বাইতে চলে গেছেন। মাসির নাম পারমিতা। তিনিও চাকরি করেন। ওঁদের একমাত্র ছেলে অয়ন, যার ডাক-নাম জোজো, রাহুলের চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট।

কলকাতায় রাহুলদের বাড়ি ল্যান্সডাউন রোডে। খুব কাছাকাছি লেক প্লেসে থাকত অয়নরা। দু'জনের খুব ভাব। সম্পর্কে ভাই হলেও তারা দারুণ বন্ধু। কলকাতায় রোজ তাদের কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কেটে যেত। একই স্কুলে পড়ত তারা। কিন্তু এখন তো দেখা হওয়ার উপায় নেই। তাই প্রায় প্রতিদিনই রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর, ফোনে দশ পনেরো মিনিট তারা গল্প করে।

দু'বছর বাদে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আবার মুম্বাইতে এল রাহুল। মাসি মেসো আর অয়ন ফোনে অনবরত তাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে তার পরদিনই যেন ওদের কাছে চলে আসে রাহুল। ঠিক পরের দিনই আসা হয়নি। এক সপ্তাহ পর এসেছে। এবং একাই। এবারও মা বাবা তাঁদের কাজে আটকে গেছেন, দিদিরও সামনে পরীক্ষা। তাই ওদের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি।

এই দু'বছরে মুম্বাই এত বদলে গেছে যে প্রায় চেনাই যায় না। উঁচু উঁচু হাই-রাইজে চারদিক ছয়লাপ। কত যে নতুন নতুন ফ্লাইওভার, সমুদ্রের ওপর দিয়ে রাস্তা, ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে, এয়ার-কন্ডিশনিড মল আর হোটেল যে এর মধ্যে তৈরি হয়েছে ভাবা যায় না।

আগের বার রাস্তায় পা রাখলে যানবাহনের স্রোত চোখে পড়ত। এবার তার সংখ্যা আরও কয়েক লাখ বেড়ে গেছে। নানা মডেলের গাড়ি আর গাড়ি।

সত্যজিৎ রায়ের একটা গল্পে জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলি বলেছিলেন মুম্বাই হল চাম্পিয়ন শহর। সত্যিই তাই।

ক'দিন অয়নের সঙ্গে সারা মুম্বাই তোলপাড় করে বেড়াল রাহুল। মেরিন ড্রাইভ, চৌপট্টি, মালাবার হিলস, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, এলিফ্যান্টা কেভ, জুহু বিচ থেকে শুরু করে নবি মুম্বাই—একটা জায়গাও বাদ ছিল না।

আগের বার এসেও এইসব দেখে গেছে রাহুল। কিন্তু এখন সেগুলো আরও সুন্দর, আরও ঝকঝকে। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে সে।

ক'দিন ঘোরাঘুরির পর হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে। তাই আজ আর বেরোয়নি রাহুলরা।

মাসিদের হিল রোডের সাত তলার ফ্ল্যাটে অয়নের ঘরে বসে গল্প করছিল দু'জনে। মাসি আর মেসো ন'টা বাজতে না-বাজতেই যে যাঁর অফিসে বেরিয়ে গেছেন। ফ্ল্যাটে রাহুলরা ছাড়া রয়েছে সব সময়ের কাজের মেয়ে আশা। মারাঠি হলেও বাঙালিদের বাড়িতে থেকে থেকে সে বাংলাটা মোটামুটি ভালোই শিখে নিয়েছে। তা ছাড়া মাসির কাছে তালিম নিয়ে বাঙালিদের মতো রুই মাছের কালিয়া, ভাপা ইলিশ, সরষে দিয়ে পাবদা মাছের ঝাল, পায়েস, সব কিছু করতে পারে।

একটা ডিভানে কাত হয়ে আধশোওয়া মতো হয়ে ছিল রাহুল। তার কাছাকাছি একটা সোফা-কাম-বেডে হেলান দিয়ে বসে আছে অয়ন।

অয়নের মামা ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সিঙ্গাপুরে বিরাট একটা কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান। প্রায়ই অফিসের নানা কাজে তাঁকে মুম্বাইতে আসতে হয়। মাসখানেক আগে যখন এসেছিলেন, অয়নকে দু'টো গিফ্‌ট দিয়ে গেছেন। একটা হল দামি ক্যামেরা, অন্যটা বাইনোকুলার।

ক্যামেরাটা অয়নের টেবলে পড়ে আছে। বাইনোকুলারটা রয়েছে রাহুলের হাতে। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সেটা চোখে লাগিয়ে বাইরের নানা দৃশ্য দেখছিল সে।

এখন পুরোদস্তুর অফিস টাইম। শহর জুড়ে তুমুল ব্যস্ততা। এই এলাকাটাও সরগরম হয়ে উঠেছে। রাস্তায় ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ। সাত তলা অর্থাৎ আশি পঁচাশি ফিট উচ্চতা

থেকে নিচের মানুষগুলোকে চলমান পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। অগুনতি প্রাইভেট কার, বাস, অটো—নানা ধরনের গাড়িগুলোকে মনে হয় খেলনা-গাড়ি।

পুরো মুম্বাই যখন বদলে গেছে তখন হিল রোডই বা বাদ থাকে কেন? দু'বছর আগে যেসব দোতলা-তেতলা বাড়ি ছিল সেগুলো ভেঙে আকাশছোঁয়া পেল্লায় পেল্লায় বহুতল মাথা তুলেছে। তৈরি হয়েছে তিন চারটে মল, মাল্টিপ্লেক্স। তবে খানিক দূরে চিম্বপোকলি গলির মুখে পুরনো ইরানি রেস্তোরাঁ, একটা লন্ড্রি আর টেলরিং শপ অবিকল দু'বছর আগের মতোই রয়েছে।

অয়নদের বিল্ডিংটার ঠিক উলটো দিকে সেবার একটা টালির চালের লম্বা দোতলা বাড়ি দেখে গিয়েছিল রাহুল। সেটা ভেঙে তৈরি হয়েছে পনেরো তলা বিল্ডিং। বাইনোকুলারটা ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ সাত তলার একটা অ্যাপার্টমেন্টের জানালার কাছাকাছি এনে ওটা থামিয়ে দিতে হল।

দু'টো ফ্ল্যাটই সাত তলায়। একই উচ্চতায়। আর অয়নের বাইনোকুলারটা খুবই পাওয়ারফুল। অনেক দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায়।

রাস্তার ওধারের অ্যাপার্টমেন্টের জানালার নিচের দিকের আধাআধি ঢেকে পাতলা পরদা। ওপরের অংশটা ফাঁকা। সেই ফাঁকটা দিয়ে একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। সে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে কিছু করছিল। প্রথমটা ভালো করে খেয়াল করেনি রাহুল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ চমকে উঠল সে।

লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পেটানো স্বাস্থ্য। লম্বাটে মুখ, তামাটে রং, মাথায় পাতলা চুল, কপালের ডান পাশে এক ইঞ্চির মতো লাল দাগ। ওটা জন্মদাগই মনে হয়। মাঝারি হাইট। ভালো স্বাস্থ্য ছাড়া ওই বয়সের আর দশজন মানুষের মতোই তাকে দেখতে। ভিড়ে মিশে থাকলে আলাদা করে তার দিকে নজর পড়বে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটা এ কী করছে! ড্রেসিং টেবলের আয়নার দিকে তাকিয়ে চোখে কনট্যাক্ট লেন্স পরে নিল। ফলে চোখের কালো তারা দু'টোর রং বাদামি হয়ে গেল। তারপর ধীরে-সুস্থে একে একে যা করে যেতে লাগল তা এইরকম—কপালের লাল দাগটার ওপর একটা ব্যান্ড-এইড জাতীয় সাদা টেপ সেঁটে সেটা ঢেকে দিল। যেন ওই জায়গাটায় কেটে গেছে, তাই টেপ লাগানো। এটা শেষ হলে মাথায় পরচুলা এবং নিখুঁত কামানো গালে নকল শৌখিন দাড়ি লাগিয়ে নিল। পরচুলাটা কাঁধ অব্দি লম্বা, দাড়ি ঘন হলেও ইঞ্চিখানেকের বেশি বড় নয়।

কোনাকুনি বসে থাকায় লোকটাকে তো বটেই, আয়নায় তার প্রতিবিম্বও দেখা যাচ্ছে। খানিক আগের চেহারাটা আর নেই, ভোল পালটে একেবারে অন্য একটা লোক হয়ে গেছে। মেক-আপটা যে নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলার জন্য, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই লোকটার খারাপ কোনও মতলব আছে। সেই কারণেই নিজের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

যত ভাবছিল, কপালে ততই ভাঁজ পড়ছে রাহুলের। তার ভেতরকার শার্লক হোমস ক্রমাগত তাকে উসকে দিতে থাকে। লোকটার অভিসন্ধি তাকে জানতেই হবে।

নানা ভাবনায় রাহুলের মস্তিষ্ক যখন তোলপাড় সেই সময় বিদ্যুৎ চমকের মনে পড়ে গেল, ওই লোকটার মেক-আপের আগের মুখটা তার চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখেছে। কোথায়, ঠিক মনে করতে পারল না সে।

ওধারে ভেতর দিকের দরজা দিয়ে মাঝবয়েসি একটা লোক ঘরে এসে ঢুকল। তার এক হাতে চমৎকার অ্যাটাচি কেস, আরেক হাতে শার্ট-ট্রাউজার্স ইত্যাদি। জিনিসগুলো পাশের একটা ডিভানে রেখে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে থাকা লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে কপালের টেপটা একটু সরিয়ে দিল। পরচুলটা ঠিকমতো বসানো হয়নি, সেটা চেপে চেপে সেট করল। দাড়ির দু-একটা জায়গা বড় হয়ে আছে, সরু কাঁচি দিয়ে বড়গুলো ছেঁটে ঠিক করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার মুখে ধীরে ধীরে হালকা হাসি ফুটে ওঠে। কিছু একটা বলল সে, রাস্তার এপারে প্রায় ষাট ফিট দূরে বসে তার একটা বর্ণও শুনতে পেল না রাহুল। তবে মাঝবয়সির হাসি দেখে মনে হল মেক-আপটা নিখুঁত হওয়ায় সে খুশি হয়েছে। এবার আঙুল বাড়িয়ে শার্ট-টার্ট দেখিয়ে দিল। আন্দাজ করা যাচ্ছে, পোশাক পালটে নিতে বলছে।

মাঝবয়সি আর দাঁড়াল না, যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেটা দিতেই অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর দিকে অদৃশ্য হল।

এ ঘরের লোকটা ড্রেসিং টেবলের সামনে থেকে উঠে পোশাক বদলে, অ্যাটাচি কেসটা হাতে ঝুলিয়ে মাঝবয়সি যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল। তাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

রাহুল বুঝতে পারছে, লোকটা বাইরে বেরুবে। কোথায় যাবে সে?

অয়ন তার ওপর লক্ষ্য রাখছিল। জিগ্যেস করে, 'অত মন দিয়ে এতক্ষণ ধরে 'গ্রিন হাইটস'-এ কী দেখছ রণিদা?' উলটো দিকের বাড়িটার নাম 'গ্রিন হাইটস' আর রাহুলের ডাক নাম রণি।

রাহুল চমকে ওঠে। তবে চোখ থেকে বাইনোকুলার সরায় না। মেক-আপ নেওয়া লোকটা নিশ্চয়ই লিফটে করে নিচে নেমে ওদের গেট দিয়ে বেরুবে। তারপর কী করে সেটা দেখা দরকার।

রাহুল এক হাতে বাইনোকুলার ধরে অন্য হাতের একটা আঙুল দিয়ে গ্রিন হাইটস-এর সাত তলার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখিয়ে জানতে চায়, 'ওটায় কারা থাকে রে?'

অয়ন অবাক।—'কেন বল তো?'

'যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দে। কেন টেন পরে শুনিস।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অয়ন বলে, 'গড নোজ—'

'সে কি রে, এক পাড়ায় থাকিস, সামনা সামনি বাড়ি। জানিস না?'

'এ এক অদ্ভুত সিটি। পাড়া কী বলছ! একই হাই-রাইজো দু তিন বছর হয়তো আছে, কিন্তু কেউ কারও খবর রাখে না। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। যে যার কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অয়ন জিগ্যেস করে, 'ওই অ্যাপার্টমেন্টের লোকজনদের নিয়ে তোমার এত কিউরিয়াসিটি কেন?'

রাহুল বলল, 'কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

অয়ন তার এই মাসতুতো দাদাটিকে খুব ভালো করেই জানে। সেবার ছেঁড়া খাবারের বাক্সের ক্লু ধরে ডাকাতদের গ্যাংটার যে খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল সেই অভিযানে সে ছিল রাহুলের সহকারী। শার্লক হোমসের যেমন ডাঃ ওয়াটসন, ব্যোমকেশের যেমন অজিত, ফেলুদার যেমন তোপসে। তারা দু'জন কলকাতায় থাকতে এরকম অভিযান আরও ক'টা চালিয়েছে। অয়নের ধারণা, রাহুলের যেরকম ধারাল বুদ্ধি তাতে পৃথিবীর সবচেয়ে প্যাঁচালো রহস্যের জট নিমেষে ছাড়াতে পারে। ওর সঙ্গে থাকলে সময়টা চমৎকার কেটে যায়।

অয়ন টের পাচ্ছিল তার মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। রাহুলের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে জানতে চাইল, 'ওই অ্যাপার্টমেন্টটায় কোনও মিস্ট্রির গন্ধ পাচ্ছ রণিদা?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে আরেকটু ওয়াচ করতে হবে।'

অয়নের তর সইছিল না। সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'কী ব্যাপার বল তো। আমরা এতদিন আছি, ওই অ্যাপার্টমেন্টে প্রবলেম কিছু হয়েছে বলে তো শুনিনি। ভেরি পিসফুল বিল্ডিং।'

রাহুল বলল, 'হয়নি, তবে হতে পারে। তোকে যে বললাম, ক'টা দিন নজর রাখতে হবে। একটু ধৈর্য ধরে থাক।'

'কিন্তু—'

'নো মোর কোশ্চেন জোজো।'

অয়ন চুপ করে গেল।

কথা বলছিল ঠিকই, কিন্তু চোখ থেকে বাইনোকুলারটা সরায়নি রাহুল। আগে সেটা তাক করা ছিল ওধারের সাত তলার অ্যাপার্টমেন্টটার দিকে, এবার নিচে রাস্তার দিকে নেমে গেছে।

রাহুল দেখতে পেল, 'গ্রিন হাইটস'-এর গেট দিয়ে বেরিয়ে, অ্যাটাচি হাতে ঝুলিয়ে সেই লোকটা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে দূরে স্বামী বিবেকানন্দ রোডের দিকে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়ায় আর তাকে দেখা গেল না।

এখন হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে রাহুলের। ইস, একটু আগে খেয়াল হলে নিচে গিয়ে লোকটার পিছু নেওয়া যেত। ওকে ফলো করে করে দেখা যেত কোথায় কোথায় যাচ্ছে, সন্দেহজনক কিছু করছে কিনা। মনে যখন একটা খটকা দেখা দিয়েছে, স্বস্তি নেই।

সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল। চোখে থেকে ধীরে ধীরে দূরবীন নামিয়ে রেখে চুপচাপ বসে থাকে রাহুল। আপসোস হলেও দমে যায়নি সে। কিছু একটা করতেই হবে তাকে।

হঠাৎ অনেকগুলো চিন্তা হুড়মুড় করে চারদিক থেকে রাহুলের মাথায় ঢুকে যেতে লাগল। ওই লোকটা ছাড়াও একটা মাঝবয়সিকে এই অ্যাপার্টমেন্টটায় দেখা গেছে। এই

দু'জনকে বাদ দিলে আর কেউ কি ওখানে থাকে? থাকলে কী করে তারা? ওই লোকটার মেক-আপ নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই বা কী? এসব তো রয়েছেই, কিন্তু যেটা সব চাইতে বেশি করে তাকে ভাবাচ্ছে তা হল, মেক-আপের আগে ওই লোকটার মুখের চেহারাটা তার খুবই চেনা মনে হয়েছিল। স্মৃতির ভেতরটা তোলপাড় করেও ধরা যাচ্ছে না, আগে তাকে কোথায় দেখেছে।

ভাবতে ভাবতে রাহুলের নজর এসে পড়ে অয়নের ওপর। পলকহীন তাকেই লক্ষ করছিল অয়ন। ওর চোখেমুখে কৌতূহল আর উত্তেজনা তো ছিলই। সেসব শতগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু রাহুল আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে, প্রশ্ন করা চলবে না। অয়ন জানে, সেটা করলেই দাবড়ানি খেতে হবে।

এর মধ্যে রাহুলের মাথায় নতুন একটা চিন্তা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 'গ্রিন হাইটস'-এ যেতে পারলে ওই লোকটা এবং তার অ্যাপার্টমেন্টে যে বা যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে কিছু খবরটবর হয়তো জোগাড় করা যাবে। সে জিগ্যেস করে, 'জোজো, ওই বিল্ডিংটার কাউকে তুই চিনিস?'

অয়ন মাথা হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। ওটার আট তলায় আমার এক বন্ধু থাকে। আমরা এক ক্লাসেই পড়ি, তবে আলাদা স্কুলে।'

আগ্রহে চোখ চকচক করে ওঠে রাহুলের।—'কোন অ্যাপার্টমেন্টটা তোর বন্ধুদের?'

যে অ্যাপার্টমেন্টে সেই লোকটা মেক-আপ নিচ্ছিল, আঙুল বাড়িয়ে তার ওপরেরটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা—'

সারা শরীরে চমক খেলে যায় রাহুলের। 'গ্রিন হাইটস'-এ ঢোকার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই না, ওই অত্যন্ত গোলমেলে লোকটা যেখানে থাকে, ঠিক তার ওপরের ফ্ল্যাটেই অয়নের সঙ্গে যাওয়া হয়তো সম্ভব। পরক্ষণেই মনে হল, তার যাওয়াটা অয়নের বন্ধুরা পছন্দ নাও করতে পারে। তাই যাওয়ার কথা বলার আগে এই ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়। জিগ্যেস করে, 'তোর বন্ধুর কী নাম রে?'

'মহেশ—মহেশ আদবানি। ওরা সিন্ধি।'

'তোর কিরকম বন্ধু হয়?'

'মুম্বাইতে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমরা বান্দ্রা জিমখানার আন্ডার- সেভেনটিন টিমে ক্রিকেট খেলি, একসঙ্গে ওয়াংখেরে স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাই, একই ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার কোর্স করছি। ভ্যাকেসনে কোথাও বেড়াতে গেলে—'

বন্ধুত্বটা কতখানি ঘনিষ্ঠ তা বোঝবার জন্য তোড়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল অয়ন, হাতে তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে রাহুল বলল, 'ব্যস, ব্যস বুঝতে পেরেছি। এবার বল, ওদের অ্যাপার্টমেন্টে আর কে কে থাকে?'

'মহেশ, ওর বাবা নিরঞ্জন আঙ্কল, ওর মা মীনাক্ষী আন্টি আর ওর ঠাকুমা। মহেশের দাদা রামেশভাই পুনেতে ফার্গুসন কলেজে পড়ে। সেখানে হস্টেলে থাকে। ছুটি টুটি হলে মুম্বাইতে আসে।'

'তোর বন্ধুর মা-বাবা মানুষ কেমন?'

'এক্সেলেন্ট। বিজনেস করে ওদের কত টাকা। কিন্তু নিরঞ্জন আঙ্কল আর মীনাক্ষী আন্টির সঙ্গে কথা বললে তা বোঝাই যায় না। হাসিখুশি, দারুণ মজা করতে পারেন। ব্যবসা ট্যাবসা করলেও নিরঞ্জন আঙ্কল প্রচুর পড়াশোনা করেন। যে কোনও সাবজেক্ট নিয়ে প্রশ্ন কর, আঙ্কল চটপট অ্যানসার দেবেন।'

রাহুল বলল, 'আমি যদি তোর সঙ্গে মহেশদের অ্যাপার্টমেন্টে যাই, ওঁরা কি বিরক্ত হবেন?'

চোখ কপালে উঠে যায় অয়নের। 'কী বলছ তুমি রণিদা! লাস্ট টাইম যখন এসেছিলে, আমরা সেই ডাকাতদের কেসে জড়িয়ে গেলাম, তাই মহেশদের ওখানে যাওয়া হয়নি। সেজন্যে আঙ্কল আর আন্টির কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেতে হয়েছে। এবার না গেলে ভীষণ রেগে যাবেন। আর—' বলতে-বলতে কী ভেবে থেমে গেল। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে, চোখ আরও একটু ওপরে তুলে বলল, 'আচ্ছা রণিদা, ওদের অ্যাপার্টমেন্টে—'

তার কথার মাঝখানেই রাহুল বলে ওঠে, 'তুই ঠিকই ধরেছিস, 'গ্রিন হাইটস'-এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে। সেই জন্যেই যেতে চাইছি।'

রাহুলের একটা হাত চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অয়ন বলে, 'কী দেখেছ বল, প্লিজ বল—'

'ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও ক্লিয়ার নয়। আরেকটু বুঝবার চেষ্টা করি। তারপর তো বলবই—'

আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি যদি কেসটা না জানি, তোমাকে হেল্প করব কী করে? কোনও কথা শুনব না। বলতেই হবে, বলতেই হবে—'

হাত ঝাঁকিয়েই চলেছে অয়ন। অনেক কসরত করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে রাহুল বলল, 'ঠিক আছে বাবা, বলছি। কিন্তু ওয়ান কন্ডিশন—'

'যে কোনও কন্ডিশনেই আমি রাজি। বল—'

'যা শুনবি, অন্য কাউকে বলতে পারবি না। এমনকি তোর বুজুম ফ্রেন্ড মহেশকেও না। পরে অবশ্য ওকে আমাদের টিমে টানতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার পেট থেকে একটা শব্দও বেরুবে না।'

'গ্রিন হাইটস'-এর সাত-তলার ওই অ্যাপার্টমেন্টে কী দেখেছে, সমস্ত জানিয়ে দিল রাহুল। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না।

শুনে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে রইল অয়ন। তারপর চাপা, দম-আটকানো গলায় বলল, 'এখন কী করতে চাইছ?'

'মহেশদের সঙ্গে আলাপ করব। কায়দা করে ওদের নিচের তলার লোকগুলো সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে। চল, এখনই যাওয়া যাক—'

‘এখন গেলে তো ওদের পাওয়া যাবে না।’

‘কেন?’

অয়ন জানায়, নিরঞ্জন আঙ্কল তাঁর অফিসে বেরিয়ে গেছেন। মীনাক্ষী আন্টিও নিজেদের বিজনেস দেখেন। তিনিও ওঁর সঙ্গে রোজই বেরোন, ফিরতে রাত হয়ে যায়। মহেশকেও পাওয়া যাবে না। সে এখন স্কুলে। অয়নেরও বাড়িতে থাকার কথা নয়। রাহুল আসায় সে ক'দিন ছুটি নিয়েছে।

রাহুল বলল, ‘মুশকিল হল—’

একটু ভেবে অয়ন বলে, ‘স্যাটার-ডে আর সানডে, দু'দিন স্কুল ছুটি থাকে। কাল শনিবার। মহেশ বেরুবে না। নিরঞ্জন আঙ্কলদের হাফ-ডে অফিস। আড়াইটে তিনটের ভেতর ফিরে আসবেন। তারপর রেস্ট নেবেন। সন্ধের পর গেলে ভালো হয়।’

‘কী আর করা? কালই যাব।’

ভেতরে-ভেতরে উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটছিল অয়ন। বলল, ‘কালকের ব্যাপার কালকে। আজ কী হবে?’

‘আজ এই ঘর বসে রাস্তার ওধারের ওই অ্যাপার্টমেন্টের ওপর তুই আর আমি পালা করে নজর রেখে যাব। এক ফাঁকে আমি চানটান করে খেয়ে এসে এখানে চোখ বাইনোকুলার লাগিয়ে বসব। তারপর তুই খেয়ে আসবি।’

অয়ন বুঝতে পারল, সারাক্ষণ নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। বলল, ‘ওকে—’

ওরা বসেই আছে। ‘গ্রিন হাইটস’-এর সেই অ্যাপার্টমেন্টের বিশেষ ঘরটিতে দু-তিনবার মাঝবয়সি লোকটি ঘুরে গেছে কিন্তু পাঁচ সাত মিনিটের বেশি কখনও থাকেনি। ছোটখাটো কিছু কিছু জিনিস রেখে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর দিকে অদৃশ্য হয়েছে।

দুপুরের পর বিকেলও যখন ফুরিয়ে আসছে, অয়ন বলল, ‘সারাদিন বসে থেকে থেকে কোমর ব্যথা হয়ে গেছে। চল, একটু ঘুরে টুরে—’

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই চাপা গলায় ‘চুপ। ওই দ্যাখ—’ বলে আঙুল বাড়িয়ে ‘গ্রিন হাইটস’-এর গেটের দিকটা দেখিয়ে দেয় রাহুল।

সেই মেক-আপ নেওয়া লোকটা ফিরে এসেছে। যে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বেরিয়েছিল সেটা তার হাতেই রয়েছে। গেট পেরিয়ে সে ‘গ্রিন হাইটস’-এর ভেতরে ঢুকে গেল।

উত্তেজনায় সারা শরীর টান টান হয়ে গিয়েছিল রাহুলের। সে বলে, ‘এর কথাই তোকে বলেছিলাম। যাক, এতক্ষণ ওয়েট করার রিওয়ার্ডটা পাওয়া গেল। এবার দেখি মক্কেল কী করে—’

রাহুলের উত্তেজনা অয়নের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। জোরে শ্বাস টেনে কাঁপা গলায় সে কী বলল, বোঝা গেল না।

মিনিট পাঁচেক বাদে লোকটাকে সেই ঘরে দেখা গেল। মাঝবয়সিটাও তার সঙ্গে এসেছে। ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে লোকটা মেক-আপ তুলতে তুলতে আর সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল। এতদূর থেকে সকালেও তাদের কথা শুনতে পায়নি রাহুল, এখনও পেল না।

কিছুক্ষণ লোকদু'টোকে লক্ষ করার পর বাইনেকুলারটা অয়নকে দিয়ে রাহুল বলল, 'এবার তুই দ্যাখ—'

মেক-অ্যাপটা তোলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লোকটার আসল চেহারা এবার বেরিয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে চমকে ওঠে আয়ন।—'এই লোকটার মুখ আমার খুব চেনা রণিদা—'

রুদ্ধশ্বাসে রাহুল জিগ্যেস করে, 'চেনা মানে? তুই কি ওদের অ্যাপার্টমেন্টে কখনও গেছিস?'

'নেভার।'

'তা হলে?'

'যতদূর মনে পড়ছে, লোকটার ছবি টিভি স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে। হী-হী-ইজ—'

সকালের দিকে স্মৃতির ভেতর হাতড়ে বেড়াচ্ছিল রাহুল। এবার তারও মনে পড়ে গেল। টিভিতে সেও দেখেছে। অয়নের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে ওঠে, 'হী ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্টস।'

অয়ন বলল, 'এরকম একটা ডেঞ্জারাস লোক আমাদের বাড়ির উলটো দিকের বিল্ডিংয়ে থাকে, ভাবতেই পারিনি।'

রাহুল বলল, 'মনে হচ্ছে, ওই অ্যাপার্টমেন্টটা টেররিস্টদের ডেন।'

অয়নের তর সইছিল না। ভীষণ ব্যস্তভাবে বলল, 'চল, এক্ষুনি সরদেশাই আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করে খবরটা দিই।'

বান্দ্রা পুলিশ স্টেশনটা খুব কাছেই। দু-আড়াই শো গজের মধ্যে। ওই থানার ও.সি নবীন সরদেশাই রাহুলের মেসো অরুণেশ দত্তচৌধুরির বন্ধু। 'মীরচন্দানি জুয়েলার্স'-এর ডাকাতির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সে যে সোনার মেডেল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছিল সেটা নবীন সরদেশাই-এর জন্যই।

ওই লোকটার খবর নিশ্চয়ই পুলিশকে জানানো দরকার। এবং সেটা এখনই। কিন্তু রাহুল খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'জাস্ট ওয়েট ফর আ কাপল অফ ডেজ। আরেকটু ওয়াচ করে ওরা কোনও ডেঞ্জারাস প্ল্যান আঁটছে কিনা সেটা বুঝে নিই। তা ছাড়া, ওই অ্যাপার্টমেন্টে মাত্র দু'টো লোককে দেখেছি। আরও কেউ আছে কি না, তাও জানতে হবে। তারপর সারদেশাই আঙ্কলের কাছে যাব।'

'আচ্ছা—'মাথা হেলিয়ে সায় দেয় অয়ন।

ওদিক মেক-আপ তোলার পর লোকটা মাঝবয়সির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

মুম্বাই দেশের পশ্চিম প্রান্তে। এখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয় অনেক দেরিতে। কলকাতায় যদি সকাল ছ'টায় সূর্য ওঠে, এখানে উঠবে তার এক ঘণ্টা বাদে। দুই শহরে সূর্য ডোবার সময়ের তফাতও একই রকম—পুরো একটি ঘণ্টা।

হিল রোডের এই এলাকা থেকে আরব সাগর খুব কাছেই। উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপার আর

বিশাল বিশাল রেনট্রির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের কয়েকটা টুকরো চোখে পড়ে। জলে অজস্র লাল টকটকে আবির ঢেলে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

সাতটা বাজতে চলল। মাসি আর মেসো আটটার আগে ফেরেন না। ওঁদের অফিস মেন সিটিতে, ব্যালার্ড এস্টেটে। সেখান থেকে বান্দ্রায় পৌঁছতে অনেক সময় লাগে।

অয়নকে নিয়ে রাহুল ঠায় বসেই আছে। লক্ষ করছে 'গ্রিন হাইটস'-এর সেই লোকদু'টোর গতিবিধি। ওরা কথা বলেই চলেছে।

এদিকে অয়নদের কাজের মেয়ে আশা, যাকে ওরা আশা মৌসি (মাসি) বলে ডাকে, হিন্দি-বাংলা এবং মারাঠি মিলিয়ে অদ্ভুত এক ভাষায়, মজার সুরে মাঝে মাঝে এসে বলছে, 'কিয়া ঝালা (হয়েছে) রে, দু'জন চুপচাপ পুরা দিন ঘরমে বৈঠে আছ? যাও, ঘুমকে (ঘুরে) এস—'

রাহুল তাকে জানায়, ক'দিন খুব ঘোরাঘুরি করেছে। শরীর ক্লান্ত। আজকের দিনটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুবে না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

সন্ধে নামার পর রাস্তার জোরালো ভেপার ল্যাম্পগুলো তো বটেই, প্রতিটি বিল্ডিংয়ে কত যে আলো জ্বলে উঠল! যতদূর চোখ যায়, হিল রোড জুড়ে শুধুই আলোর ঝলকানি।

হঠাৎ দেখা গেল, 'গ্রিন হাইটস'-এর সেই ঘরটায় আরও চারজন এসে ঢুকেছে। এদের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের ভেতর। অর্থাৎ সবাই যুবক। ওরা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল।

ঘরের মাঝখানে বৃত্তের আকারে একটা বড় টেবল। এই টেবলটা ঘিরে নতুন চার যুবক এবং আগের দু'জন মোট ছ'জন গোল হয়ে বসে পড়ল।

মেক-আপ নিয়ে যে বেরিয়েছিল সেই লোকটা তার অ্যাটাচি থেকে একটা ম্যাপ বার করে টেবিলের ওপর রাখল। সিলিং থেকে একটা ঝুলন্ত বাল্ব ঠিক টেবিলটার ওপর জ্বলছে।

রাহুল চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বাল্বে তেজি আলোয় ম্যাপটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিন চার জোড়া রেললাইন কালো কালিতে আঁকা রয়েছে সেটার ওপর। ম্যাপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অব্দি লাইনগুলো চলে গেছে। সেগুলোর দু'পাশে লাল কালির বেশ ক'টা সার্কল। রাহুল গুনে গুনে দেখল মোট সাতটা। সার্কলগুলোর পাশে খুদি খুদি অক্ষরে কী যেন লেখা আছে। এতদূর থেকে পড়া যাচ্ছে না।

লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ম্যাপটার ওপর। আর মাঝবয়সিটা আঙুল দিয়ে লাল সার্কলগুলো দেখাতে-দেখাতে অন্যদের কী যেন বোঝাচ্ছে। আর তারা খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে।

রাহুল আন্দাজ করতে পারল, মেক-আপ নিয়ে সেই লোকটা ওই ম্যাপটাই আনতে গিয়েছিল এবং মাঝবয়সিটা এই গ্যাংটার লিডার। কিন্তু নতুন চার যুবক? ওরা কি ওই অ্যাপার্টমেন্টটাতেই আগে থেকে ছিল? নাকি পরে এসে ওধারের দরজা দিয়ে ঢুকেছে?

পাশে বসে অয়ন অস্থির হয়ে উঠেছে। খালি চোখে রাস্তার এপার থেকে দেখা যাচ্ছে,

ওই ঘরটায় নতুন লোকজন এসেছে। কিন্তু তারা কী করছে, সেটা স্পষ্ট করে দেখা সম্ভব নয়।

অয়ন বলল, 'আমাকে বাইনোকুলারটা একটু দাও না রণিদা—'

আস্তে আস্তে চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে অয়নকে দেয় রাহুল। আর অয়ন সেটা দিয়ে লোকগুলোকে দেখতে দেখতে ধন্দে পড়ে গেল। বলতে লাগল, 'একটা ম্যাপ, লম্বা লম্বা রেললাইন, লাল লাল সার্কল—এসব কী? ওদের কি কোনও খারাপ মতলব আছে? তোমার কী মনে হয় রণিদা?'

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর রাহুলও হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। যত ভাবছে ততই তার মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যাচ্ছে। বলল, 'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।' একটু থেমে ফের বলে, 'দেখা যাক, ওরা কী করে। বাইনোকুলারটা দে—'

দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে থাকে রাহুল। 'গ্রিন হাইটস'-এর লোকগুলো অনেকক্ষণ ম্যাপটা নিয়ে মশগুল হয়ে রইল।

সাড়ে আটটায় মাসি আর মেসো ফিরে এলেন। ছুটির পর মেসো তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে মাসির অফিসে যান। তারপর মাসিকে তুলে একসঙ্গে চলে আসেন।

মেসো, অর্থাৎ অরুণেশ দত্তচৌধুরি খুব আমুদে মানুষ। মাসি পারমিতাও তাই। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই হইচই বাধিয়ে ভেতর দিকের ড্রইংরুমে রাহুল আর অয়নকে ডেকে নিয়ে তুমুল আড্ডা জমিয়ে ফেললেন। আশা মৌসি, ফিশ ফ্রাই আর পকৌড়া ভেজেছিল। প্লেটে প্লেটে জিভে জল-আনা খাবারগুলো সাজিয়ে সবাইকে দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে গরম কফি।

খেতে খেতে নানা মজাদার গল্প চলছে। এই মাসি আর মেসোর সঙ্গ খুবই ভালো লাগে রাহুলের। কিন্তু আজ বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে সে। ড্রইংরুম থেকে 'গ্রিন হাইটস'টা দেখা যায় না। অয়নের ঘরে বসে ওই লোকগুলোর ভাবগতিক লক্ষ করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। উঠে যে যাবে তার উপায় নেই। মেসোদের নানারকম কৈফিয়ত দিতে হবে। একটা রহস্যময় ব্যাপারে তারা জড়িয়ে পড়তে চলেছে, টের পেলে মেসোরা একেবারেই খুশি হবেন না। আপাতত সেটা গোপনই রাখতে চায় রাহুল। সে জানে এই নিয়ে অয়নও টুঁ শব্দটি করবে না। অয়নের মুখ দেখে সে টের পাচ্ছে ড্রইংরুমে মা বাবার সঙ্গে গল্প করার চেয়ে নিজের ঘরে রাহুলের কাছে বসে 'গ্রিন হাইটস' -এর দিকে নজর রাখাটা এই মুহূর্তে ভীষণ জরুরি।

নানা কথার ফাঁকে অরুণেশ একসময় জানালেন, কাল তিনি এবং পারমিতা ভোরে পুনে যাবেন। তাঁদের এক মারাঠি বন্ধু সেখানে থাকেন। তাঁর একটা বড় অপারেশন হয়েছে, আপাতত শয্যাশায়ী। অনেকদিন ধরেই এই বন্ধুটিকে দেখতে যাওয়ার কথা ভাবছেন অরুণেশরা, কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয়ে উঠছিল না।

শনি এবং রবি দু'দিন অরুণেশ আর পারমিতার অফিসে ছুটি। কাল শনিবার। অফিসের কাজের প্রেসারটা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। দু'জনে। কাল পুনে না গেলেই নয়।

খবরটা রাহুলকে চনমনে করে তোলে। কী যে স্বস্তি। অফিস ছুটি থাকলে সকালে উঠে সবাইকে তাঁর টাটা সুমোতে তুলে হাইওয়ে ধরে লম্বা ড্রাইভ বেরিয়ে পড়েন অরুণেশ। কখনও খাণ্ডালা, কখনও লোনাভালা, কখনও বা মহবলেশ্বর চলে যান। অবিরাম ঘোরাঘুরি, দুপুরে কোনও ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়া, হই-হুল্লোড়। সময় চমৎকার কেটে যায়।

কিন্তু কাল রাহুলদের ঠাসা প্রোগ্রাম। সকাল থেকে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে 'গ্রিন হাইটস'-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। সন্ধে নামলে যেতে হবে অয়নের বন্ধু মহেশদের অ্যাপার্টমেন্টে। ভাগ্যিস মেসোদের বন্ধু অসুস্থ। নইলে সব গোলমাল হয়ে যেত।

মুম্বাই আসার পর রাহুল অয়নের ঘরেই শোয়। তার জন্য আলাদা সিঙ্গল-বেড একটা খাট পেতে দেওয়া হয়েছে।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পব রাহুল আর অয়ন পালা করে অনেকক্ষণ 'গ্রিন হাইটস'-এর অ্যাপার্টমেন্টের দিকে দূরবীন চোখে লাগিয়ে তাকিয়ে থাকে। আলো জ্বলছে ঠিকই কিন্তু রাস্তার দিকের ঘরটায় কারওকেই দেখা গেল না। সেই মাঝবয়সিটা নেই, মেক-আপ নিয়েছিল যে লোকটা সেও নেই। যে চার যুবক হঠাৎই চলে এসেছিল তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। পুরো দঙ্গলটা কোথায় যেতে পারে? নিশ্চয়ই ভেতরের কোনও ঘরে রয়েছে। কী করছে, এখন আর তা জানার উপায় নেই।

একসময় 'গ্রিন হাইটস'-এর ওই অ্যাপার্টমেন্টেটার আলো নিভে গেল। তার মানে লোকগুলো শুয়ে পড়েছে। আজ আর কিছু করার নেই। রাহুল এবং অয়নও শুয়ে পড়ে। শুলো ঠিকই, কিন্তু ভেতরে উত্তেজনা থাকলে যা হয়, মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। যতবার ঘুম ভাঙে, রাহুলের চোখ চলে যায় রাস্তার সেই অ্যাপার্টমেন্টটার দিকে। না, ওদের কারওকেই দেখা যাচ্ছে না। গভীর ঘুমে তারা ডুবে আছে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরিই হয়ে গেল রাহুল আর অয়নের। ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে। আশা জানালো, তারা ওঠার অনেক আগেই অরুণেশ আর পারমিতা পুনে চলে গেছেন।

মুখ টুখ ধুয়ে অয়নের ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট কবল দু'জনে।

অয়ন জিগ্যেস করল, 'সন্ধেবেলা মহেশদের অ্যাপার্টমেন্টে যাব। তার আগে পর্যন্ত আমাদের কী প্রোগ্রাম?'

রাহুল জানায়, কালকের মতো আজও তারা বেরুবে না। এই ঘরে বসেই 'গ্রিন হাইটস'-এর ওই ঘরটায় নজরদারি চালিয়ে যাবে।

বেলা আরও একটু চড়লে রাস্তার ওধারের ঘরটায় মাঝবয়সি এবং তার বাকি সঙ্গীদের দেখা গেল। কাল রাত্তিরে ভেতর দিকের কোনও ঘরে ওরা নিশ্চয়ই শুয়েছিল। ঘুম ভাঙার পর বাথরুম সেরে, ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে, আবার এখানে জড়ো হয়েছে।

কালকের মতো ঘরের মাঝখানের টেবলটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল লোকগুলো। টেবলের ওপর সেই ম্যাপটা বিছানো ছ'জনে সেটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মাঝবয়সিটা প্লাস্টিকের সরু, এক ফুটের মতো লম্বা একটা স্টিক দিয়ে রেল লাইনের পাশে লাল লাল সার্কলগুলো দেখাতে দেখাতে আজও তার সঙ্গীদের কী যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে। একমনে শুনতে-শুনতে কেউ কেউ খুব সম্ভব নানারকম প্রশ্ন করছে। মাঝবয়সি তার উত্তর দিচ্ছে। কেউ বা তর্ক জুড়ে দিচ্ছে। আঙুল তুলে নাচাতে নাচাতে শাসানির ভঙ্গিতে মাঝবয়সি তাকে থামিয়ে দিচ্ছে।

এত দূর থেকে কথা তো শোনা যাচ্ছে না। তবে মুখচোখের ভাব, ভুরু কোঁচকানো, জোরে-জোরে আঙুল ঝাঁকানো, এসব দেখে আঁচ করা যায়, ম্যাপটা নিয়ে ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছে। অনেকেই মাঝবয়সির কথায় সায় দিতে পারছে না। মাঝবয়সি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে। যারা তার কথা শুনছে না, শেষ অব্দি দাবড়ে তাদের চুপ করিয়ে দিচ্ছে।

এইভাবে সকাল এবং দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। তখনও 'গ্রিন হাইটস'-এ মিটিং চলছে তো চলছেই। তার মধ্যেই একজন দু'জন করে ভেতরে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে এসেছে। কালকের মতো রাহুল অয়নকে নজর রাখতে বলে চটপট খেয়ে এসেছে। তারপর অয়নকে খেতে পাঠিয়েছে।

সন্ধে নামার পর রাহুল বলল, 'এবার তোর বন্ধুদের ওখানে যাবি তো?'

অয়ন বলে, 'সিওর—'

কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জনে 'গ্রিন হাইটস'-আর আট তলায় মহেশদের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল।

মহেশ তো ছিলই। তার বাবা নিরঞ্জন আদবানি এবং মীনাক্ষী আদবানিও তাঁদের নিজস্ব অফিস থেকে ফিরে এসেছেন অনেক আগেই।

অয়ন মহেশদের সঙ্গে রাহুলের পরিচয় করিয়ে দেয়। রাহুলকে দেখে ওরা দারুণ খুশি। 'মীরচন্দানি জুয়েলার্স'-এর ডাকাতির ছকটা সেবার কিভাবে সে ভেস্তে দিয়েছিল সেসব প্রসঙ্গ তুলে নিরঞ্জন আঙ্কল আর মীনাক্ষী আন্টি অঢেল প্রশংসায় তাকে ভরিয়ে দিলেন।

অনেক গল্প হল। সেই সঙ্গে প্রচুর খাওয়া। কত রকমের যে মিষ্টি আর নোনতা খাবার।

খাওয়া টাওয়া হলে নিরঞ্জন জানালেন ফি শনিবার সন্ধের পর তাঁরা খার অঞ্চলে রাধাস্বামী মন্দিরে যান। রাহুলরা মহেশের সঙ্গে গল্প করুক। কাল রবিবার, ছুটির দিন সে যেন অয়নকে নিয়ে আবার আসে।

রাহুল কথা বলছিল ঠিকই, কিন্তু তার মাথায় সাত তলার সেই লোকগুলোর চিন্তা আটকে আছে। হঠাৎ সে জিগ্যেস করে, 'আচ্ছা আঙ্কল, আপনাদের ঠিক নিচের ফ্লোরের অ্যাপার্টমেন্টটায় কারা থাকে, জানেন?'

নিরঞ্জন বেশ অবাক হলেন।—'কেন বল তো?'

'এমনি। বিশেষ কোনও কারণ নেই। অয়নদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ওদের দেখতে পাই কিনা। তাই—'

নিরঞ্জন বললেন, 'আজিজভাই আর তার ভাই রহমান থাকেন। ওরা লখনৌ-এর লোক। এখানে কাপড়ের ব্যবসা-ট্যাবসা করেন। খুব ভালো মানুষ। চমৎকার ব্যবহার। আমাদের বিল্ডিংয়ের সবাই ওঁদের পছন্দ করে। কেউ বিপদে পড়লে পাশে দাঁড়ান, যতরকম ভাবে পারেন সাহায্য করেন। আজ তো আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, সময় হবে না। কাল যদি আসো তোমার সঙ্গে ওঁদের আলাপ করিয়ে দেব।'

নিরঞ্জনের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনল রাহুল।

আজিজ আর রহমানের সঙ্গে আলাপ হলে ওদের আস্তানায় ঢোকার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। ভেতরে ঢুকতে পারলে কৌশলে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যায়। আজিজদের সঙ্গে কথা বলে কোনও ক্লু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে তো কাল।

অয়ন আর সে যখন মহেশদের অ্যাপার্টমেন্টে আসে, আজিজদের মিটিং চলছিল। রাহুলের ধারণা সেটা এখনও চলছে। বিদ্যুৎচমকের মতো আচমকা একটা আইডিয়া তার মাথায় খেলে যায়। সে বলে, 'ঠিক আছে আঙ্কল। কালই ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হবে।'

'আচ্ছা—'

'ওদের অ্যাপার্টমেন্টে আরও চারজন ইয়াং ম্যানকে দেখেছি।'

'ওরা আজিজভাইদের আত্মীয়। হস্টেলে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে দেখা করে যায়।'

একটু পর নিরঞ্জন আর মীনাক্ষী বেরিয়ে গেলেন। বিশাল লিভিংরুমে বসে রাহুলরা গল্প করছিল। সেই আইডিয়াটা তার মাথায় ক্রমাগত খোঁচা মেরে যাচ্ছে। সে শুনেছে এই অ্যাপার্টমেন্টের রাস্তার দিকের ঘরটা মহেশের। তার ঠিক তলায় আজিজদের মিটিং চলছে।

রাহুল মহেশকে বলল, 'তোমার ঘরে আমাদের একটু নিয়ে যাবে?'

মহেশ অবাক হয়ে বলে, 'এখানেই তো কম্ফোর্টেবলি বসে আছি। আমার ঘরটা ছোট। নানা জিনিসপত্রে বোঝাই। এখানেই থাকি না—'

'না। তোমার ঘরে নিয়ে চল। প্লিজ—' বলে একটু থেমে, একটু ভেবে, রাহুল ফের বলে, 'একটা বিশেষ দরকারে তোমার ঘরে যেতে চাইছি। কী কারণ, এখন জানতে চেও না। পরে সব বলব। আমি একা মিনিট দশেক তোমার ঘরে থাকব। ওনলি টেন মিনিটস। এটা কিন্তু টপ সিক্রেট, কারওকে বলতে পারবে না।'

হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মহেশ। তারপর আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয়। —'ঠিক আছে—'

মহেশের ঘরটা সত্যিই প্রচুর মালপত্রে ঠাসা। আট দশটা ক্রিকেট ব্যাট, প্যাড, উইকেট, গ্লাভস, ফুটবল, ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট ট্যাকেট তো আছেই, দেওয়ালে তেন্ডুলকার, পেলে, মারাদোনা, বুবুকা থেকে স্টেফি গ্রাফ, এমন সব দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়দের পোস্টারও সাঁটা

রয়েছে। তা ছাড়া আছে খাট, পড়ার টেবল, টেক্সট, বুক, খাতা, অগুনতি ক্যাসেট এবং অজস্র গল্পের বই।

মহেশ রাহুলকে তার ঘরে পৌঁছে লিভিং রুমে অয়নের কাছে ফিরে গেল। আর রাহুল দরজা বন্ধ করে মেঝের কার্পেট গুটিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে মেঝেতে একটা কান চেপে ধরে। বিদেশি কোনও এক লেখকের গল্পে সে পড়েছিল, এইভাবে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর একটা অপরাধের ক্লু পেয়েছিল।

নিচের তলা থেকে টুকরো টুকরো নানা শব্দ উঠে আসছে। 'এটা হল মাহিম স্টেশন, এটা যোগেশ্বরী, এটা চার্নি রোড, এটা মালাড। চারটে মারুতি-ওমনি...মাল থাকবে...রিমোট কন্ট্রোল—সোমবার...দশ বাজে...'

ওদের ছকটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাহুল শিউরে উঠল। হাতে একটা দিন রয়েছে। এর ভেতর যা করার করে ফেলতে হবে।

দশ মিনিট বলেছিল, তার আগেই কাজ হয়ে গেছে। কার্পেটটা ঠিক আগের মতো টান টান পেতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাহুল।

মহেশ আর অয়ন উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিল। রাহুল মহেশকে বলল, 'তোমার কোনও জিনিস আমি হাত দিইনি। সব ইনট্যাক্ট আছে।'

এসব কে শুনতে চায়? মহেশরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।—'কী করলে দরজা বন্ধ করে?'

রাহুল অন্যমনস্কর মতো হাসল।—'আমার একটা ইনফরমেশন জানার ছিল। সেটা জেনে নিলাম।'

মহেশ এবং অয়নের চোখেমুখে অপার কৌতূহল। তারা একসঙ্গে জিগ্যেস করে, 'কী ইনফরমেশন?'

রাহুল একটু হাসল—'আজ নয়, পরে বলব। মহেশ, আজ চলি—'

'এখনই যাবে? আরেকটু থাকো না—'

'প্লিজ, আজ ছেড়ে দাও। আমি তো মুম্বাইতে কিছুদিন আছি। খুব শিগগির একদিন জোজোকে নিয়ে এসে পড়ব।'

'কাল সানডে, সবার ছুটি। মা আর বাবা তোমাদের কাল আসতে বলল। কালই এস না—'

এই মুহূর্তে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না রাহুলের। মহেশের ঘরের মেঝেতে কান ঠেকিয়ে যা-যা শুনেছে, সেসব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। রাহুল বলল, 'দেখি—'

মহেশদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে লিফটে করে অন্যমনস্কর মতো নিচে নেমে এল রাহুল। পাশেই রয়েছে অ্যাসিস্টান্ট। অথচ 'গ্রিন হাইটস'-এর সেই রহস্যময় লোকগুলো সম্বন্ধে তাকে খোলসা করে এখন অব্দি কিছুই বলেনি তার এই মাসতুতো দাদাটি। এর কোনও মানে হয়? একসঙ্গে কাজ করা হচ্ছে, অথচ তাকেই কিনা সামান্য একটু জানিয়ে বেশির ভাগটাই গোপন করে রাখছে? না, নিজের থেকে অয়ন আর কিছু জিগ্যেস করবে না।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে বাইরের রাস্তায় আসতেই মস্তিষ্কে আলোর ঝলক খেলে গেল রাহুলের। 'গ্রিন হাইটস'-এর সাত তলার লোকগুলো সম্পর্কে যে ধোঁয়াটে ভাবটা ছিল তা প্রায় কেটে গেছে।

পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটছিল অয়ন। তার গোমড়া মুখে দেখে কারণটা আন্দাজ করে নিল রাহুল। রহস্যের জটটা মোটামুটি ছাড়াতে পেরে মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টান্টের কাঁধে করে একটা আলতো হাত রেখে হেসে হেসে বলল, 'খুব খেপচুরিয়াস হয়ে আছিস তো?'

উত্তর দিল না অয়ন। গলার ভেতর অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করল শুধু।

রাহুল আদরের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বলল, 'আরে বাবা, আমার কাছেই ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার ছিল না। তাই তোকে বলিনি। এবার বলব। তবে একটা কন্ডিশন আছে—'

চোখ দু'টো খুশিতে জ্বলজ্বল করতে থাকে অয়নের। 'তুমি যে কন্ডিশন বলবে তাতেই আমি রাজি। আগেও কিছু কিছু বলেছ, আমি কারওকে তা জানিয়েছি?'

রাহুল জানে তার এই সহকারীটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য। সে বারণ করলে ওর পেট থেকে কোনও খবর বার করা অসম্ভব। বলল, 'বাড়ি চল। সেখানে গিয়ে—' কথা শেষ না করে কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

অয়ন একটু অবাক হল।—'থেমে গেলে যে? কী হল?'

বাহুলের মাথায় অন্য একটা চিন্তা ঢুকে গেছে। সে বলল, 'একবার থানায় চল তো—'

থানায়? কেন?'

'সরদেশাই আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করাটা খুব আর্জেন্ট।'

কী ব্যাপার বল তো?'

'আঃ—' রাহুল বিরক্ত হল, 'নো কোশ্চেন নাউ। লেট আস মুভ—'

বান্দ্রার ওসি নবীন সরদেশাইকে থানাতেই পাওয়া গেল। আগে খবর না দিলে চলে এসেছে। রাহুলের মনে একটু খটকা ছিল সরদেশাই ব্যস্ত মানুষ, চারদিকে তাঁকে ছোটাছুটি করতে হয়, এসময় তিনি থানায় থাকবেন কিনা।

রাহুলকে দেখে দারুণ খুশি নবীন সরদেশাই। সোল্লাসে বললেন 'এস—এস, খুদে শার্লক হোমস। এস ডাঃ ওয়াটসন। বোসো বোসো—' ওয়াটসন হল অয়ন।

মস্ত টেবলের এধারে বসে পড়ে রাহুলরা। সরদেশাই জিগ্যেস করেন, 'কবে এলে?'

রাহুল বলল, 'দিন কয়েক আগে—'

'এতদিনে তোমার এখানে আসার সময় হল। ব্যাড, ভেরি ব্যাড।'

কাঁচুমাচু মুখে রাহুল বলে, 'সরি আঙ্কল, সরি—'

প্রবল উচ্ছ্বাসে বলে যেতে লাগলেন সরদেশাই, 'সেবার কামাল করে দিয়েছিলে। সারা মুম্বাইতে তোমাকে নিয়ে কী হইচই? উই ফিল প্রাউড—' কথা শেষ করার আগেই

আচমকা থেমে গেলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে বল তো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব টেনশনে আছ।'

'ঠিকই ধরেছেন—' রাহুল আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'মুম্বাই আসার পর আমি এমন কিছু দেখেছি যেটা এই সিটির পক্ষে ভীষণ মারাত্মক।'

শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গেল সরদেশায়ের। চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে বেরোয় তাঁর। —'কী দেখেছ?'

রাহুল এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখল, ক'টা কনস্টেবল সামনের টানা বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে। বলল, 'আঙ্কল, ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। এই স্টেজে ওটা কেউ জেনে ফেলুক, তা ঠিক হবে না।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন সরদেশাই। উঠে গিয়ে কামরার দরজা বন্ধ করে এসে ফের নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়লেন।—'এবার বল।'

অয়নের ঘর থেকে 'গ্রিন হাইটস'-এ যা-যা দেখেছে এবং মহেশদের কম্পার্টমেন্টে গিয়ে যা-যা শুনেছে, সব সবিস্তার জানিয়ে রাহুল বলল, 'আমাকে একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজের সাদা কাগজ, একটা লাল আর একটা কালো ডট পেন দিন।'

সরদেশাই কাগজ পেন-টেন এনে দিলেন।

টেবলের ওপর কাগজটা পেতে রেল লাইন এঁকে তার পাশে খানিকটা ফাঁক দিয়ে দিয়ে ক'টা লাল সার্কল আঁকতে আঁকতে রাহুল বলল, 'এগুলো সাবার্বন ট্রেনের স্টেশন। এটা চার্নি রোড, এটা মালাদ, এটা মাহিম, এটা যোগেশ্বরী। সোমবার দশটায় অফিস টাইমে যখন স্টেশনগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় থাকবে সেই সময় চার জায়গায় চারটে মারুতি-ওমনি আগে থেকেই দাঁড় করিয়ে রাখবে জঙ্গিরা। সেগুলোর ভেতর থাকবে খুব পাওয়ারফুল এক্সপ্লোসিভ। রিমোট কনট্রোলে ব্লাস্ট করিয়ে অসংখ্য মানুষ মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে টেররিস্টগুলো।'

সরদেশাই-এর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় দুই হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বললেন, 'আমার থানার তিনশো গজের ভেতর টেররিস্টদের এমন একটা ডেন রয়েছে, টেরই পাইনি। এক্ষুনি ওদের আস্তানায় রেইড করব। আমাদের থানার পুলিশের স্ট্রেনথ—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাহুল বলল, 'নো আঙ্কল, নো। আজ কিছু করার দরকার নেই।'

ভুরু কুঁচকে যায় সরদেশাই-এর। বললেন, 'মানে?'

'সোমবার দশটার আগে কিছু ঘটছে না। এখন রেইড করলে ক'টা লোককে হয়তো ধরা যাবে। আমার মনে হয় ওরা যে ব্লাস্টের প্ল্যান করেছে তাতে আরও লোক ওখানে আসবে। এক্সপ্লোসিভ ওই অ্যাপার্টমেন্টটায় আছে কি না, সে সম্বন্ধে আমি সিওর নই। সেগুলোও পেতে হবে তো—'

ধীরে-ধীরে বসে পড়েন সরদেশাই। বলেন, 'তুমি কী করতে বলো?'

'আমি জোজোর ঘর থেকে 'গ্রিন হাইটস'-এ নজর রাখব। আপনি ফোর্স রেডি রাখবেন, প্লেন-ড্রেস কিছু পুলিশ অফিসার ওই বিল্ডিংটার চারপাশে থেকে টেররিস্টগুলোর মুভমেন্ট লক্ষ করবে। আপনার মোবাইল ফোনের নাম্বারটা আমাকে দিন। দরকারমতো আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করব। আরেকটা কথা, আপনাদের বম্ব আর এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টদের একটা টিম সোমবার সকালে যেন এই পুলিশ স্টেশনে হাজির থাকে। আপনিও ভোরে চলে আসবেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাহুল ফের বলে, 'ক'টা প্রাইভেট কারও রেডি থাকে যেন। তেমন বুঝলে ওদের ফলো করতে হবে।'

সরদেশাই বললেন, 'তুমি যেমন যেমন বললে তাই করা হবে।'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'জোজো আর আমি যে এর মধ্যে আছি, মাসি-মেসোকে একদম বলবেন না। বললে কালই আমাকে কলকাতার ফার্স্ট অ্যাভেলেবল ফ্লাইট ধরিয়ে দেবেন।'

'না না, এখন জোজোদের অ্যাপার্টমেন্টের ত্রিসীমানায় আমি যাচ্ছি না।'

রবিবার সারাটা দিন চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে 'গ্রিন হাইটস'-এর দিকে তাকিয়ে রইল রাহুল। উত্তেজক তেমন কিছুই ঘটল না। মাঝে মাঝে সেই ছ'টা লোক গোলাকার টেবিলটা ঘিরে বসে। নিজেদের মধ্যে কিছু পরামর্শ করে। ব্যস, এটুকুই। সন্ধের পর আরও দু'টো যুবক এল। ওই অ্যাপার্টমেন্টে এখন সবসুদ্ধ আটজন।

নতুন দুই মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে সরদেশাইকে জানিয়ে দিল রাহুল।

পরদিন সকালে সোয়া আটটায় একটা মারুতি-ওমনি এসে দাঁড়াল 'গ্রিন হাইটস'-এর গেটের বাইরে। সাত তলার ওই অ্যাপার্টমেন্টের দু'টো লোক, ফিটফাট স্যুট-টুট পরা, হাতে অ্যাটাচি কেস ঝুলিয়ে সেই গাড়িটায় উঠল, যেন অফিসে যাচ্ছে যেমন একটা ভাব। মারুতি-ওমনিটার নম্বর : MRF 5920। সরদেশাইকে ফোন করে, নম্বরটা জানিয়ে রাহুল বলল, 'একজন বম্ব বা এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টকে নিয়ে প্লেন ড্রেসের অফিসাররা যেন এক্ষুনি গাড়িটা ফলো করে। অফিসারদের সঙ্গে যেন আর্মস থাকে।'

আটটা চল্লিশে দু'নম্বর, ন'টা পাঁচে তিন নম্বর এবং শেষ মারুতি-ওমনিটা এল ন'টা কুড়িতে। প্রতিটি গাড়িতে একই পদ্ধতিতে অ্যাটাচি ঝুলিয়ে দু'জন করে উঠল। শেষেরটায় উঠেছে সেই মাঝবয়সি লোকটা আর যাকে মেক-আপ নিতে দেখেছিল রাহুল—সে। প্রথমটার মতো বাকি তিনটের নম্বরও সরদেশাইকে জানিয়ে সেগুলোকেও ফলো করতে বলা হল।

এরপর অপেক্ষা করার পালা।

বারোটা নাগাদ সরদেশাই ফোন করে জানালেন, বিস্ফোরক সুদ্ধ আট জঙ্গিই ধরা পড়েছে। যে পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ মারুতি-ওমনি গুলোতে ছিল তা দিয়ে চারটে স্টেশন উড়িয়ে দেওয়া যেত। কম করে হাজারখানেক নিরীহ মানুষ মারা পড়ত।

দেড়টায় বিশাল পুলিশ ফোর্স 'গ্রিন হাইটস'-এর সেই অ্যাপার্টমেন্টটায় অপারেশন চালিয়ে প্রচুর বিস্ফোরক, এ কে ৪৭ রাইফেল, রিভলভার উদ্ধার করে।

কয়েকদিন বাদে সরদেশাই অয়নদের অ্যাপার্টমেন্টে এসে গোপনে রাহুলকে বললেন, 'আট টেররিস্ট যে ধরা পড়েছে তার হানড্রেড পারসেন্ট কৃতিত্ব তোমার। এর জন্য গর্ভনমেন্ট তোমাকে রিওয়ার্ড দেবে। তবে কারওকে না জানিয়ে, ঢাকঢোল না পিটিয়ে, নিঃশব্দে। নো পাবলিসিটি, নো মিডিয়া হাইপ। কেননা, ইন্ডিয়ায় প্রচুর টেররিস্ট ঢুকেছে। তোমার নাম জানাজানি হলে ওরা তোমাকে টার্গেট করে ফেলবে।'

রাহুল বলল, 'জোজোও কিন্তু আমাকে খুব হেল্প করেছে।'

'সিওর এনাফ। রিওয়ার্ডের টেন পার্সেন্ট ওর প্রাপ্য।'

ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এল রাহুল। তার মাসখানেক বাদে একদিন নবীন সরদেশাই তাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে মাসি, মেসো এবং অয়ন।

সরকার থেকে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের চেকটা রাহুলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমাদের গৌরব। তোমার জন্যে আটটা মারাত্মক জঙ্গিকে ধরতে পেরেছি। বহু মানুষের প্রাণ বেঁচে গেছে।' একটু থেমে রাহুলের বাবা এবং মেসোদের অনুরোধ করলেন, এই ব্যাপারটা তাঁদের দুই পরিবারের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। রাহুলের নিরাপত্তার জন্যই এটা দরকার। রাহুলকেও এ নিয়ে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

রাহুলের মা ছেলের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকান,—'ফের তুমি এসবের ভেতর ঢুকেছ! কতবার না বারণ করেছি। কোনদিন যে বিপদ ঘটিয়ে বসবে।' বললেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সারা মুখ গর্বে ঝলমল করছে।